কিশোর চোর ও হাসির গল্প সমগ্র

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

boierpathshala.blogspot.com

সম্পাদনা

সমুদ্র বসু

boierpathshala.blogspot.com

কিশোর চোর ও হাসির গল্প সমগ্র

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

বাংলা পিডিএফ ডাউনলোডের জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

Facebook.com/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

উৎসর্গ

শ্রীমতী রূপা মজুমদার

—কল্যাণীয়াসু

সম্পাদকের নিবেদন

রহস্য-ভূত-কল্পবিজ্ঞানের বাইরে শুধুমাত্র নিটোল হাসির গল্পেও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। তাঁর হাসিতে রয়েছে এক ধরনের অদ্ভুত খামখেয়ালি রস যা সুকুমারী 'নন সেন্স' রস বললেও খুব ভুল হবে না কারণ দমফাটা হাসি না হলেও ঘটনা, চরিত্রের বিবরণ বা কথাবার্তা সব পড়লে মুচকি হাসি-ফচকে হাসি বা জিভ বের করবার মতো অবস্থা তো হবেই। শীর্ষেন্দুবাবুর হাস্যরস নিয়ে লিখতে থাকলে দাঁড়ি টানা বেশ কঠিন কাজ। তবে এ কথা অবশ্যই বলা উচিত যে এই মহীরুহ লেখক তাঁর কলমে সমাজের ভালো ও খারাপ দুটি দিকই অনবদ্য ভঙ্গিমায় উপস্থাপনা করেছেন হাসির গল্পের মাধ্যমে। মানবিক মূল্যবোধের স্পষ্ট ছাপ রয়েছে তাঁর একাধিক হাসির গল্পে।

বাংলা হাসির গল্প বা রসসাহিত্যে জটিলতা না এনে নিছক মজা বা আনন্দ দেওয়ার জন্য যাঁরা লিখে গেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যাঁর সাহিত্য মেদহীন, জটিলতাহীন এক মজার ডালি। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ লেখক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছে এবং দেব সাহিত্য কুটীরের প্রকাশক শ্রী রাজর্ষি মজুমদার, শ্রীমতী রূপা মজুমদারের কাছে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা যাবতীয় হাসি ও চোর নিয়ে কাহিনি খুঁজে বের করে দু-মলাটে সাজিয়ে সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য। এর আগে অন্য কোনো প্রকাশক শীর্ষেন্দুবাবুর সামগ্রিক হাসির গল্পের কাজকে দু-মলাটে প্রকাশ করেননি। এর মধ্যে অনেক গল্পই হারিয়ে গেছিল যা নতুন করে খুঁজে পেতে হয়েছে আর সেই কারণেই বইটির সামগ্রিকতা নিয়ে যে কোনো গবেষকের কাছে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায় যে কোনো গল্প বাদ পড়ল কিনা। বলে রাখা প্রয়োজন যে এই শুধুমাত্র সামাজিক নিখাদ হাসির গল্পের (অবশ্যই যার মধ্যে চোর-ডাকাত নিয়ে গল্পগুলিও পড়ে) মধ্যে কল্পবিজ্ঞান বা ভৌতিক হাস্যরসপূর্ণ গল্পগুলিকেও রাখা হয়নি। ছোটদের কথা ভেবে এই বইয়ে শুধুমাত্র কিশোরপাঠ্য কল্পবিজ্ঞান কাহিনিগুলিকে রাখা হয়েছে।

আমি আমার বাবা শ্রী সমর কুমার বসু ও মা শ্রীমতী সংযুক্তা বসুর কাছে ঋণী ছোটবেলা থেকে বইসংগ্রহ ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহের প্রতি আমার ঝোঁককে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নয়তো অনেক তথ্যই আমার কাছে অধরা থাকত। বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি শ্রী অনীশ দেবের কাছ থেকে, তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া দীপঙ্কর দত্ত, অর্ণব দাস, রাজর্ষি সরকার, সোমনাথ মান্না, সৌগত সেনগুপ্ত সহ যে সমস্ত মানুষজনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা ধরনের সাহায্য বা উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এবারের বইমেলার এই 'হাসি ও চোর সমগ্র' নিশ্চয়ই সবাইকে আরো আনন্দ দেবে এই আশা রাখছি। সবশেষে, এই সমগ্রটি পড়ে আপনাদের সবার ভালো লাগা না লাগার বিচার আপনাদের হাতেই তুলে দেওয়া হল।

বইমেলা, ২০১৯ — সমুদ্র বসু

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সামগ্রিক হাসি-মজা-চোর নিয়ে কাহিনিগুলোকে একত্র করে দু-মলাটে প্রকাশ করার বাসনা নিয়ে এ বই। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প 'শুকতারায়' প্রকাশিত হয়েছে। আশা রাখি পাঠক বন্ধুদের সমাদর পাবে এই বই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা ও অনুজ সমুদ্রকে ভালোবাসা জানাই।

বইমেলা, ২০১৯ — রূপা মজুমদার

সূচিপত্র

১.	চোরে ডাকাতে	....	....	১১
২.	বিধু দারোগা	....	....	১৫
৩.	ভালোমানুষ হরবাবু	....	....	২১
৪.	চোরে দারোগায়	....	....	২৫
৫.	চোর	....	....	২৮
৬.	রাত যখন বারোটা	....	....	৩২
৭.	সেই লোকটা	....	....	৩৬
৮.	কথার দাম	....	....	৪২
৯.	কুরুক্ষেত্র	....	....	৪৬
১০.	ফটিকের কেরামতি	....	....	৫০
১১.	নিত্যহরি ও মঙ্গারাম	....	....	৫৫
১২.	মাসির বাড়ি	....	....	৬০
১৩.	রাতের অতিথি	....	....	৬৪
১৪.	ওর হবে	....	....	৬৭
১৫.	বড় চোর ছোট চোর	....	....	৭০
১৬.	হারজিৎ	....	....	৭৩
১৭.	মোল্লারহাটের নেমন্তন্ন	....	....	৭৫
১৮.	সেয়ানে সেয়ানে	....	....	৭৭
১৯.	পটকান যখন পটকালো	....	....	৮২
২০.	লেজ	....	....	৮৩
২১.	রাজার মন ভালো নেই	....	....	৮৯
২২.	রামবাবু এবং কানাই কুণ্ডু	....	....	৯৪
২৩.	বাঘের দুধ	....	....	৯৫
২৪.	ডবল পশুপতি	....	....	১০১
২৫.	আতাপুরের দৈত্য	....	....	১০৬
২৬.	গঙ্গারামের রাগ	....	....	১০৯
২৭.	বাজি ও কুকুর	....	....	১১৪
২৮.	শক্তি পরীক্ষা	....	....	১১৭
২৯.	ঘুড়ি ও দৈববাণী	....	....	১১৯
৩০.	হরিমতির বাগান	....	....	১২৩

৩১. বিপিনবাবুর কাণ্ড ১২৬
৩২. গণেশের মূর্তি ১৩০
৩৩. দীপুর অঙ্ক ১৩৪
৩৪. দুই সেরি বাবা ১৩৯
৩৫. কথা ভার্সাস কথা ১৪৩
৩৬. গোপেনবাবু ১৪৭
৩৭. শিবেনবাবু ১৫০
৩৮. অনুসরণকারী ১৫৩
৩৯. নিত্যানন্দ পালের খোঁজে ১৫৬
৪০. চকবেড়ের গোহাটায় ১৫৯
৪১. কবচ ১৬৪
৪২. ওয়ারিশান ১৬৬
৪৩. মুক্তিপণ ১৭২
৪৪. রাজার হেঁচকি ১৭৭
৪৫. যতীনবাবুর চার হাত ১৮১
৪৬. পরাণের ঘোড়া ১৮৩
৪৭. আস্পর্দা ১৮৭
৪৮. কানাই সামন্তর দোকান ১৯০
৪৯. নফরগঞ্জের রাস্তা ১৯৪
৫০. গয়ানাথের হাতি ১৯৮
৫১. রুণু ২০২
৫২. কেনারাম ২০৫
৫৩. বশীকরণ ২০৮
৫৪. শাক-ভাতের দাম ২১১
৫৫. আকাশগঙ্গা ২১৪
৫৬. ব্রহ্মজ্ঞান ২১৭
৫৭. কানু স্যাঁকরা বনাম যুধিষ্ঠির বাজপাই ২২০
৫৮. ভালোমানুষের বিপদ ২২৩
৫৯. চোখ ২২৬
৬০. ফকিরচাঁদ ২২৮
৬১. লাটুর ঘরবাড়ি ২৩১
৬২. সংবর্ধনা ২৩৬
৬৩. জাম্বোর নামডাক ২৩৯
৬৪. ভূতনাথের বাড়ি ২৪২
৬৫. বলাইবাবু ২৪৫

চোরে-ডাকাতে

সে আমলে আমাদের পরগনায় বিখ্যাত চোর ছিল সিধু। তার হাত খুব সাফ ছিল, মাথা ছিল ঠান্ডা, আর তুখোড় বুদ্ধি। দিনেরবেলা সিধু গৃহস্থের মতো চালচলন বজায় রাখত, আমাদের বাড়িতেও বেড়াতে-টেড়াতে আসত সে। আর পাঁচজনের মতোই ঠাকুমা তাকেও ফল-টল খাওয়াতেন, মুড়ি মেখে দিতেন। কেবল সে চলে যাওয়ার পর ঠাকুমা গেলাস-বাটি গুনে দেখতেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা। সিধু সব বাড়িতে যেত খবর করতে, কার বাড়িতে নতুন লোক এল, কী নতুন কাপড়চোপড় এল দোল-দুর্গোৎসবে, কোন বাড়িতে টাকাপয়সার আমদানি হচ্ছে, ইত্যাদি। খবর বুঝে রাত-বিরেতে হানা দিত সেই বাড়িতে। এমন সব মন্ত্র জানা ছিল তার যে, সেই মন্ত্রের জোরে বাড়িতে সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোত, সিধু হাসতে হাসতে চুরি করে নিয়ে যেত সব। এমনকী যাওয়ার আগে গেরস্তের ঘরে বসে দু-দণ্ড জিরিয়ে তামাক-টামাক খেয়ে যেত। আমরা ছেলেবেলায় যখন তাকে দেখেছি তখন সে বেশ বুড়ো। পরনে ফরাসডাঙার ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি, পায়ে নিউকাট, মুখে পান, আর গলায় গান। বুড়ো বয়সেও বেশ শৌখিন ছিল সে। চার আঙুলে চারটে করে আংটি পরত। বাজার করতে গিয়ে দরাদরি করত না। চুরি করে প্রচুর পয়সা করেছিল সে। বাড়িতে দশ-বারোটা গোরু, সাত-আটজন ঝি-চাকর, জুড়িগাড়ি সবই ছিল তার। বুড়ো বয়সে তার ভীমরতি হয়েছিল খানিকটা। তখন তার চোখে ছানি আসছে, বাত-ব্যাধিতেও কষ্ট পায়। খুব দরকার না পড়লে চুরি করতে যেত না। এদিকে তার ছোটোমেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে। একটা ভালো সম্বন্ধও পেয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে, তার খরচ কম নয়। তার বউ তখন তাকে প্রায়ই খোঁচাত, 'মেয়ের বিয়ে আষাঢ়ে, তোমার তো গরজই নেই দেখছি, অতবড়ো ব্যাপার, তার খরচাপাতি আসবে কোত্থেকে? রাতের দিকে একটু-আধটু বেরোলে তো হয়।' সিধু তখন তার কাঁকালের ব্যথার কথা বলত, চোখের ছানির কথা বলত, কিন্তু তার বউ সেসব শুনত না। শোনা যায়, বুড়ো বয়সে সিধুর কিছু ভূতের ভয়ও হয়েছিল। নিশুত রাতে বেরোতে সাহস পেত না।

আমাদের পরগনায় আর একজন বিখ্যাত লোক ছিল। তার নাম হালিম। লোকে বলত হালুম মিঞা। তা হালিম ছিল সাঙ্ঘাতিক ডাকাত। যেমন তার বিরাট চেহারা, তেমনি তার সাহস। যে-বাড়িতে ডাকাতি করবে, সে বাড়িতে সাতদিন আগে গিয়ে তার সাকরেদ চিঠি দিয়ে আসত যে, অমুক দিন হালিম সে বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে। সে-আমলে পূর্ববঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে দারোগা-পুলিশ খুব বেশি ছিল না। তাছাড়া খালবিল জঙ্গলের দেশ বলে অধিকাংশ জায়গাই ছিল দুর্গম। সে-সব জায়গায় চোর-ডাকাতদের ভারি সুবিধে। হালিম বা হালুম মিঞাকে তাই কেউ কখনো জব্দ করতে পারেনি। সে ছিল দারুণ লাঠিয়াল, অসম্ভব সাহসী। দরকার না পড়লে খুন-টুন করত না। জমিদার বা ধনীরা সাধারণত হালিম মিঞা ডাকাতি করতে এলে খাতির-টাতির করত। শোনা যায়, হালিম যে বাড়িতে ডাকাতি করতে যেত, সে-বাড়ি আগে থেকেই বিয়েবাড়ির মতো সাজানো হত, রোশনাই দেওয়া হত, ভালো খাবারদাবারের বন্দোবস্ত থাকত। হালিম উপস্থিত হলে বাড়ির মালিক হাতজোড় করে 'আসুন

আসুন' করত। হালিম বিনা বাধায় ডাকাতি করে চলে আসত, কিংবা ঠিক ডাকাতি তাকে করতে হত না, বাড়ির লোকেরা তাকে সিন্দুকের চাবি-টাবি খুলে সব গুনে গেঁথে দিয়ে দিত। কিন্তু সকলের তো দিন সমান যায় না। আমাদের ছেলেবয়সে সেই কিংবদন্তির ডাকাত হালিমও বুড়ো হয়েছে। গোরস্থানের কাছে তার বেশ বড়ো বাড়ি। তারও দাসী-চাকর, ধানের মরাই, জোতজমি-গোরু সবই আছে। আমরা হালিমকে দেখতাম কানে আতরের তুলো গুঁজে, চোখে সুর্মা দিয়ে, চমৎকার চেককাটা সিল্কের লুঙ্গি আর মখমলের পাঞ্জাবি পরে জমিদারের পুকুরে ছিপে মাছ মারছে। খুব গম্ভীর ছিল সে, চোখ দু-খানা সবসময়ে লাল টকটকে। ডাকাতি করা তখন ছেড়েই দিয়েছে, তবে শিক্ষানবিশ ডাকাতরা তার কাছে তালিম নিতে আসত। সিধুর কথা যা বলছিলাম। বউয়ের তাড়নায় অবশেষে সে একদিন রাতে চুরি করতে বেরোল। চোখের ছানির জন্য রাস্তাঘাট ভালো ঠাহর হয় না, তাই সঙ্গে হারিকেন নিল। একা যেতে ভূতের ভয়, তাই একজন চাকরকেও ডেকে নিল সঙ্গে। রাস্তায় সাপখোপের গায়ে পা পড়তে পারে ভেবে হাততালি দিয়ে দিয়ে পথ হাঁটতে লাগল। আর ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য তারস্বরে রামনাম করতে লাগল। সেই হাততালি আর রামনামের চোটে এত বিকট শব্দ হচ্ছিল যে, রাস্তার দু-পাশের বাড়িঘরে লোকজনের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। তারা সব উঁকি মেরে দেখছে, ব্যাপারখানা কী! অনেকেরই ধারণা হল, সিধু চোর ধার্মিক হয়ে গেছে, তাই রাত থাকতে উঠে ঠাকুরের নাম নিতে নিতে প্রাতঃস্নান করতে যাচ্ছে নদীতে। এদিকে সিধুর হল বিপদ, যে-বাড়িতেই ঢুকতে যায় সে-বাড়িতেই দেখে গৃহস্থ সজাগ রয়েছে। ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেল সে। কত ঘুমপাড়ানি মন্ত্র পাঠ করল, কিন্তু বুড়ো বয়সে মন্ত্রের জোরও কমে এসেছে, তেমন কাজ হয় না।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গোরস্থানের কাছ-বরাবর এসে এক গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল সিধু। খুব ঠাহর করে সমুখপানে দেখে বলল, 'ওই মস্ত বাড়ি, ওটা কার রে?'

চাকর উত্তর দিল, 'ও হালুম মিঞার বাড়ি।'

'বটে বটে!' বলে খুব খুশির ভাব দেখাল সিধু, 'তা হালিম দু-পয়সা করেছে বটে। এতকাল তো খেয়াল হয়নি।'

এই বলে সিধু সিঁদকাঠি বের করল।

পরদিন গঞ্জে হইচই পড়ে গেল। হালুম মিঞার বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে। সকালে হালিমের বউ পা ছড়িয়ে পাড়া জানান দিয়ে কাঁদতে বসেছে—'ওগো, আমরা কী হল গো? আমার সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে গো। বলি ও বুড়ো হালিম, তোর শরম নেই? যার দাপে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত তার বাড়িতে চুরি? বলি ও মুখপোড়া হালিমবুড়ো, সাতসকালে গ্যাঁজা টানতে বসেছিস। কচুগাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ফাঁসি দে, থুতু ফেলে তাতে ডুবে মর...'

দরজায় বসে গাঁজা খেতে খেতে হালিম কেবল রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে তার বিবিকে ধমক দিয়ে বলে, 'চুপ র, চুপরে বাঁদী। যে ব্যাটা চুরি করেছে তার গর্দানের জিম্মা আমার। দেখিস।'

তা শুনে বিবি আরও ডুকরে কেঁদে ওঠে।

হালিম দুটো কাজ করল। সিধুর নামে তিন ক্রোশ দূরের থানায় গিয়ে একটা নালিশ ঠুকে দিয়ে এল, আর সিধুর মেয়ের বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে একটা চিঠি পাঠাল তার

কাছে, 'তোমার কন্যার বিবাহের রাত্রে আমি সদলবলে উপস্থিত হইতেছি। আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়ো...' ইত্যাদি।

চিঠি পেয়ে সিধু বলল, 'ফুঃ।'

তারপর সেও গিয়ে তিন ক্রোশ দূরের থানায় দারোগাবাবুকে মুরগি আর মাছ ভেট দিয়ে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করে এসে দাওয়ায় বসে ফিক ফিক করে হাসতে আর তামাক খেতে লাগল।

সিধুর মেয়ের বিয়েতে আমাদেরও নেমন্তন্ন ছিল, ছোটোকাকা সমেত আমরা সব ঝেঁটিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, হালুম মিঞা ডাকাতি করতে আসবে শুনে যাদের নেমন্তন্ন হয়নি তারাও সব এসেছে গঞ্জ সাফ করে। বিয়েবাড়ি গিসগিস করছে লোকে। দারোগাবাবুও এসে গেছেন। সিধু তাঁকে বিবাহ বাসরের মাঝখানে বরাসনে বসিয়ে দিয়েছে। আর বর তাঁর পাশে একটা মোড়ায় বসে নিজের হাতে হাতপাখার বাতাস খেতে খেতে ঘামছে।

তখনকার নিমন্ত্রণে চার-পাঁচ রকমের ডাল খাওয়ানো হত, তারপর মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি বা পায়েস দেওয়া হত। আমরা সবে তিন নম্বর ডাল খেয়ে চার নম্বর ডালের জন্য তৈরি হচ্ছি এমন সময়ে উত্তরের মাঠ থেকে 'রে রে' চিৎকার উঠল আর মশাল দেখা গেল। পাত ছেড়ে আমরা সব ডাকাতি দেখতে দৌড়ে গেলাম।

কী করুণ দৃশ্য! ষাট-সত্তরজন সাকরেদ নিয়ে হালিম এসে গেছে। সকলের হাতেই বিশাল লাঠি, বল্লম, দা, টাঙ্গি। কপালে সিঁদুরের টিপ। খালি গা, মালকোঁচা করে ধুতি পরা। কিন্তু সব ক-জনই বুড়োসুড়ো মানুষ। এতদূর জোর পায়ে এসে আর হাল্লাচিল্লা করে সকলেরই দম ফুরিয়ে গেছে। হালিমের হাঁপের টান উঠেছে, তাই সিধু তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসাল। কয়েকজন ডাকাত উবু হয়ে বসে কাশতে কাশতে বুকের শ্লেষ্মা তুলছে। একজনকে দেখলাম, হাতের ভারী কুড়ুলটা আর বইতে না পেরে একজন বরযাত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের ভেরে যাওয়া হাতটাকে ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।

সিধু অনেকক্ষণ হালিমের বুক মালিশ করে দেওয়ার পর হালিমের হাঁপের টানটা কমল। তখন হাতে খাঁড়াটা তুলে নিয়ে বলল, 'এবার কাজের কথা হোক।'

সিধু হাতজোড় করে বলল, 'তোমার মানমর্যাদা ভুলে যাইনি হে। এই নাও সিন্দুকের চাবি, দরজা-টরজা সব খোলা আছে। চলে যাও ভিতর-বাড়িতে।'

তো তাই হল। হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হালিম, সঙ্গে সঙ্গে তার দলবলও হুংকার দিল। অবশ্য হুংকারের সঙ্গে সঙ্গেই খক খক করে কাশিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বেশ দাপটের সঙ্গেই হালিম ভিতরে ঢুকে লুঠপাট করতে লাগল। নিজের বাড়ির যে সব জিনিস চুরি গিয়েছিল সে সবই উদ্ধার করল হালিম। সিধু আগাগোড়া সঙ্গে রইল হাতজোড় করে। হালিম কোনো জিনিস নিতে ভুল করলে সিধু আবার সেটা দেখিয়ে দেয়, 'ওই কাঁসার বাটিটা নিলে না। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে নাকি, এ দেয়ালঘড়িটা যে তোমার, চিনতে পারছ না।'

এইভাবে ডাকাতি নির্বিঘ্নে এবং সাফল্যের সঙ্গে শেষ হল। সারাক্ষণ দারোগাবাবু পা ছড়িয়ে বসে তামাক টানলেন। সবাই তাঁর হাফপ্যান্টের নীচে বিশাল মোটা পা, মোটা বেল্ট আর ক্রসবেল্টে বেঁধে-রাখা প্রকাণ্ড ভুঁড়ি এবং চোমরানো গোঁফের খুব তারিফ করতে লাগল। তিনি কাউকে গ্রাহ্য করলেন না। বর বেচারা নিজেকে বাতাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বসে ঢুলছে। বরযাত্রী সমেত সবাই ডাকাতি দেখছে ঘুরে ঘুরে।

ব্যাপারটা শেষ হলে হালিম আর সিধু এসে দারোগাবাবুর সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। দারোগাবাবু হুংকার দিলেন, 'ঘটনাটা কী হল বুঝিয়ে বলো। এই বুড়ো বয়সে চুরি-ডাকাতি করতে যাস, একদিন মরবি।'

সিধু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, 'বড়োবাবু চুরি কী আর নিজের ইচ্ছায় করতে গেলাম! বউয়ের কাছে ইজ্জত থাকে না, সে-ই ঠেলেঠুলে পাঠায়।'

হালিমও বলল, 'আমারও ওই কথা।'

দারোগাবাবু হাতের নল ফেলে খুব হাসলেন। তাঁর হাসিরও সবাই প্রশংসা করল। তারপর বারান্দায় ঠাঁই করে হালিমের দলকে খেতে বসানো হল। হালিমের অবস্থা ভালো, কিন্তু তার সাকরেদরা সবাই হা-ঘরে। ডাল আর বেগুনভাজা দিয়েই তারা পাত লোপাট করতে লাগল।

সেই দেখে আমাদেরও মনে পড়ল, আমাদের পাতে এবার চার-নম্বর ডাল পড়বার কথা। আমরা সব দৌড়োদৌড়ি করে ফিরে এলাম খাওয়ার জায়গায়। এবং তারপরই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। অর্ধেক খেয়ে উঠে গেছি, ফিরে এসে হুটপাট করে বসে পড়বার কিছুক্ষণ পরেই সবাই টের পেতে লাগলাম, পাতের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কে কার পাতে বসেছি তার ঠিক পাচ্ছি না। যেমন, আমার ডানপাশে ছোটোকাকা বসেছিল, বাঁয়ে সুবল। পাতে দেড়খানা বেগুনভাজা ছিল, মুড়িঘণ্টের একটা কানকো। এখন দেখছি, ছোটোকাকা উলটোদিকের সারিতে বসে আছে, বাঁ-পাশে বিপিন পণ্ডিত, পাতে আধখানা মোটে বেগুনভাজা, মুড়িঘণ্টের কানকোটা নেই, একটা পোট্‌কা পড়ে আছে। সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল, 'এই তুই আমার পাতে বসেছিস চোর কোথাকার...ও মশাই, আপনি তো আমার বাঁ-ধারে ছিলেন...একি, আমার কুমড়োভাজা কোথায় গেল...' ইত্যাদি।

তবু খাওয়াটা সেদিন খুব জমেছিল।

বিধু দারোগা

সেবার বিধু দারোগা আমাদের গঞ্জে বদলি হয়ে এলে হইচই পড়ে গেল!

ব্রিটিশ আমলে দারোগা-পুলিশকে ভারি ভয় খেত গাঁ-গঞ্জের লোকেরা। রাস্তায়-ঘাটে বা হাটে-বাজারে পুলিশ দেখলেই নিরীহ সজ্জন মানুষরাও সাঁত সাঁত করে এধারে-ওধারে লুকিয়ে পড়ত। এক স্বদেশি আন্দোলনের নেতাগোছের লোক বটতলায় বক্তৃতা দিতে এলেন। শ-পাঁচেক লোক জড়ো হয়ে গরম বক্তৃতা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ঠিক সেই সময়ে একটা টিংটিঙে রোগা লাল পাগড়িওলা পুলিশ হাট থেকে পালংশাক কিনে ফিরছিল। তাকে দেখে সেই পাঁচশো জোয়ান মদ্দ লোক দে-দৌড় দে-দৌড়। স্বদেশি নেতা গাছতলায় বসে বিড়ি ধরিয়ে আপনমনে হতাশভাবে বললেন, হোপলেস। আর একবার, গঞ্জের নদীর ঘাট থেকে লোক-ভরতি একটা নৌকো ছাড়ছে বিকেলবেলায়, সেই সময়ে গঞ্জের দারোগা আর কয়েকজন পুলিশও ওপারে যাবে বলে এসে নৌকোয় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিনা কারণে বিস্তর লোক ঝুপ ঝুপ করে হাঁটুজলে নেমে পালাতে লাগল। এমনকী, তাদের মধ্যে গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইও ছিলেন। পরে তাঁকে সবাই যখন জিজ্ঞেস করল, তিনি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'কী জানি বাবা, সবাই পালাল দেখে আমিও জলে নেমে পালালাম। ভয় বড়ো সংক্রামক।'

তো এই ছিল দারোগা-পুলিশদের সে-আমলের দাপট। বিধু দারোগা ছিলেন সেই দাপুটেদের মধ্যেও আর-এক কাঠি দাপুটে। তাঁর দাপটে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায় এ কেবল কথার কথা নয়। তিনি গঞ্জে এসেই ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন যে, সামনের হাটবারে সবাই যেন স্বচক্ষে দেখে যায়, থানার উত্তর ধারের দিঘিতে বাঘে আর গোরুতে একঘাটে জল খাবে।

সেই হাটবারে দিঘির ধারে লোক ভেঙে পড়ল। বাঁধানো ঘাটে বিশাল চেহারার বিধু দারোগা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে কেউ হাসতে দেখেনি কখনো। ভীষণ রাগী চোখে চারদিকে চেয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ যার ওপর পড়ছে সে-ই নিজের জায়গা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের ব্যায়ামবীর ছোটোকাকাও তিনবার জায়গা বদল করে অবশেষে কচুবনের ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ জোরে কথা বলছে না, ফিসফাস গুজগুজ করছে। সবাই শুনে আসছে বটে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ার কথা, কিন্তু কেউ কখনো দেখেনি। হারু মণ্ডলের বাঁকানো শিংওলা দুষ্টু গোরুটা খুঁটোয় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাঘ তখনও দেখা যাচ্ছে না। তাই নিয়ে সকলের কৌতূহল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। পাশের গাঁয়ে প্রবর্তক সার্কাস গত অমাবস্যা থেকে খেলা দেখাচ্ছে। সেদিক থেকে একটা খাঁচাওলা গাড়ি বলদে টেনে আনল। খাঁচার মধ্যে গলায় দড়ি বাঁধা বাঘ বসে ঝিমোচ্ছে। অনেকে ফিসফিস করে বলল, বাঘকে আফিং খাইয়ে রাখে কিনা, তাই ওই ঝিমুনি।

তা সে যাই হোক, গায়ে গেঞ্জি আর কালো ফুলপ্যান্ট পরা রোগা রিংমাস্টার লোকটা হাতে চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খাঁচার দরজায়, দু-জন লোক খাঁচার দরজাটা ওপর থেকে টেনে তুলল। খাঁচার দরজা খোলা হতেই লোকজন সব দুড়দাড় দৌড়ে খানিক তফাতে গিয়ে

দাঁড়াল। ঘাটে রইলেন শুধু রিংমাস্টার, হারু মণ্ডল, বিধু দারোগা আর সার্কাসের দু-জন লোক। থানার সিপাইরাও সব তফাতে এসে দাঁড়াল। বাঘ বেরোবে, ইয়ার্কির কথা নয়।

তা বাঘটা আফিংখোরই হবে। রিংমাস্টার বিস্তর চাবুকের শব্দ করল, খোঁচাল, তবু বেরোয় না। বার তিনেক হাই তুলল অবিকল বুড়ো মানুষের মতো শব্দ করে। দারোগামশাই ধমক দিয়ে বললেন, 'টেনে বের করো কুলাঙ্গারটাকে।' রিংমাস্টার সেলাম দিয়ে বলল, 'আপনাকে সামনে দেখে একটু ভয় খেয়েছে।'

অবশেষে দড়ি ধরে টানাহ্যাঁচড়া করে তাকে বের করা হল। কী আলিস্যি তার! বাইরে বেরিয়েও অবিকল বেড়ালের মতো ডন মারল একটা, তারপর ঘুমচোখে চারদিকে চাইতে লাগল। মনে হল, বাঘটা চোখে ভালো দেখতে পায় না, ভুরু কোঁচকানো, খুব ঠাহর করে করে দেখছে।

বিধু দারোগা হাঁক ছাড়লেন, 'দুটোকে জলের কাছে নিয়ে যা।'

তখন হারু মণ্ডল তার দুষ্টু গোরুটাকে আর রিংমাস্টার তার আসল বাঘটাকে দড়ি ধরে টানতে লাগল। অনেক টানাহ্যাঁচড়ার পর দুটোকে জলের কাছে নিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করানো হল বটে, কিন্তু কেউই জলে মুখ দেয় না। বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ার কথা। জলই যদি না খায় তো দারোগাবাবুর সম্মান থাকে কী করে! তাই তখন হারু মণ্ডল তার গোরুর গলকম্বলে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বলতে লাগল, 'খাও মা ভগবতী, জল খাও। এই একবারটি খাও মা, আর কখনো বলব না। ওই ছাগলের মতো বাঘটাকে দেখে ডরিয়ো না মা, ওর দাঁত নড়ে, চোখে ছানি, বড্ড ভিতু জীব।'

ওদিকে রিংমাস্টার সপাসপ চাবুকের শব্দ করে বাঘটার ল্যাজ মলে দিয়ে বলে, 'ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেঙ্গল-টাইগার, ড্রিঙ্ক, কাম কাম, হ্যাভ কারেজ, দি কাউ উইল ফ্লাই অ্যান্ড শো হার লেজ। ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক—'

দারোগাবাবু উঠে ফের হাঁক দিলেন, 'দুটোর দড়ি খুলে দে। আপসে জল খাবে।'

তো তাই হল। হারু মণ্ডল তার গোরুটাকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'কাল থেকে তোকে জল দিইনি মা, দারোগাবাবুর মুখ চেয়ে এতক্ষণ তেষ্টায় কাঠ করে রেখেছি, এবার চোঁ করে পেট ভাসিয়ে খা মা।'

রিংমাস্টারও তার বাঘকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ইউ হ্যাভ নো ওয়াটার ফর টু ডেজ বেঙ্গল, নাউ ড্রিঙ্ক।'

দৃশ্যটা দেখার মতোই। এই আমরা প্রথম দেখলাম জীবনে। একটা গোরু আর একটা বাঘ পাশাপাশি ভাই-বোনের মতো দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে একঘাটে জল খাচ্ছে। সবাই রইরই করে উঠে দারোগাবাবুর জয়ধ্বনি দিতে থাকল। কবিয়াল দু-কড়ি হালদার গান বেঁধে গাইতে লাগল,

'ধন্য হে দারোগা বিধু, তুমি ধন্য ধন্য হে।।
একই ঘাটে জল খায় গাই আর ব্যাঘ্র বন্য হে—'

কিন্তু জয়ধ্বনির রেশ তখনও মিলিয়ে যায়নি, দু-কড়ি কবিয়াল 'হের'র টান দিয়ে তখনও দম ধরে রেখেছে এমন সময়ে বাঘটা জল থেকে মুখ তুলে গোরুটার দিকে তাকাল। গোরুটাও তাকাল বাঘটার দিকে। ফোঁস ফোঁস করে দু-জনেরই নিশ্বাস পড়ল। বাঘটা গোরু চেনে। সে গন্ধ পেয়ে পাশে দাঁড়ানো গোরুটাকে শুঁকছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না বলে বোধহয় ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। কিন্তু হারু মণ্ডলের গোরু কখনো বাঘ দেখেনি, তাই সে একটুও ঘাবড়াল না। বরং সে বেশ রাগের চোখে বাঘটাকে দেখতে লাগল। সেটা হাড়-হারামজাদা গোরু, বহুবার খোঁট উপড়েছে, খোঁয়াড়ে গেছে, তার গুঁতো খায়নি এমন

মানুষ গাঁয়ে বিরল। বাঘটার ভাবসাব দেখে সে বোধ হয় বেশ বিরক্ত হয়েছিল, তাই বাঘের মুখের ওপরেই সে ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে একটু এগোল।

দারোগাবাবু মহানন্দে গোঁফ চুমরে দৃশ্যটা দেখছেন তখন। হাসেন না বটে, কিন্তু হাসি তাঁর চোখের দৃষ্টি, গালের মাংস আর ভাবভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠেছিল। বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাচ্ছে।

গোরুর ফোঁস শুনে বাঘটা দু-পা পিছিয়ে এল। বহুকাল অভ্যাস নেই বলেই বোধহয় হাঙ্গামায় যেতে চাইল না। কিন্তু গোরুটাও বদমেজাজি। তার তখন রোখ চেপেছে। সে একটু শিং নাড়া দিয়ে দু-পা এগোল। বাঘটা আবার পিছিয়ে আসে। গোরুটা একটা 'হাম্বা' দিয়ে হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে মাথাটা নীচু করে হড়হড় করে এসে হুম করে একটা ঢুঁ দিল বাঘটাকে। বাঘটা মারপিট ভুলেই গেছে। আচমকা ঢুঁটা খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা মেরে আলিস্যি ঝেড়ে দুই লাফে উঠে এল ঘাটের চাতালে। পিছনে গোরুটা।

দারোগাবাবু চেয়ার ছেড়ে পইঠায় উঠে গেলেন সাঁত করে। লোকে থ। এমনটা হবে কেউ ভাবেনি।..এ কী দৃশ্য রে বাবা! প্রকৃতির সব নিয়মকানুন যে ভণ্ডুল হয়ে গেল। বাঘটা তখন দিঘির ধারের মাঠটায় প্রাণভয়ে ছুটছে। হারুর গোরু মহাতেজে শিং নেড়ে দৌড়োচ্ছে তার পিছু পিছু, গুঁতোবেই। বাঘটা হালুম-মলুম বলে ডাক ছাড়ছে প্রাণপণে। গোরুটা হাম্বা-খাম্বা বলে তম্বি করছে তাকে। সে কী দৌড়! যেমন বাঘ ছোটে, তেমনি গোরু। ছুটতে ছুটতে বাঘের দমসম অবস্থা। ভারি কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা। হারু মণ্ডল বিস্তর ডাকাডাকি আর সাধাসাধি করে তার গোরুকে ফেরাতে চাইছে। গোরু ফিরছে না। রিংমাস্টার ডুকরে উঠে বলছে, 'ও ভাই হারু, আমার গরিব বাঘটাকে তোমার গোরু মেরে ফেললে!'

তা ফেলতই মেরে। বাঘটা ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে পড়েছে তখন, গোরুটা মহাতেজে প্রায় ধরো ধরো করে ফেলেছে তাকে, এমন সময়ে হারু মণ্ডল গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল তার ভগবতীর সামনে, বলল, 'মা গো, অনেক লীলা দেখিয়েছ মা। অনেক বাঘ-সিংহী ধরে দেব মা তোমায়, সব ক-টাকে গুঁতিয়ে টিট কোরো। আজ যে তোমার জাবনার সময় হয়ে গেছে মা।'

এইসব শুনে ভগবতী দাঁড়িয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। বাঘটাও ফাঁক বুঝে একলাফে খাঁচায় ঢুকে ঝাঁপের দরজাটা ফেলবার জন্য নিজেই পিছনের দু-পায়ে দাঁড়িয়ে টানাটানি করতে লাগল। খাঁচার ওপরের লোক দু-জন ঘাপটি মেরে ছিল, তাক বুঝে ঝপ করে দরজা ফেলে দিল। বাঘটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে হ্যা হ্যা করে হাঁফাতে লাগল।

এই ঘটনার পর বিধু দারোগার নাম-যশ সহস্রগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গঞ্জে। তাঁর রাজত্বে শুধু বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায় না, সেখানে গোরুর তাড়ায় বাঘেরও জান লবেজান হওয়ার জোগাড়। সুতরাং সাবধান!

সবাই তাই সাবধান হয়ে গেল। চুরি-ছ্যাঁচড়ামি বন্ধ, ডাকাতি বাড়ন্ত, ঝগড়াঝাঁটি পর্যন্ত দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রবীণ লোকেরা থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে জুতো ছেড়ে রেখে থানার উদ্দেশে হাতজোড় করে ভক্তিভরে প্রণাম করে যায়। যেমন সবাই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে করে। বিধু দারোগা ব্যাপার দেখেন আর হাসেন। না, হাসেন না ঠিক, কিন্তু হাসি তাঁর গোঁফের ডগায় ঝুলে থাকে, নাকের ডগায় কাঁপে, ভুরুতে নাচে। সবাই বুঝতে পারে, বিধু দারোগা হাসছেন। অথচ হাসছেন না। ময়রারা দারোগা-সন্দেশ, বিধু-অমৃতি বের করে ফেলল। খুব বিক্রি।

ওদিকে ভগবতীরও খুব নামডাক। গঞ্জের লোক তো আছেই, আশপাশের গাঁ-গঞ্জ, বহু দূরের ভিন গাঁ, এমনকী শহর থেকে পর্যন্ত লোক ঝেঁটিয়ে আসছে রোজ। ভিড়েক্কে ভিড়।

সকলেই ভগবতীর জন্য রাশি রাশি খাবার আনছে। শাকপাতা, লাউটা, কুমড়োটা তো আছেই, সেই সঙ্গে সন্দেশ-রসগোল্লা, দুধ, দই, এমনকী ঘি-মাখন পর্যন্ত। হারু মণ্ডলের গোয়ালঘরে পাহাড়প্রমাণ খাবার জমে গেল। অলৌকিক গোরুর মহিমা শুনে জমিদারমশাই বিলিতি নেট দিয়ে ভগবতীর জন্য ভালো মশারি করে দিলেন, সেই সঙ্গে সাটিনের বালিশ, তাকিয়া পর্যন্ত। ভগবতী সারাদিন ঘরে বসে খায়, রাতে মশারির তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে জাবর কাটে আর ঘুমোয়। তার এই তাগড়াই চেহারা হয়েছে। মোটা হয়ে গরমে হাঁসফাঁস করলে ভক্তরা তাকে হাতপাখার বাতাস করে ঠান্ডা রাখে। সাহাগঞ্জে 'ভগবতী বিদ্যালয়' নামে ইস্কুল খোলা হল। 'ভগবতী তৈল' নামে একটা বাতের মালিশ বেরিয়ে গেল।

তখন কিছুদিনের জন্য ভগবতী গোরু আর বিধু দারোগার কথা ছাড়া লোকের মুখে অন্য কথা নেই। বিক্রি মন্দা বলে সার্কাসওলা তাঁবু গুটিয়ে পালিয়েছে। কাছেপিঠে আর বাঘ-ভালুকও নেই যে ভগবতী গিয়ে গুঁতোবে। খেতে খেতে চোয়াল ব্যথা।

বিধু দারোগার দশাও তাই। চোর নেই, ডাকাত নেই। শুয়ে বসে গতরে জং ধরে গেল। লোকে রোজ পাঁঠা, মুরগি, ডিম, তরিতরকারি, মাছ দিয়ে যায়। খেতে খেতে খিদে মরে গেছে। বহুকাল আর খিদে পায় না বিধু দারোগার। খাবার দেখলে হাই ওঠে। দারোগার ঘোড়াটার পর্যন্ত পায়ে চর্বি জমেছে। নিয়মমাফিক রোজ একবার বিধু দারোগা ঘোড়ার পিঠে চড়ে গঞ্জে চক্কর মারেন। নাঃ, কোথাও কোনো হাঙ্গামা হয়নি। বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে থানার দাওয়ায় বসে গম্ভীরভাবে হুঁকো টানেন তিনি।

একদিন সকালে একটা লোক আধমণ ওজনের একটা পাকা রুইমাছ নিয়ে এসে দারোগা সাহেবকে প্রণাম করে হাতজোড় করে সামনে বসল। বিধু দারোগা প্রকাণ্ড মাছটা দেখে অরুচিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটা ভাবল, দারোগা সাহেবের বুঝি এত ছোটো মাছ পছন্দ হয়নি, তাই ভয় খেয়ে মিনমিন করে বলল, 'বড়োবাবু, আমার পুকুরে এর চেয়ে বড়ো মাছ আর নেই। অমি ক্ষুদ্র মানুষ, আমার মাছটাও পুঁটিমাছের মতো ছোটো, তবু যদি আপনার ভোগে লাগে তো—'

বিধু দারোগা ফস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খিদে পায় না যে বাপ, আমার যে আর খিদে পায় না। বড্ড অরুচি।'

লোকটা ফের একটা প্রণাম করে বলে, 'বড়োবাবু, অপরাধ নেবেন না, তা যদি বলেন তো বলি, ঠাকুর-দেবতারাও কোন জন্মে অমৃত খেয়ে গ্যাঁট বসে আছেন, খিদে তো তাঁদেরও পাওয়ার কথা নয়। তবু কী লোকে ভোগ, নৈবিদ্যি দিতে ছাড়ে। ভক্তদের মুখ চেয়েই তাঁরা অরুচি নিয়েও খান। আমি তো বুড়ো হতে চললাম, তবু জন্মেও শুনিনি যে রাজা-জমিদার কিংবা লাট বা দারোগার কখনো খিদে পেয়েছে। খিদে তাঁদের কখনো পায় না, দেবতুল্য লোক সব। তবু খেতে হয়, আমাদের মুখ চেয়েই। আমাদের মতো ছোটোলোক হা-ঘরেদেরই যত খিদে হুজুর।'

লোকটা লাট আর দারোগা একসঙ্গে বলায় দারোগাসাহেব খুশি হলেন। একটু হাসলেন। না, ঠিক হাসি নয় বটে, তবে টাকটা যেন একুট চকচক করে উঠল, গালের মাংসে একটু ঢেউ দিল, ভুঁড়িটা কয়েকবার কেঁপে উঠল। হাসি নয়, অথচ যেন হাসি। আবার একটা শ্বাস ফেলে বললেন, 'খিদেই বা পাবে কী করে! নড়াচড়া নেই, কাজকর্ম নেই, একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, তোরাই বা সব কেমনধারা মানুষ, দারোগাবাবুর খিদে পায় না শুনছিস, সেজন্যও তো একটু শখ করে চুরিচামারি করতে পারিস। চোর-ছ্যাঁচড়ের পিছনে হাঁকডাক দৌড়োদৌড়ি করতে করতে আমারও একটু খিদের মতো হয় তা হলে। কেমন নির্দয় মানুষ তোরা, অ্যাঁ?'

শুনে লোকটা কান পর্যন্ত হাসল। ফের একটা প্রণাম ঠুকে বলল, 'আজ্ঞে বড়োবাবু, সেইজন্যই আসা। সফরগঞ্জে শ্মশানের ধারে কসারবনের মধ্যে বুড়ো বটের তলায় এক কাপালিক এসে থানা গেড়েছে ক-দিন হল। বড়ো সাংঘাতিক লোক। বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। শুনছি, আজ অমাবস্যার রাতে সেখানে নরবলি হবে। বড়ো ভয়ে ভয়ে আছি আমরা।'

শুনে বিধু দারোগা একটা হুংকার ছাড়লেন, 'বটে!'

সেই হুংকারে গঞ্জের বাড়িঘর কেঁপে উঠল, ঘোড়াটা 'চিঁহি' ডেকে লাফিয়ে উঠল, ধারেকাছের লোকজন সব সাঁত সাঁত করে লুকিয়ে পড়তে লাগল, বাচ্চারা কঁকিয়ে উঠল, বেড়াল পালাল, কুকুর কেঁদে উঠল, আর কাকগুলো বন্দুকের আওয়াজ ভেবে কা-কা করে ভিড় করতে লাগল আশেপাশে। যে লোকটা মাছ নিয়ে এসেছিল তারও একটু মূর্ছামতো হয়েছিল, খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে সে চোখ মেলে বড়ো সুখে হাসল। হ্যাঁ, এই হল গিয়ে আসল দারোগা। আবার একটা প্রণাম করল সে।

অমাবস্যার নিশুতি রাতে দারোগাবাবু ঘোড়ায় চেপে সফরগঞ্জের শ্মশানে চললেন। সঙ্গে বিস্তর সিপাই, অনেক লোকজন। তাদের হুংকারে শেয়াল পালাল, পাখিরা ঘুম ভেঙে চেঁচামেচি করতে লাগল। খটাস, ভাম, বেজি, খরগোশ সব জঙ্গলের ছোটো ছোটো জীব গর্তে সেঁদিয়ে কাঁপতে লাগল। বিধু দারোগা বুড়ো বটগাছের তলায় এসে হাঁক ছাড়লেন, 'কোথায় কাপালিক?'

কাপালিকই নেই। দারোগাবাবু পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে দেখলেন, খবরটা মিথ্যে নয়। নিভু নিভু হয়ে একটা ধুনি তখনও জ্বলছে, আশেপাশে বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গেল, একটা চকচকে খাঁড়া পড়ে আছে, একপাশে একটা হাঁড়িকাঠও রয়েছে। দারোগাবাবু পিস্তল বেব.করে ফের হাঁক দিলেন, 'কোথায় গেল সেই হারামজাদা কাপালিকটা?'

তাই তো! কোথায় পালাল! সবাই ভাবছে।

এমন সময়ে গাছের মগডাল থেকে করুণ স্বরে কে যেন বলে উঠল, 'হুজুর আমি এইখানে, ভয়ের চোটে বড্ড উঁচু গাছে উঠে পড়েছি, এখন নামতে পারছি না। বাতিটা একটু ধরুন।'

অবাক হয়ে দারোগাবাবু উঁচুতে আলো ফেললেন। বটগাছের ঝুরি আর পাতার ফাঁক দিয়ে অনেক উঁচুতে কাপালিকের লাল কাপড় দেখা গেল, আর দাড়িগোঁফ। দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'নেমে আয়।'

সিড়িঙ্গে চেহারার কাপালিকটা সাবধানে নেমে এল। টর্চের আলো মুখে পড়তেই চোখ পিটপিট করে ভারি ভিতু চোখে চাইল, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দারোগাবাবুর ঘোড়ার পায়ের ওপর, বলতে লাগল, 'বড়োবাবু মাপ করুন।' লোকটার চেহারা আর ভাবভঙ্গি দেখে বিধু দারোগা হতাশ হয়ে বললেন, 'তোর বাঘ কই?'

'আজ্ঞে আপনাকে দেখে ভয় খেয়ে ওইদিকের একটা আমগাছে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে বসে আছে। বড্ড ভিতু।'

দারোগাবাবু করাল চোখে চেয়ে বললেন, 'আর নরবলি যাকে দিবি সে লোকটা কোথায়?'

কাপালিক কেঁদে উঠে বলল, 'কোথায় নরবলি হুজুর! কত লোককে সাধ্যসাধনা করলাম, পায়ে ধরলাম, ভয় দেখালাম, কেউ রাজি হল না। তাদেরও দোষ দিই না, বলি হতে কে-ই বা সহজে রাজি হয়! হুজুর, বলির কথা না রটালে লোকে সমীহ করে না। তাই রটিয়েছিলাম। কিন্তু, আমি আসলে কাপালিক-টাপালিক নই হুজুর, আমাকে চিনতে পারছেন না। আমি সেই রিংমাস্টার।'

রিংমাস্টার! সবাই হাঁ হয়ে গেল। তাই তো! দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে রিং মাস্টারকে তো চেনা যাচ্ছে একটু একটু। রিংমাস্টার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হারু মণ্ডলের গুন্ডা গোরুর তাড়া খেয়ে আমার বাঘটা সেই যে পালিয়েছিল তাইতে আমার আর বাঘের খুব

বদনাম হয়ে যায়। তাই সার্কাস থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে খিদের জ্বালায় দু-জনে জ্বলেপুড়ে মরছি। নরবলি-টলি ওসব বাজে কথা, আমরা দু-জনেই ভারি ভিতু জীব বড়োবাবু।'

দারোগাবাবু হাসলেন। না, ঠিক হাসি নয়। তবে তাঁর ভুরু চমকাল, কানটা যেন নড়ে উঠল, গোঁফের ডগা নীচু থেকে ওপরে উঠে গেল। হাসলেন না, তবু যেন হাসলেন। টর্চের আলোয় সবাই দেখল।

রিংমাস্টার আর তার বাঘকে গ্রেফতার করে আনা হল থানার। লোক ভেঙে পড়ল দেখতে। রিংমাস্টারের দাড়ি চুল সব কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। থানায় হাতায় কদমগাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা বাঘটা লজ্জায় থাবায় মুখ লুকিয়ে মাথা নীচু করে বসে আছে।

হারু মণ্ডল দারোগাবাবুকে প্রণাম ঠুকে বলল, 'হুজুর, আমার একটা আর্জি আছে আপনার কাছে বরাবর। আমার ভগবতী কিছু খেতে চায় না। খেলার সঙ্গী নেই বলে দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না, তাই খিদে হয় না। গাঁ-গঞ্জের ষাঁড়, গোরু সবাই তাকে ভয় খায়, তাই কেউ মেশে না ওর সঙ্গে। তাই বলি, হুজুর বাঘটা আমায় দিয়ে দিন। ভগবতী ওকে টুঁ মেরে মেরে খেলবে। তাতে ওর খিদে হবে। আমি বরং বাঘের দাম বাবদ একশো টাকা ধরে দিচ্ছি।'

তো তাই হল। হারু মণ্ডল দড়ি বেঁধে বাঘটাকে টানাহ্যাঁচড়া করে নিয়ে গেল। পথে লোকজনকে ডেকে ডেকে বলল, 'সস্তায় বাঘ কিনলাম হে।'

কিন্তু ভগবতী মোটা হয়ে যাওয়ার পর থেকে খুব অলস হয়ে পড়েছিল। বাঘটাকে দেখেও তেড়েটেড়ে গেল না, কেবল একটা ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল। সেই শ্বাসের শব্দে বাঘটা পালাতে যাচ্ছিল, হারু মণ্ডল তাকে খড়মপেটা করে টেনে আনল ফের। ভগবতীর গোয়ালেই বেঁধে রাখল তাকে।

সেই থেকে বাঘটা গোয়ালেই থাকে। মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড়মাখা ভাত খায়। মাঝে মাঝে ভগবতীর জাবনার গামলাতেও মুখ দিয়ে বিস্বাদে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু চেষ্টা রাখে। ভগবতী স্নেহভরে মাঝে মাঝে বাঘটার গা চেটে দেয়। বাঘটা থাবা দিয়ে ভগবতীর পিঠ চুলকোয়।

দেশসুদ্ধু লোক ভেঙে পড়ে দেখতে। হুঁ বাবা, বাঘে-গোরুতে এক গোয়ালে থাকে! দু-কড়ি কবিয়াল গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়,

'বিধুর নামে দাওরে জয়ধ্বনি।।
বিধু মোদের নয়নের মণি।।
ভগবতীর নামে দাও গো জয় জোকার।।
তাঁর গোহালে বাঘের কারাগার।।
জয় জয় বিধু ভাগ্যবান।।
রাতির বেলায় দিনের আলো, দিনে জ্যোৎস্নার বান...'

শুনে বিধু দারোগা হাসেন। না, হাসি নয় ঠিক। তাঁর গোঁফের ডগায় যেন হাসি দোল খায়, চোখের মণির ভিতরে যেন ঝিকমিক করে, ভুঁড়িটা কেঁপে ওঠে, নাকের ডগা নড়ে, কান দুটো ফড়িঙের পাখনার মতো থিরথির করে ওঠে। হাসেন না। তবু যেন হাসেন।

ভালোমানুষ হরবাবু

বাড়িতে চোর ঢুকেছে টের পেয়ে হরবাবু বিছানায় উঠে বসে আপনমনে বললেন—'এসব কী অসভ্যতা?'

ভারি বিরক্ত হয়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে চুপ করে বসে জ্যোৎস্না দেখতে লাগলেন। চুরিটুরি খুব অপছন্দ করেন হরবাবু। তাঁর চোখের সামনেই চুরি হোক—এটা তাঁর সহ্য হবে না।

চোরটা বড়োই নির্লজ্জ। পাপ কাজ গোপন করার কোনো চেষ্টাই নেই। বারান্দায় বসেই তিনি শুনতে পেলেন, ঘরে বাক্সপ্যাঁটরা নাড়ার, বাসনকোসন পড়ার, আলমারি ভাঙার বিকট সব শব্দ হচ্ছে।

রেগে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে হরবাবু ধমক মারলেন—'আস্তে! বেহায়া কোথাকার!'

চোরটা বা চোরেরা তাতে খানিকটা সাড়াশব্দ কম করতে লাগল। কিন্তু ব্যাটাদের কাজ আর শেষ হয় না। ভারি আনাড়ি চোর সব হয়েছে আজকাল। কিছু শিখবে না, জানবে না, দু-দিন একটু ট্রেনিং নিয়েই কাজে নেমে পড়ে।

হরবাবু জ্যোৎস্না দেখতেই লাগলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘর থেকে একটা কর্কশ গলা যতদূর সম্ভব মোলায়েম হয়ে বলল—'কাম সারা হয়ে গেছে বড়োবাবু। এখন আরাম করে শুয়ে পড়ুন।'

হাই তুলে হরবাবু উঠলেন এবং ঘরে গিয়ে বিছানায় শুলেন। ভারি লোভী আর অভদ্র চোর সব আজকালকার। বিছানার চাদর, বালিশের পাশে টর্চ—সব নিয়ে গেছে। কাঁসার গ্লাসে জল ঢেকে রেখেছিলেন রাতে খাবেন বলে, সেটা সুদ্ধু নেই।

চোরে সব নিয়ে গেছে। তবু তো বাজার করতে হবে, রাঁধতে হবে, খেতেও হবে। হরবাবু তাই ধারকর্জ করে বাজারে চললেন সকালবেলায়।

আলুওলা, পটলওলা, মাছওলা সবাই ভালোমানুষ হরবাবুকে ভালোভাবে চেনে। হরবাবুর যেদিন আলুর দরকার নেই সেদিনও আলুওলা তাঁকে পাকড়াও করে ব্যাগের মধ্যে জোর করে দু-কেজি আলু ঢুকিয়ে দেয়। হরবাবু ঝিঙে বা করলা খান না, কিন্তু তা বলে ঝিঙে বা করলাওয়ালারা তাঁকে ছাড়ে না। প্রায় দিনই তাঁকে সেরখানেক ঝিঙে আর করলা কিনে আনতে হয়। সেগুলো ঘরে পড়ে থেকে পচে যায়। হরবাবু আপন মনে রাগারাগি করেন—'তরকারিওয়ালারা হয়েছে যত সব গুন্ডা বদমাশ।'

ধার করা পয়সায় বাজার করতে বেরিয়েছেন, রাস্তায় খলিফা হালদারের সঙ্গে দেখা।

—'এই যে হর, তুমি যে মাস তিনেক আগে একশো টাকা ধার নিয়েছিলে, তার কী করলে?'

হরবাবু খুব ব্যথিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কথাটা ঠিকই যে মাস তিনেক আগে হরবাবু খলিফা হালদারের কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু হরবাবুর খুবই স্পষ্ট মনে আছে যে, একমাস বাদেই টাকাটা শোধ করেছিলেন। কিন্তু সেটি খলিফাবাবুর মনে ছিল না বলে পরের মাসেই আবার নতুন করে টাকাটা তাঁকে শোধ করতে হয়। সেটাও

হরবাবু হাসিমুখেই মেনে নেন। ভুল তো মানুষের হয়ই। কিন্তু ফের গত মাসেও খলিফা সেই একশো টাকার তাগাদা দেওয়াতে খানিকটা বিরক্ত হয়েই হরবাবু আবার টাকাটা শোধ করেন। সে যা যাওয়ার গেছে। কিন্তু খলিফা আজ আবার চাইছে!

হরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন—'টাকাটা কি আপনাকে দিইনি?'

—'দিয়েছো? কবে দিলে? কই, আমার তো মনে পড়ছে না।'

হরবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে লজ্জার সঙ্গে বলেন—'তাহলে তো দিতেই হয়। তা নেবেন। দু-চার দিনের মধ্যেই দিয়ে দেবো।'

মুদির দোকান থেকে ধারে জিনিস কেনেন হরবাবু। মুদি হরবাবুকে জক দিয়ে বলে—'আপনার হিসেবটা দেখে নেন হরবাবু। গত মাসে আপনি একশো বাহাত্তর টাকা বিরাশি পয়সার জিনিস নিয়েছেন।'

হরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, মুদির দোকানের হিসেব তিনিও নোট বইতে লিখে রাখেন। তাঁর হিসেবমতো মোটে বাষট্টি টাকা পনেরো পয়সা হয়েছে। কিন্তু কারও মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে তাঁর বড়ো কষ্ট হয়।

তাই বললেন—'আচ্ছা, দেবো'খন। কয়েক দিনের মধ্যেই দেবো।'

বাজার থেকে ফিরে রান্নাবান্না করে খেতে গিয়ে ভারি অসুবিধে হল আজ। বাসনপত্র নেই, বাজার থেকে মেটে হাঁড়ি আর কলাপাতা এনেছেন। মোটে হাঁড়িতে কোনোক্রমে সেদ্ধ ভাত করে কলাপাতায় খেয়ে ইস্কুলে চললেন। তিনি অঙ্কের মাস্টারমশাই।

বাজার-হাটে পথে-ঘাটে রাজ্যের ভিখিরি। আজকালকার ভিখিরিরাও ভারি ত্যাঁদড়। বেশিরভাগ লোকই ভিক্ষে-টিক্ষে দেয় না একটা, যারা যা-ও দেয় সে-ও দু-এক পয়সার বেশি নয়। কিন্তু হরবাবুর কথা আলাদা। ভিখিরিরা তাকে দেখলেই সব নেচে ওঠে। পাঁচ-দশ পয়সা দিলে ভারি চটে যায় ভিখিরিরা। একবার একটা বুড়ো ভিখিরিকে মোটে দশ পয়সা দিয়েছিলেন তিনি। তাতে সে চটে উঠে পয়সাটা ফেরত দিয়ে বলেছিল—'এঃ দশ পয়সা দিয়েছ। কেন, আমরা কি ভিখিরি নাকি?'

তাই বাধ্য হয়েই হরবাবুকে চার আনা, আট আনা দিতে হয়। তাতে খুশি না হয়ে ভিখিরিরা এক টাকা দু-টাকা চাইতে থাকে। হরবাবু খুবই রেগে যান। কিন্তু কী আর বলবেন।

ইস্কুলের ছেলেরাই কী কিছু ভালো?

হরবাবু ক্লাসে যাওয়ার আগে থেকেই ক্লাস সিক্সের ছেলেরা হাল্লাচিল্লা করছিল। কিছু ছেলে গল্পের বই পড়ছে, কেউ কাটাকুটি খেলছে, চেঁচিয়ে গল্প করছে, কিছু বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরবাবু ক্লাসে ঢুকতেই হল্লা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। হাতাহাতি চলছে, চেঁচামেচি হচ্ছে, এমনকী ক্লাসের পিছন দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় কাগজ পাকিয়ে বল বানিয়ে কয়েকটা ছেলে ফুটবলও খেলছিল, হরবাবুকে কিছু না বলেই কয়েকজন জল খেতে বা বাথরুমে চলে গেল।

হরবাবু কোনোদিকে নজর দিলেন না। ব্ল্যাকবোর্ডে একটা অঙ্ক দিয়ে মিনমিন করে বললেন—'কষে ফেল, গোল কোরো না।'

সে কথা কারও কানেই গেল না। হরবাবু বিরক্ত হয়ে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। ছেলেগুলো যে কেন এত গণ্ডগোল করে! খানিক বাদে উঠে তিনি আপন মনে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কটা কষে দিয়ে বললেন—'টুকে নাও সব।'

কেউ টুকল না।

হরবাবু কোনো ছাত্রকে কখনো মারেননি, বকেননি, কাউকে উপদেশ পর্যন্ত দেননি। পরীক্ষার সময়ে তিনি যে ঘরে গার্ড দেন সে ঘরের ছেলেদের পোয়াবারো। আজ পর্যন্ত কারও টোকা ধরেননি হরবাবু। চোখে পড়লেও অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেন তাড়াতাড়ি।

অন্য মাস্টারমশাইরা হরবাবুকে নিয়ে ইয়ার্কি, ঠাট্টা-মশকরা করেন। হরবাবু চুপ করে হাসিমুখে সব শোনেন, কারও কথার ওপর কথা বলেন না। আবার গোপনে অনেকেই তাঁর কাছ থেকে ধারকর্জও নেন। শোধ না দিলেও হরবাবু কিছু বলতে পারেন না।

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে কালীবাড়ির গলিতে একটা পেল্লায় ষাঁড়ের মুখোমুখি পড়ে গেলেন হরবাবু। পাশ দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। কিন্তু বজ্জাত ষাঁড়টা কাছে এসে যেন ইয়ার্কি করতেই একবার মাথানাড়া দিল, ডান পাঁজরে ষাঁড়ের শিংটা পট করে লাগতেই যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু ষাঁড়টাকে কিছুই বলেন না।

তালপুকুরের পাশ দিয়ে আসবার সময়ে একটা রাস্তার কুকুর খুবই অভদ্রভাবে হরবাবুর দিকে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে এলেন। কুকুরটাকে একটা ধমকও দিলেন না।

সন্ধ্যের পর হরবাবু একটু বেড়াতে বেরোন। রোজকার অভ্যাস।

বেড়াতে বেড়াতে একেবারে নির্জন নদীর ধারে চলে এলেন। খুব জ্যোৎস্না, প্রকাণ্ড আকাশ, বিশাল শূন্যতায় তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। কী আনন্দই যে হচ্ছে। কী আনন্দ আর শান্তিই না চারদিকে।

ঠিক এই সময়ে কোত্থেকে একটা বিশাল চোয়াড়ে চেহারার লোক সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল—'যা আছে দিয়ে দিন।'

লোকটার হাতে প্রকাণ্ড ছোরা। হরবাবু ভীষণ বিরক্ত হলেন। এই সন্ধেবেলার আনন্দটা কেউ মাটি করলে তিনি অসম্ভব চটে যান।

দেওয়ার মতো কিছু নেইও। কাল রাতে সব চুরি হয়ে গেছে। হরবাবু মিনমিন করে লোকটাকে বললেন, 'দিচ্ছি। তবে গোল কোরো না। এখন গোলমাল করলে আমার ভারি অসুবিধে।'

বলে পকেটে টাকাপয়সা যা ছিল সব দিয়ে দিলেন লোকটাকে। লোকটাও হরবাবুর অবস্থা বুঝে বেশি ঘাঁটাল না, শুধু পকেট থেকে কলমটা টেনে নিয়ে গেল। যাক, হরবাবু আবার চারদিকের গভীর নির্জন আনন্দে ডুবে গেলেন।

বেশ কেটে যাচ্ছিল সময়টা। কিন্তু হঠাৎ একটু দূর থেকে একটা প্রবল চেঁচানি উঠল—'বাঁচাও, বাঁচাও। মেরে ফেললে!'

মনোযোগটা ছিন্ন হওয়ায় খুবই রেগে গেলেন হরবাবু। এসব কী? এমন সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে একা একটু নির্জনে বসে থাকবেন তার জো নেই?

প্রথমটায় চুপ করেই ছিলেন হরবাবু। কিন্তু আবার শুনলেন একটা মেয়ে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চেঁচাচ্ছে আর অন্য একটা হেঁড়ে গলা ধমকাচ্ছে—'চুপ। শব্দ করলে মেরে ফেলব!'

না, এর একটা বিহিত করা দরকার। একটু নির্জনে বসে থাকতে পারব না—এটা কেমন বিশ্রী ব্যাপার। এই ভেবে হরবাবু উঠে পড়লেন।

চাঁদমারীর ঢিবিটা পার হয়ে হরবাবু দেখতে পেলেন একজোড়া স্বামী-স্ত্রী আর একটা বাচ্চা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছিল। তাদের সামনে সেই প্রকাণ্ড চেহারার চোয়াড়ে লোকটা ছোরা হাতে খুব আস্ফালন করছে।

হরবাবু দাঁত কড়মড় করেন—ছিনতাই করছিস কর, তা বলে চেঁচামেচি করে লোকের শান্তি নষ্ট করবি? এমন দুধ-জ্যোৎস্নার রাতটা মাটি করে দিবি? লোককে একটু ধ্যানস্থ হয়ে আনন্দ ভোগ করতে দিবি না?

হরবাবু রেগে হেঁটে গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে ধমক মেরে বললেন—'পেয়েছিস কী তুই? অ্যাঁ! পেয়েছিসটা কী? একবার বলেছি না, গোলমাল করিস না!'

লোকটা ছোরাটা নেড়ে রক্ত চোখে চেয়ে বলে, 'জান নিয়ে নেব। ভাগো হিঁয়াসে!'

—'বটে! তবু গোলমাল করবি? চেঁচাবি?' বলতে বলতে হরবাবু চড়াং করে একটা চড় কষালেন লোকটার গালে। আর সেই চড়ে লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল।

হরবাবুর তাতে রাগ গেল না। আর একটা চড় কষালেন। লোকটার হাত থেকে ছোরা খসে গেল। লোকটা গাল চেপে উবু হয়ে বসে 'বাপ রে! মা রে!' বলে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু হরবাবু তাতে আরও ক্ষেপে গেলেন। 'মার খাচ্ছিস, তবু চেঁচাচ্ছিস?'

হরবাবু লোকটার ঘাড় ধরে তুলে কিল চড় রদ্দা মারতে মারতে আর বকাবাকি করতে করতে একেবারে রাস্তায় তুলে দিয়ে এলেন। বললেন—'ফের এদিকে আসবি তো খুন করে ফেলব!'

ফিরে এসে হরবাবু আবার হাসি হাসি মুখ করে জ্যোৎস্না রাতের রহস্য উপভোগ করতে লাগলেন।

চোরে দারোগায়

দারোগা শ্যামাচরণ চোর খুঁজতে বেরিয়েছেন।

কিন্তু মুশকিল হল, শ্যামাচরণের দাপটে আশপাশের দশটা গাঁয়ে চোর ডাকাত পাজি বদমাশ বলতে কেউ নেই। তারা হয় তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে, নয়তো গা ঢাকা দিয়ে সাধু বোষ্টম সেজে ভিক্ষেসিক্ষে করে দিন গুজরান করছে। শ্যামাচরণের ভয়ে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়, মানুষ তো কোন ছার।

নিশুত রাতে ঘোড়ার পিঠে শ্যামাচরণ চলেছেন। বিশাল করাল চেহারা। ঘোড়াটার দম বেরিয়ে যাচ্ছে লাশ টানতে। একটু জ্যোছনা মতো উঠেছে। শীতকালের কুয়াশাও রয়েছে একটু। শ্যামাচরণের মন ভালো নেই। মনের দুঃখে তিনি মাঝে মাঝে হুহুংকারে গান গেয়ে উঠছেন, আমি বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি আমারে দাও হে বাঁচায়ে...

সেই গান শুনে ঘুমন্ত পাখিপক্ষী জেগে উঠে চেঁচাতে থাকে। বন্ধ ঘরের মধ্যে মানুষজন ইষ্টনাম স্মরণ করতে থাকে। গোরু-ছাগল হাম্বা বা ম্যা করে ডেকে ওঠে।

দারোগাবাবু শ্রীনিবাস চোরের আস্তানায় ঘোড়া থামিয়ে হাঁক মারলেন, 'শ্রীনিবাস আছিস নাকি?'

শ্রীনিবাসের মতো সিঁদেল জন্মায়নি বললেই হয়। শ্রীনিবাসের বুড়ি মা জানালা খুলে প্রণাম করে বলে, 'আজ্ঞে না। সে ছ'মাস হল শ্বশুরবাড়ি সেই বর্ধমানে গিয়ে বসে আছে।'

'হুঁ,' বলে দারোগাবাবু রওনা হলেন। পৈলান গাঁয়ে হর হাজরার বাস। পাকা মাথার গোরুচোর। তা সেখানেও শুনলেন, হর হিমালয়ে গিয়ে সাধন-ভজন করতে লেগেছে।

জগাছায় গিয়ে দারোগাবাবু মাছ-চোর অশ্বিনীর বাড়িতেও হানা দিলেন। শুনলেন অশ্বিনী মনের দুঃখে গলায় দড়ি দেবে বলে সোনাডাঙার হাটে সেই যে দড়ি কিনতে গেছে তারপর আর মাস চারেক ফেরেনি।

ঘুরে ঘুরে ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন শ্যামাচরণ। মাঝরাত হয়ে গেল, ভোর হতেও আর খুব একটা দেরি নেই, এর মধ্যেই একটা চোরকে না পাকড়ালেই নয়।

নামকরা চোরদের কাউকেই পাওয়া যাবে না বুঝে তিনি রতনপুরের রোগা চোর হনুমানের ডেরায় হানা দিলেন।

হনুমান রাত জেগে কাঁথা সেলাই করছিল। এখন এই কাঁথা বেচেই তার সংসার চলে। দারোগাবাবুর ঘোড়ার শব্দ শুনে সে পাছদুয়ার দিয়ে পালানোর চেষ্টায় ছিল। কিন্তু চোরদের গতিপ্রকৃতি শ্যামাচরণের নখদর্পণে। ঘোড়া ছেড়ে তিনিও হনুমানের ডেরার পিছন দিকে বাঁশবনে ঢুকে ঘাপটি মেরে রইলেন। হনুমান হন্তদন্ত হয়ে বনে ঢুকতেই ক্যাঁক করে ঘাড়টা ধরে ফেলবেন।

আঁকুমাকু করে হনুমান বলে, 'আজ্ঞে দারোগাবাবু! পেন্নাম হই। আমি কোনও অপরাধ তো করিনি হুজুর।'

শ্যামাচরণ ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'করিস না কেন বাপ? চুরি যে ভুলে যাবি!'

'আজ্ঞে ভুলেই গেছি।'

'ভুললে যে চলবে না বাবা। আজ রাতে যে আমার জন্য একটু কাজে নামতে হবে।'

'বলুন কী কাজ। আপনার জন্য জান দিয়ে দেব।'

শ্যামাচরণ নিশ্চিন্তির শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ওঠ ঘোড়ায়।'

ঘোড়া যেখানে থামল সে জায়গা দেখে হনুমান হাঁ।

'আজ্ঞে এ যে আপনার বাড়ি।'

'চোপ।' বলে চাপা গলায় ধমক দিলেন শ্যামাচরণ।

হনুমান ঢোঁক গিলে বলে, 'কী করতে হবে আজ্ঞে?'

'কী আবার।' দাঁত খিঁচিয়ে দারোগাবাবু বললেন, 'কুলকর্ম কি ভুলে মেরে দিয়েছ! যা করে হাত পাকিয়েছ তাই একটু করে আমায় উদ্ধার করো।'

হনুমান হাঁ করে থাকে।

শ্যামাচরণ তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, 'ভয় পাস না। পিসির ভাঁড়ার ঘরটা একদম ভিতর বাড়িতে। দরজায় ডবল তালা। বাইরে পিসি নিজে বিছানা করে শুয়ে আছে। একটা কুকুর আর একটা বেড়ালও পাহারা দিচ্ছে। অনেক বাধা। এইসব ডিঙিয়ে ঢুকতে হবে।'

'আজ্ঞে ভাঁড়ার ঘরে আছে কী?'

শ্যামাচরণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'ডাক্তাররা বলে কাঁচকলার ঝোল আর পেঁপেসেদ্ধ ছাড়া আর সব খাবার নাকি আমার পক্ষে বিষতুল্য। তাই তুই নিজেই চেয়ে দ্যাখ, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কেমন রোগা হয়ে গেছি। হ্যাঁ রে, আমার জন্য তোদের মায়া হয় না?'

এ কথায় হনুমান দুঃখ পেয়ে ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেলে।

দারোগাবাবুর হাতে হাত বুলিয়ে বলে, 'আজ্ঞে বড়ই রোগা হয়ে গেছেন দেবতা।'

'শুধু রোগা। কাঁচকলা আর পেঁপে খেয়ে জিব অসাড়। মাথা ভোঁতা। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি, আমার চারদিকে পেঁপে আর কাঁচকলারা ভূত হয়ে নৃত্য করছে।'

এ কথায় হনুমান রাম নাম করতে থাকে।

শ্যামাচরণ বলেন, 'আড়াই মন ওজন ছিল রে। এখন দু'মন দশ সেরে এসে ঠেকেছে।'

'আর বলবেন না। দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে আমার।'

'তা হলে বাবা, আমার প্রাণটা বাঁচা।'

আর বলতে হল না। হনুমান টপ করে চারদিকটা দেখে এসে বলল, 'মেহনত কম নয় হুজুর। আপনার পিসিই শুধু নয়, আপনার গিন্নি, তিন ছেলে, দুই মেয়েও ভাঁড়ার ঘর পাহারা দিচ্ছে।'

শ্যামাচরণ বুঝলেন, ব্যাটা দাঁও মারতে চাইছে। বললেন, 'ঠিক আছে, তোকে খুশি করে দেব। কী করে ঢুকবি বাবা?'

হনুমান মাথা নেড়ে বলে, 'সিঁদ দেওয়া যাবে না। চালের টিন সরিয়ে ঢুকতে হবে। শক্ত কাজ।'

'তোকে আরও খুশি করে দেব।'

'আপনি গরিবের মা-বাবা। আসুন আমার সঙ্গে, শব্দ-টব্দ করবেন না।'

হনুমান মেলা বুজরুকি দেখাল। মন্ত্রতন্ত্র বিড়বিড় করল। সম্মোহন ছাড়ল। ভূতদের

ডাকাডাকি করল। তারপর চালে উঠে পাকা হাতে টিন সরিয়ে ফেলল। দারোগাবাবু একটা মই এনে উঠে পড়লেন।

* * *

পরদিন বাড়িতে হইচই। পিসি আগের দিন থেকে বাটি বাটি পায়েস আর গামলা গামলা পিঠে করে রেখেছিলেন। পরের দিন পৌষ সংক্রান্তিতে লোক খাওয়াবেন বলে। সেই সব পিঠে-পায়েস লোপাট।

বিস্তর ঠেলাঠেলির পর হাই তুলে দারোগাবাবু উঠে বললেন, 'হয়েছেটা কী?'

গিন্নি বললেন, 'আরও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও। তোমার রাজত্বে থেকেও কী সুখেই না আছি। ভাঁড়ার ঘরে কাল রাতে কত বড় চুরিটা হয়ে গেল।'

দারোগাবাবু মিষ্টি মুখে হেসে বললেন, 'ব্যাটা চোরের গর্দান থাকবে ভেবেছ? দেখো কী করি।'

চোর

পটাশের বাবা নব এবং নবর বাবা ভব দু-জনেই ছিল বিখ্যাত চোর। অর্থাৎ পটাশকে নিয়ে তিন পুরুষ ধরে তারা চোর। ভব চোরের নামডাক ছিল সাঙ্ঘাতিক। লোকে বলে, ভব নাকি বাজি রেখে এক দুপুরে তার পিসির আহ্নিক করার কম্বলের আসন চুরি করেছিল। কাজটা শুনতে যত সহজ, আসলে তত সহজ নয়। কারণ পিসি তখন স্বয়ং ওই আসনে বসে কাঁথা সেলাই করছিলেন। সেই অবস্থায় আসন চুরি যাওয়ায় পিসি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে ভবকে আশীর্বাদ করেছিলেন, 'ওরে আমার ভব, তোর ওপর স্বয়ং ভগবানের ভর আছে, এ বিদ্যে ছাড়িসনি।'

পিসির আশীর্বাদে ভব বিদ্যে ছাড়েনি। বয়সকালে নিজের ছেলে নবকে তালিম দিয়ে সব বিদ্যে শিখিয়ে গেল। তা নবও কিছু কম গেল না। চোরের তালিম কিছু সহজ কাজ নয়। ভালো দৌড়োতে পারা চাই, উঁচু বা লম্বা লাফে দড় হওয়া চাই, বাঁশের ওপর ভর দিয়ে ভল্ট খেয়ে উঁচু দেওয়াল ডিঙোতে পারা চাই, রণপায়ে চলতে জানা চাই। এছাড়া গায়ে যথেষ্ট জোর না থাকলে দু-দশজন মানুষের সঙ্গে মোকাবিলা করা তো সহজ নয়। এরপর ভালো অভিনয়, বিনয়ী ব্যবহার ইত্যাদি তো আছেই। চোর বলে যদি সবাই চিনে ফেলে তো চিত্তির। নবর এসব গুণ তো ছিলই তা ছাড়া ছিল দুর্জয় সাহস। সে দু-মণ লোহা তুলত, কুস্তিতে যেকোনো পালোয়ানকে হটিয়ে দিতে পারত, যন্ত্রবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্রও ছিল তার নখদর্পণে। এমন ঘুমপাড়ানি মন্ত্র জানত যে গেরস্তের কুকুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকত, টুঁ শব্দ করত না। জমিদার তারিণী রায়ের বাড়ি থেকে এক খিলি পান চুরি করেছিল সে। শুনতে যত সহজ, কাজটা মোটেই তত সহজ ছিল না। রায়মশাইয়ের নাতির অন্নপ্রাশনে বাড়িতে সেদিন লোক গিজগিজ করছে। খাওয়াটাও হয়েছিল বেজায় রকমের। সকলের আইঢাই অবস্থা। রায়মশাইয়ের খুড়ো বিপিনচন্দ্র এক খিলি বেনারসি পাত্তির স্পেশাল পান নিজের রুপোর বাটা থেকে বের করে মুখে ফেলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে পানটা চুরি যায়। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। খুড়োমশাই নিজেও কিছুক্ষণ বুঝতে পারেননি যে, তাঁর দু-আঙুলে ধরা পানটি হাঁ-করা মুখের মধ্যে যেতে যেতে কীভাবে হাওয়া হল। কিছুক্ষণ চিবোবার পর তিনি খেয়াল করলেন, যা চিবোচ্ছেন তা পান নয়, নিজের জিবখানা। বেনারসি পান ততক্ষণে নবর গালে জমে বসেছে।

নবর এই হাতসাফাই দেখে তারিণী রায় তাকে সভাচোর করতে চেয়েছিলেন। ঠিক যেমন পুরানো আমলে রাজারাজড়াদের সভাকবি, সভাগায়ক থাকত। নব অবশ্য সভাচোর হয়নি। হাতজোড় করে রায়মশাইকে বলেছিল, 'আজ্ঞে, এ হল বাপ-দাদার বিদ্যে, এ ছাড়তে পারব না।'

'ছাড়বি কেন? বৃত্তি ছাড়ার জন্য কি তোকে রাখছি? চুরিই করবি, তবে মজার জন্য।'

নব শেষ অবধি রাজি না হওয়ায় তারিণী রায় তাকে আর পীড়াপীড়ি করেননি। তবে একখানা সোনার মেডেল দিয়েছিলেন। বরাবর স্নেহও করতেন খুব।

সেই নবর ছেলে হল পটাশ। ছেলে না বলে অকালকুষ্মাণ্ডই বলা ভালো। সব থেকেও তার কী যেন নেই! অথচ এই ছেলেকে এইটুকুন বেলা থেকে নিজে তালিম দিয়েছে নব।

ছেলে তৈরিও কিছু কম হয়নি। হরিণের মতো দৌড়োতে পারে, বানরের মতো লাফাতে পারে, গায়ে হাতির জোর, বুদ্ধিও খুব। তবু চুরিতে একেবারেই মন নেই। নব শেখায়, সেও শেখে, তবে গা লাগায় না, মন দেয় না।

একদিন হল কী, হাত মকশো করতে নব তার ছেলেকে সুদখোর অক্ষয় হাজরার বাড়ি চুরি করতে পাঠাল। পটাশ গেল বটে, কিন্তু চোরের যা যা করতে নেই তার সবকিছুই করতে লাগল। হাজরার চারটে কুকুরই তাকে চেনে, সুতরাং তেড়ে এল না। দু-একবার ভুক-ভুক করে চুপ মেরে গেল। পটাশের সেটা পছন্দ হল না। ঢিল মেরে মেরে সেগুলোকে খেপিয়ে দিয়ে শোরগোল তুলে ফেলল সে। তারপর দরজা ভাঙতে এমন সব বিকট শব্দ তুলল, যাতে মড়া অবধি উঠে বসে। তাতেও খুশি না হয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল।

অক্ষয় হাজরা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। ঘরে নগদ টাকা, সোনাদানা তো কম নেই। জেগে গিয়ে সে হেঁকে উঠল, 'কে, কে রে?'

'আমি পটাশ।'

'পটাশ? তা কী মনে করে? এই রাত-বিরেতে আমি দোর খুলতে পারব না। বাধা দিতে এসেছিস তো। জানালা দিয়ে দে। এই হাত বাড়াচ্ছি।'

'হাত বাড়াতে হবে না। আমি দরজা ভেঙে ফেলেছি।'

'ভেঙে ফেলেছিস মানে? করছিসটা কী বল তো?'

'আজ্ঞে চুরি করছি।'

'চুরি করছিস! ইয়ার্কি হচ্ছে, অ্যাঁ? এভাবে কেউ চুরি করে? বেরো, বেরো বলছি।'

পরদিন অক্ষয় হাজরা এসে নবকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল, 'ও কেমনধারা ছেলে তোর? চুরি তো তুইও করতিস, কখনো তো সাড়াশব্দ করিসনি, আস্পদ্দাও দেখাসনি। আর তোর ছেলের আস্পদ্দা দ্যাখ। গেরস্থ জিজ্ঞেস করছে কী করছিস, আর বুক ফুলিয়ে চোর বলছে, চুরি করছি। তার ওপর আবার গুনগুন করে গানও গাইছিল। দিনটি কী পড়ল বল তো নব!'

নব সেদিন পটাশকে জুতোপেটা করল খুব। কিন্তু পেটাতে পেটাতেই নব বুঝতে পারছিল, পটাশকে দিয়ে হবে না। বাপ-দাদার বিদ্যে এর হাতেই নষ্ট হবে।

পটাশ নির্বিকার। খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে বাপের সঙ্গে শাগরেদি করতে বেরোয় বটে কিন্তু কাজের চেয়ে অকাজই করে বেশি। কখনো দুম করে হাত থেকে তার সিঁদকাঠি পড়ে যায়। একদিন 'সাপ-সাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠে কেলেঙ্কারি করল। আর একদিন একজনের ঘরে ঢুকে নব যখন সিন্দুক বাক্স আলমারি খুলে ফেলছে; তখন পটাশ এক ফাঁকা বিছানা দেখতে পেয়ে সোজা গিয়ে তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত মানুষজনের মধ্যে যে পটাশও থাকতে পারে, তা নব আন্দাজ করতে পারেনি। তাই ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে একাই ফিরে এসে ভাবতে বসল। সকালবেলা হাই তুলতে তুলতে পটাশ ফিরে এলে তাকে একখানা চড় কষিয়ে বলল, 'কোথায় ছিলি?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!'

'পাজি নচ্ছার, ঘুমিয়ে পড়লি চোরের ছেলে হয়ে?'

'তা কী করব? ঘুম পেয়ে গেল যে বেজায়।'

'তোকে ওরা ঠেঙায়নি?'

'না। সব বলে দিলাম যে।'

'বললি। কী বললি?'

'বললাম বাবার সঙ্গে চুরি করতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাবার নাম নব চোর। তখন বসিয়ে দুধ চিঁড়ে ফলার করাল।'

'ফলার করাল?'

'করাবে না? অতবড়ো চুরির হদিস দিয়ে দিলাম। তারা সব দল বেঁধে লাঠিসোঁটা নিয়ে আসছে।'

নব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

সেইদিনই নব তার বাড়ি থেকে পটাশকে তাড়িয়ে দিল। সবাইকে জানিয়ে দিল, 'ওকে ত্যাজ্যপুত্তুর করলাম।'

পটাশ কোথায় গেল তার খোঁজ আর কেউ রাখল না।

এদিকে নব ধীরে ধীরে বুড়ো হতে লাগল। দাঁত পড়ল, চুল পাকল, শরীরের জোর বল চোখের দৃষ্টি সবই কমতে লাগল, বুদ্ধি একটু ঘোলাটে হল। বেপরোয়া ভাবখানাও তেমন রইল না। পৈতৃক বৃত্তি বজায় রাখা ভারি শক্ত হয়ে উঠল। আগে প্রতি রাতে চুরি করতে বেরোত, আজকাল আর তা পেরে ওঠে না। ফলে সে সঞ্চয়ে মন দিল। একটু-আধটু সুদের কারবার করতে শুরু করল। তাতে আয় মন্দ হল না। স্বভাবটা ভারি কৃপণের মতো হয়ে গেল তার।

ওদিকে বাপের তাড়া খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পটাশ পড়ল অথৈ জলে। চুরি ছাড়া তার বাবা তাকে আর কিছুই শেখায়নি বলে কাজকর্মেরও জোগাড় হল না। না খেয়ে চেহারা পাকিয়ে যেতে লাগল। এক বাড়িতে চাকরের কাজ পেয়েছিল কিছুদিন। বাসন মাজত, জল তুলত, ঝাঁটপাট দিত। বেশ ছিল। একদিন হঠাৎ মাঝরাত্রে যেন নিশির ডাক শুনে উঠে পড়ল। তারপর ভারি অবাক হয়ে দেখল তার দুটো হাত আপনা থেকেই বাক্সপ্যাঁটরা হাতড়াচ্ছে।

এই কাণ্ড দেখে পটাশ এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, তার 'চোর! চোর!' বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভাগ্যিস চেঁচায়নি। তবে সে অবাক হয়ে দেখল, বিনা আয়াসেই সে তালাচাবি খুলে ফেলছে এবং নিঃশব্দে জিনিসপত্র বের করছে। বাপ-দাদার স্বভাব যাবে কোথায়? রক্তেই বিজবিজ করছে যে।

পটাশ পালাল। আবার আর-এক বাড়িতে কাজ নিল। কিছুদিন পর সেখানেও সেই কাণ্ড। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পটাশ বুঝল, এটা থেকে তার আর নিস্তার নেই। বাপ নব তাকে চুরিতে নামাতে পারেনি বটে, কিন্তু তার ভিতরে একটা চোরকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এতকাল সেটা ঘুমিয়ে ছিল, এখন তার ঘুম ভেঙেছে।

তা পটাশ সেয়ানা চোর। এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। ঘন ঘন এলাকা বদলায়। চুরির ধরনও সে পালটে ফেলে। পয়সাকড়ি সোনাদানা যা পায় উড়িয়ে দেয়। চুরি তো শুধু তার রোজগার নয়, একটা নেশাও।

একদিন রাত্রিবেলা একটা গাঁয়ে ঢুকল পটাশ। বেশ সম্পন্ন গ্রাম। অনেক বাড়িঘর। ঘরবাড়ির চেহারা দেখেই তার অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পারে, কোন বাড়িতে জিনিসপত্র আছে।

বেছে বেছে একটা বাড়ি তার পছন্দ হল। বাড়ি তো নয়, যেন দুর্গ। মোটা গরাদ, পুরু মজবুত একপাটা কাঠের পাল্লা দেওয়া জানালা-কপাট, চারধারে উঁচু পাঁচিল। পাহারাদার কুকুর। দেখে খুশিই হল পটাশ। যেখানে চুরি করা শক্ত, সেখানেই চুরির আনন্দ।

পাঁচিল ডিঙিয়ে কুকুরটার মুখ বেঁধে জানালা খুলে ঘরে ঢুকতে সে বেশি সময় নিল না। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই তার মনে হল, এ বাড়ি, এই ঘর তার চেনা।

ওদিকে নবরও ঘুম ভেঙেছে। ইঁদুরের শব্দ, বেড়ালের শব্দ, শব্দ সব সে চেনে। কিন্তু এ শব্দটা অন্যরকম। নব বাতাস শুঁকল। একটা গন্ধ পেল। তারপর খুব অবাক হয়ে বুঝতে পারল, তার ঘরে চোর ঢুকেছে। নবচোরের ঘরে চোর ঢুকেছে! আশ্চর্য কথা!

লাঠিসোঁটা অন্ধকারে খুঁজে পেল না নব। গায়ে তেমন জোরও নেই যে, চোরকে জাপটে ধরবে। বাঁ-পায়ে বাতের সাঙ্ঘাতিক ব্যথা। অথচ ঘরে প্রচুর সোনাদানা, টাকাপয়সা। চোর সব নিয়ে যাবে।

নব বিকট স্বরে চেঁচাতে লাগল, 'চোর! চোর! চোর!'

রাত যখন বারোটা

গণেশবাবুর ভারি দয়ার শরীর। তিনি ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন, অভাবী মানুষকে সাহায্য করেন, কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করেন। গরিব ছাত্রের স্কুলের বেতন বা পরীক্ষার ফি দিতে কাতর হন না, পাড়ার ক্লাবে পুজোর চাঁদা দেন মুক্ত হস্তে। শুধু তাই নয়, তিনি সকালে উঠে নিজের হাতে কাক-পক্ষীদের ডাকাডাকি করে আটার নাড়ু আর দানা খাওয়ান, রাস্তার কুকুরদের দেন মাছের কাঁটা মেশানো ভাত, বেড়ালকে ভুক্তাবশেষ দুধ। কত আর বলা যাবে, বললে শেষ হয় না।

সারাদিন গণেশবাবুর নানা কাজ থাকে। বিরাট তাঁর ব্যবসা, মস্ত ফলাও কারবার। বেশ একটু রাত করেই ফেরেন তিনি। তারপর কিছুক্ষণ বুকডন বৈঠকি দিয়ে একটু ব্যায়াম করেন। তারপর পোষা বাঁদরকে কলা খাওয়ান, স্নান করেন, চাট্টি খান। রাত বারোটায় যখন শুতে যান, তখন তাঁর বুড়ি পিসির ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙার দোষও নেই। নব্বুই বছরের পিসি সেই সাঁঝবেলা থেকেই ঘুমোন। রাত বারোটায় তাঁর ঘুম হয়ে যায়। তখন ডাকাডাকি করতে থাকেন, 'বলি ও গনশা, এয়েছিস।'

'এসেছি পিসি।'

'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'এবার তবে ঘুমো।'

'ঘুমোচ্ছি।'

'বলি ও গনশা, এয়েছিস?'

'এসেছি পিসি।'

'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'এবার তবে ঘুমো।'

'ঘুমোচ্ছি।'

'বলি ও গনশা, এয়েছিস।'

এরকম কিছুক্ষণ চলার পর বুড়ি দাসী দামুর মা উঠে ধমক দেয়, 'বলি হচ্ছেটা কী গো দিদি, এক কথা ক-বার জিজ্ঞেস করতে হয়? বাবু এয়েছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে। এবার তুমি ঘুমোও তো!'

'ঘুম কি আর আসে রে বাছা, যা শীত পড়েছে এবারে। হাড় কালি হয়ে গেল।'

'তোমার মাথাটাই গেছে দিদি। জষ্টির গরমে আমরা হাঁফাচ্ছি, আর ওঁর এখন শীত লাগতে লেগেছে।'

'গিরিষ্মি নাকি? তাই বল, জষ্টি মাস। আমি কি আর অতশত বুঝতে পারি বাছা? তা কথা তো একই। গিরিষ্মিতেও কষ্ট, শীতেও কষ্ট। তা যা হোক একটা দে। হয় লেপ, না

হয় হাতপাখা। কীসের যে কষ্ট বুঝতে পারি না। তা সেবার বটঠাকুর গিরিম্মিকালে যা একখানা কাঁটাল এনেছিল না ষষ্ঠীতলা থেকে...'

দামুর মা উঠে পান আর দোক্তা মুখে দিয়ে ঝাঁটাগাছ তুলে নিয়ে বলে, 'ঘুমের তো দফা রফা করলে, তা আমিও তা হলে বেহানবেলার কাজ মাঝ-রাত্তিরেই সেরে রাখি। ঝাঁটপাট দিয়ে ফেলি এই বেলা।'

গণেশবাবুর ছেলে গোবিন্দ এমনিতে শান্তশিষ্ট, তবে তার মাথাটা বড্ড গবেট। ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ উঠতে তার বছর-পাঁচেক লেগেছিল। তবে সে বড়ো ধৈর্যশীল ছেলে। দিনরাত পড়ে। সেই পড়ায় পাড়া মাত। দুঃখের বিষয়, পড়াটা তার মাথায় ঢুকতে চায় না, ঢুকলেও থাকতে চায় না।

রাতের পড়া শেষ করে গোবিন্দ ঘুমোচ্ছে। দামুর মা-র ঝাঁটার শব্দে সে তড়াক করে উঠে পড়ল। ঝাঁটার শব্দ মানেই ভোর। আর ভোর মানেই পড়া। গোবিন্দ গ্রামার খুলে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

এক্রাম আলির মুরগিরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। ঝাঁটার শব্দে তারা সচকিত হয়েছিল, গোবিন্দর পড়ার শব্দে তারা ভোর হয়েছে ভেবে কোঁকোর-কোঁ বলে সমস্বরে ডেকে উঠল।

এক্রাম আলির বাড়ির উলটোদিকে থাকেন ভদ্রেশ্বরবাবু। মুরগির শব্দে ঘুম ভাঙতেই ভদ্রেশ্বরবাবু তাড়াতাড়ি ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে ছড়িগাছ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন প্রাতর্ভ্রমণে। কানাইবাবুকেও সঙ্গে ডেকে নেন।

তা প্রায় রোজই এরকম হয়। গণেশবাবু ফেরেন। বুড়ি পিসির ঘুম ভাঙে। দামুর মা ঝাঁটপাট শুরু করে। গোবিন্দ পড়তে লাগে, এক্রাম আলির মুরগি ডাকে। ভদ্রেশ্বরবাবু আর কানাইবাবু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

আর এসব কাণ্ড যখন ঘটতে থাকে, তখন চুপিচুপি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা লোক রোজই গণেশবাবুর বাড়ির পাছদুয়ার থেকে গুটিগুটি ফিরে যায়। লোকটা আর কেউ নয়, চারু চোর।

লোকে বলে চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। মদন আর চারু হল তাই। দু-জনেই দু-জনের মাসতুতো ভাই, দু-জনেই চোর। দু-জনের ভাবও খুব। চারুর বিরস মুখ দেখে মদন রোজই জিজ্ঞেস করে, 'আজও পারলি না?'

চারু মলিন মুখে মাথা নেড়ে বলে, 'না।'

মদন চিন্তিত মুখে বলে, 'তবে তো ভারি মুশকিল হল।'

মুশকিলই বটে। আসলে দু-জনেই ছিঁচকে চোর। চোরের মহলে তাদের কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। তবে তল্লাটে কালু দাসের একটা চোর তৈরির ইস্কুল আছে। চোরের ইস্কুল বলতে ব্যাপারটা ফেলনা নয়। কালুর সেই ইস্কুল থেকে যারা পাশ-মার্ক পেয়ে যায়, তারা হিল্লি-দিল্লি গিয়ে নাম করে ফেলে। সেই ইস্কুলে ভরতি হওয়া ভারি শক্ত। বহু হবু চোর প্রতিবার অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসে। মদন আর চারু গত দু-বছর ধরে চেষ্টা করে পেরে ওঠেনি। এবারও কালুর হুকুম হয়েছে মদনকে মল্লিকবাড়ি থেকে আর চারুকে গণেশবাবুর বাড়ি থেকে চুরি করে এলেম দেখাতে হবে, তবে ভরতি।

হাড়কিপটে গগন মল্লিকের বাড়িতে চুরি করাটাও শক্ত কাজ ছিল। তবে মদনের কপাল ভালো। গগন মল্লিকের সওয়া শো বছর বয়সি ঠাকুমা হঠাৎ পট করে মরে যাওয়ায় বাড়িতে তেমন পাহারা ছিল না। মদন সেই ডামাডোলে ঘরে ঢুকে চুরি করে পালায়।

কিন্তু ফেঁসে গেছে চারু।

মদন বলল, 'উপায় তো একটা করতেই হচ্ছে। দু-ভাই একসঙ্গে কালুর ইস্কুলে চুরি শিখতে না পারলে আর মজাটা কী? ঠিক আছে, আজ রাতে আমিও তোর সঙ্গে থাকব। তবে কথাটা কালু জানতে পারলে দু-জনকেই বাদ দিয়ে দেবে।'

তো তাই ঠিক হল।

গণেশবাবু বাড়ি ফিরেছেন। ব্যায়াম করেছেন। বাঁদরকে কলা খাইয়েছেন, স্নান করেছেন। চাট্টি খেয়েছেন, পান মুখে দিয়ে হাই তুলেছেন।

ওদিকে পিসিরও ঘুম ভেঙেছে।

'বলি ও গনশা, এয়েছিস?'

'এসেছি।'

'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'এবার তবে ঘুমো।'

'ঘুমোচ্ছি।'

'বলি ও গনশা, এয়েছিস?'

'এসেছি।'

'খাবি না?'

'খেয়েছি।'

'এবার তবে ঘুমো'।

'ঘুমোচ্ছি।'

'বলি ও গনশা, এয়েছিস।'

এরকম চলতে চলতেই দামুর মা উঠে পড়ল। শীত-গ্রীষ্ম নিয়ে কথা হল। তারপর দামুর মা রাগ করে ঝাঁটপাট শুরু করে দিল। গোবিন্দ উঠে পড়তে বসে গেল। এক্রাম আলির মুরগি ডাকতে লাগল। ভদ্রেশ্বরবাবু বেরিয়ে কানাইবাবুকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, 'বলি ও কানাইবাবু, আর দেরি করলে যে বেলা হয়ে যাবে, সুয্যি যে উঠে পড়ল বলে।'

গোটা পাড়াটাই বলতে গেলে মাঝারাত্তিরে জেগে উঠল।

এই অবস্থায় চুরি করা বা পালানো দুই-ই বিপজ্জনক। মদন এবং চারু শুনতে পেল, এ-বাড়ির লোক ও-বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা কইতে শুরু করেছে। গণেশবাবুর পিসির যে আক্কেল নেই, দামুর মা যে একটি উজবুক, গোবিন্দ যে একখানা পাঁঠা, এক্রামের মুরগিগুলো যে মানুষ নয়, ভদ্রেশ্বর আর কানাইয়ের যে কোনোকালে বুদ্ধি হবে না এসব আলোচনার পর তারা নিজেদের সুখ-দুঃখের নানা কথা বলাবলি করতে লাগল।

মদন আর চারু দু-জনেই জোড়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরস্পরের দিকে তাকাল।

চারু মাথা নেড়ে বলল, 'উপায় নেই মদনদা, এ-বছর তুমিই ভরতি হও কালুর ইস্কুলে।'

মদন চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ কর তো।'

ওদিকে গণেশবাবু পান চিবিয়ে পাশবালিশ আঁকড়ে সদ্য ঘুমের আবেশে চোখ বুজেছেন, এমন সময় জানলার বাইরে থেকে কে যেন মোলায়েম গলায় বলল, 'গণেশবাবু ঘুমোলেন নাকি?'

গণেশবাবু ভারি অমায়িক মানুষ। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললেন, 'আজ্ঞে না, একটু ঘুমোব ঘুমোব ভাবছিলাম আর কী।'

'কিন্তু আপনার কি ঘুমোনটা উচিত হবে গণেশবাবু? সারা পাড়া জাগিয়ে রেখে আপনার ঘুমিয়ে পড়াটা কি ভালো কাজ?'

গণেশবাবু ব্যাপারটা বোঝেন। মাথা চুলকে লাজুক গলায় বললেন, 'আজ্ঞে, তা অবশ্য ঠিক। আমার পিসি, আমাদের দাসী, আমার ছেলে, এক্রামের মুরগি, ভদ্রেশ্বর আর কানাই মিলে রোজ রাতে একটা ভজঘট পাকায় বটে, কিন্তু তার জন্য আমি কী করতে পারি বলুন। আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে? এদিকে তো কখনো দেখিনি মশাইকে।'

মদন একটু কেঠো গলা সাফ করে নিয়ে বলল, 'যদি অভয় দেন তো বলি, আমরা দু-জনেই চোর।'

'বটে! বটে!'

'গত সাতদিন ধরে আমার ভাই এই চারু এসে ঘুরে যাচ্ছে, একদিনও চুরি করতে পারেনি। না পারলে কালুর ইস্কুলে এবারেও ওকে নেবে না। ব্যাপারটা ভেবে দেখেছেন? আপনার দয়ার শরীর, কাক-কুকুর-ভিখিরি কাউকে ফেরান না, আমার এই ভাইটিকে কী আর ফেরাবেন?'

গণেশবাবু একটু হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একটু ভাবতেই তাঁর মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি হেঁকে উঠলেন, 'বটেই তো, আমার বাড়িতে একটু চুরি করবেন সে তো আমার সৌভাগ্য। দাঁড়ান, এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

বলে গণেশবাবু গর্জন করতে করতে গিয়ে গোবিন্দকে বিছানায় পাঠালেন। দামুর মাকে ধমকে গোয়ালে গিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। পিসির ঘরে শিকল তুলে দিলেন। তারপর সদর খুলে একগাল হেসে বললেন, 'আসুন, আসুন।'

এরপর আর চুরির কোনো বাধা রইল না।

তবে আমরা খবর পেয়েছি, চারু এবারেও কালুর ইস্কুলে ভরতি হয়নি। সে চুরি ছেড়ে পানের দোকান দিয়েছে।

সেই লোকটা

তার পুরোনো আমলের ঢাউস ক্যামেরায় মল্লিকবাড়ির একটা গ্রুপ ফটো তুলতে হয়েছিল কালুরামকে। ফটো তোলায় তার নাম খুব। কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে সে যখন তার তেপায়া ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করে তখন লোকে হাসে বটে, কিন্তু ফটো দেখলে সবাই অবাক মানে। কালুরাম এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু এখনও সবাই তাকে ডাকাডাকি করে।

এই মল্লিকবাড়ির গ্রুপ ফটো তুলতে গিয়েই ঘটনাটা প্রথম ঘটল, যেমনটা কালুরামের ফটোগ্রাফির জীবনে আর কখনও ঘটেনি। নাদু মল্লিকের ছেলের পৈতে। সেই উপলক্ষে মেলা আত্মীয়-স্বজন এসেছিল। তার মধ্যে অনেক বুড়ো-বুড়ি ছিল, দূরের লোক ছিল। কে কবে মরে যায়, কার সঙ্গে আর দেখা হয় কি না হয় তাই কালুরামকে ডাকিয়ে গ্রুপ ফটো তোলা হল। মোট একুশজন ছিল, কালুরামের মনে আছে। ছবিটা উঠলও সুন্দর, একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার ছবি।

কিন্তু ছবি ডেলিভারি নিয়ে নাদু মল্লিক হঠাৎ বলে উঠলেন, সবাইকে তো চিনতে পারছি, কিন্তু পিছনের সারিতে কোণের দিকে এই গোঁফওয়ালা লোকটা কে? একে তো সেদিন দেখা যায়নি।

কালুরাম অবাক হয়ে বলল, আপনাদেরই লোক, চিনতে না পারলে আমি কী করব?

নাদু মল্লিক মাথা নেড়ে বললেন, আমাদের লোক হতেই পারে না। তবে উটকো কেউ ঢুকে পড়েছিল নিশ্চয়ই। আমরা মোট একুশজন ছিলাম মনে আছে। কিন্তু এই লোকটাকে নিয়ে বাইশজন হচ্ছে। গুনে দেখুন।

কালুরাম গুনে তাজ্জব। সে পুরোনো আমলের লোক। যা করে তা একেবারে পাকা কাজ। ক'জনের ফটো তুলতে হবে এবং কিভাবে তার সাজিয়ে নিতে হবে এসব তার হিসেব করে নিতে হয়। যতদূর মনে পড়ছে, এ লোকটাকে সে সারিতে দেখেনি, আর লোকটা দাঁড়িয়েছে আর একজনের কাঁধে হাত রেখে এবং একটু হেলে। ভঙ্গিটা মোটেই ভাল নয় ফটো তোলার পক্ষে। কালুরাম ফটো তোলার সময় ব্যাপারটা লক্ষ করেনি কেন সেইটেই তার মাথায় ঢুকছে না। এতকালের অভ্যাসে গণ্ডগোল হয়ে গেল! তার মানে কি সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে?

মল্লিকবাড়ির ব্যাপারে খটকাটা রয়ে গেল বটে, কিন্তু হাটখোলার ব্যানার্জীদের বাড়িতে বুড়ো সদাশিব বাঁড়ুজ্জ্যে সাতানব্বই বছর বয়সে মারা যাওয়ায় ফটো তোলার জন্য কালুরামের ডাক পড়ল। এবং ফের ফটো নিয়ে গণ্ডগোল। এবারকার গণ্ডগোলটা কালুরামকে রীতিমতো উদ্বেগে ফেলে দিল। এ ফটোটাও ভাল উঠেছে। সামনে ফুলে সাজানো খাটিয়ায় সদাশিববাবু শুয়ে, বুকের উপর ভাগবদগীতা। পিছনে ছয় ছেলে, তিন মেয়ে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি ও তস্য পুত্রপৌত্রাদি। সব মিলিয়ে বেশ একখানা ভিড়ের দৃশ্য। শোকবিহ্বল ভিড়। কিন্তু পিছনের সারিতে সদাশিবের বড় আর মেজো ছেলের মাথার মাঝখান দিয়ে একটা ফিচেল মুখ বেরিয়ে আছে। মুখে ইয়ার্কির হাসি। আর সেই গোঁফ! কালুরাম মুখখানা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। এ যে চেনা মুখ! কালুরাম মল্লিকবাড়ির গ্রুপ ফটোটা বের করে মিলিয়ে নিল। কোনো ভুল নেই। এ সেই লোক।

সদাশিবের বড় ছেলে রামশিব ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, এ লোকটা কে? এ তো আমাদের পরিবারের কেউ নয়। এ কোত্থেকে এল?

কালুরাম মাথা চুলকে বলল, এ ব্যাটা মহাবজ্জাত। মল্লিকবাড়ির ফটোতেও ঢুকে পড়েছিল।

তার মানে?

মানে কি ছাই কালুরামই জানে? সে মাথা চুলকোতে লাগল। তবে এর পর থেকে খুবই সতর্ক হয়ে গেল কালুরাম।

এর পরের ফটো খুবই সাদামাটা। মহেশ দত্তর একমাত্র ছেলের বিয়ে। ছেলে আর ছেলের বউ নিয়ে মহেশ দত্ত আর তাঁর গিন্নি ছবি তুলবেন। মোট চারজন। কালুরাম খুবই সতর্ক হয়ে চারদিক দেখে নিয়ে তবে সাবধানে ছবিটা তুলল। না, এবার আর কোনো উটকো লোক ঢুকে পড়তে পারেনি। বড় গ্রুপ তো নয়।

কিন্তু নিজেদের ডার্করুমে ছবির নেগেটিভটা দেখতে গিয়ে কালুরামের বুক আর হাত দুটোই কেঁপে গেল। সামনে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে দত্ত আর দত্তগিন্নি, পিছনে দাঁড়ানো ছেলে আর ছেলের বউ। কিন্তু তাদের মাঝখানে আর একজন। নির্ভুল আর একজন। কালুরাম দুই চোখ কচলে নিয়ে ফের দেখল। ভুল নেই। তারপর নেগেটিভ প্রিন্ট করে দেখল, সেই ফিচেল গোঁফওলা লোকটাই।

দত্তবাবু ছবি দেখে অবাক হয়ে বললেন, এ কী? আমার ছেলে আর বউমার মাঝখানে এটা কে?

কালুরাম সতর্ক হয়ে গেল। তার দোষ বলে দত্তবাবু যদি ছবির দাম না দেন! সে মাথা চুলকে বলল, দেখুন ছবি তোলার কথা, তুলে দিয়েছি। লোকজন কে কোত্থেকে এল তা বলি কি করে? আপনাদেরই কেউ হবে।

দত্তবাবু রাশভারী লোক। গম্ভীর মুখ করে বললেন, আমার বাড়িতে এরকম কোনো লোক নেই। তবু খোঁজ নিয়ে দেখছি বউমার বাপের বাড়ির কেউ সেদিন হঠাৎ হাজির হয়েছিল কিনা।

বউমাকে ডাকানো হল। তিনি ছবি দেখে চোখ গোল করে বললেন, না তো! সেদিন তো কেউ আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়নি! আর একে তো কস্মিনকালেও দেখিনি।

কালুরাম ঘন ঘন মাথা চুলকোতে লাগল।

দত্তবাবু গম্ভীরতর হয়ে বললেন, বুড়ো বয়সে তোমার গণ্ডগোল হচ্ছে। অন্য কোনো ছবির নেগেটিভের সঙ্গে মিশিয়ে প্রিন্ট করেছ নিশ্চয়ই। নাঃ, দেখছি অন্য কোনো ফটোগ্রাফার ডাকিয়ে নতুন করে ছবি তোলাতে হবে।

এইভাবে কালুরামের ব্যবসা লাটে ওঠার যোগাড় হল। অন্য সব চ্যাংড়া ফটোগ্রাফার দিব্যি ছবি তুলে বেড়াচ্ছে, কারও কোনো গোলমাল হয় না। কিন্তু কালুরাম ক্যামেরা ক্লিক করলেই কোত্থেকে গোঁফওলা ফিচেল লোকটা এসে হাজির হয় তা কালুরাম আকাশ-পাতাল ভেবেও বুঝতে পারছে না। ক্যামেরা বা ফিল্মের কোনো দোষ নেই, কালুরাম ভালই জানে। প্রিন্টেও কোনো গণ্ডগোল সে করছে না। তবে এটা হচ্ছেটা কী?

কালুরাম ফিচেল লোকটার ছবি নেগেটিভ থেকে কেটে এনলার্জ করে ভালভাবে মুখটা স্টাডি করল। লোকটার বয়স ত্রিশের মধ্যেই। গোঁফজোড়া বেশ মিলিটারি ধাঁচের এবং জম্পেশ। মাথায় অনেক চুল। চেহারাটা ভালই। হাসিটাও খারাপ বলা যায় না। যাকে ফটোজেনিক ফেস বলে তাই। ক্যামেরায় যখন ধরা পড়েছে, তখন লোকটাও কোথাও না কোথাও আছে। কিন্তু কোথায় আছে?

কালুরামের রীতিমতো দুশ্চিন্তা হতে লাগল। ভয়ও হতে লাগল। খাওয়া কমে গেল। ঘুম কমে গেল। শরীরটা বেশ রোগাও হয়ে গেল। পুরোনো ক্যামেরাগুলো কালুরাম ভাল করে পরিষ্কার করে নিল। ফিল্ম পাল্টে ফেলল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। নিতান্তই একটা সূর্যাস্তের ছবি তুলেছিল কালুরাম। তাতেও দেখল, সেই লোকটা ঠিক ছবির বাঁ কোণে দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে।

অগত্যা লোকটার এনলার্জ করা ছবিটা নিয়ে কালুরাম দারোগাবাবু হরিহরের সঙ্গে দেখা করে বলল, একটু মুশকিলে পড়ে এসেছি।

দারোগাবাবু কালুরামকে ভালই চেনেন। তিনি বললেন, আরে এসো, এসো। অনেককাল তোমাকে দেখি না। তা আমি তো ভাই শিগ্‌গিরই রিটায়ার করব। আমার এই ইউনিফর্ম পরা চেহারাটা একদিন বেশ জুৎ করে তুলে দাও তো।

কালুরাম আমতা আমতা করে বলল, সে আর বেশি কথা কী? দেবোখন তুলে। আচ্ছা দারোগাবাবু, এই লোকটাকে কি চেনা-চেনা ঠেকছে? একটু ভাল করে দেখুন তো!

ছবিটা দেখেই দারোগাবাবু চমকে উঠলেন, কোথায়! কোথায় সে! এক্ষুনি একে ধরা দরকার।

দারোগাবাবু এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন যে, কালুরাম ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, এ কি কোনো ফেরার আসামী?

দারোগাবাবুর চেঁচামেচিতে সেপাই-সান্ত্রী ছুটে এসেছে।

দারোগাবাবু কালুরামের দিকে চেয়ে বললেন, কোথায় লোকটা?

কালুরাম দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, তা তো জানি না। কিন্তু এ কে দারোগাবাবু?

কে! কে তা কি তুমি জানো না?

আজ্ঞে না।

কিন্তু এই যে বললে, লোকটা খুনি!

কালুরাম অবাক হয়ে বলে, কখন বললুম?

বলোনি?

না তো!

তাহলে কি ডাকাত?

তাও তো জানি না।

দারোগাবাবু রুমালে মুখের ঘাম মুছে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর হাতের ইঙ্গিতে সেপাই-সান্ত্রীদের বিদেয় দিয়ে বললেন, তাহলে লোকটার ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? যেভাবে ছবিটা বের করে দেখালে তাতে তো আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, লোকটা নির্ঘাৎ কোনো খুনি, ডাকাত, ফেরার আসামী।

কালুরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, আপনার ব্লাডপ্রেশারটা বোধহয় খুব বেশি।

দারোগাবাবু বললেন, হ্যাঁ, বড্ড বেশি। একটুতেই এমন অ্যাজিটেটেড হয়ে যাই। তা লোকটা তাহলে কে?

সেইটে জানতেই তো আপনার কাছে আসা। লোকটাকে চোখে দেখতে পাইনি। অথচ যতবার যেখানেই ছবি তুলি লোকটা ছবিতে এসে যায়।

অ্যাঁ, সে কি কথা!

আজ্ঞে। এমন কি ডার্করুমে পর্দার ওপর আলো ফেলে ছবি তুলেও দেখেছি। ছবিতে কিছুই না থাকার কথা। কিন্তু এই লোকটা ঠিক ছবিতে চলে আসে।

রাম রাম রাম রাম। শিগ্‌গির ছবিটা নিয়ে বিদায় হয়ে যাও।

কেন দারোগাবাবু?

এ ভূতের ছবি। আমার ওতে ভীষণ ভয়। ভূত-টুত আমি আদপেই ভালবাসি না।

কালুরাম উঠে পড়ল। তারপর সে এস.ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে দেখা করল।

এস.ডি.ও. সাহেব ভারী মিষ্টি শান্ত ভালমানুষ। মশামাছি অবধি মারেন না।

ছবিটি দেখে মোলায়েম গলায় বললেন, পাত্রটি কে?

পাত্র! পাত্র নয়। আসলে—

এস.ডি.ও. সাহেব কালুর কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, আমরা হলুম কুলীন কায়স্থ। আমার মেয়েকে তো দেখেছেন। একটু কালো। আর দাঁতগুলো যা একটু উঁচু। এ ছাড়া নিখুঁত সুন্দরী। মনে করে যে পাত্রের খবর এনেছেন তাতে ভারী খুশি হয়েছি। পাত্র আমার পছন্দসই। তবে গোঁফজোড়া বড্ড প্রমিনেন্ট। মিলিটারি হলে তো খুবই ভাল। দাঁড়ান। মেয়ের মাকে ফটোটা দেখিয়ে আনি—

সত্য বটে, কালুরাম অনেক জায়গায় ঘোরে বলে তাকে এস.ডি.ও সাহেব মেয়ের জন্য পাত্রের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ যে পাত্র নয় সেই কথাটা কালুরাম আর বোঝাতে পারল না।

এস.ডি.ও সাহেব ফিরে এসে হাসিমুখে বললেন, পাত্র আমাদের খুব পছন্দ। তাড়াতাড়ি সম্বন্ধটা এনে ফেলুন। পাত্রের বাবার ঠিকানাটাও দরকার।

কালুরাম বেজার মুখে বলল, যে আজ্ঞে।

জনে জনে ছবিটা দেখিয়ে বেড়াল বটে কালুরাম, কিন্তু সুবিধে হল না। ফিচেল লোকটা যে কোত্থেকে এসে ছবিতে উদয় হয় তা বোঝা গেল না।

কালুরাম নিজে ফটোগ্রাফার হলেও তার নিজের ছবি কস্মিনকালেও তোলেনি। বলতে কি, কালুরামের কোনো ফটোও নেই। কয়েকদিন দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে কালুরাম স্থির করল, টাইমার দিয়ে এবার সে নিজের কয়েকটা ছবি তুলবে। লোকটা যদি তার আশেপাশে এসে হাজির হয় তাহলে টপ করে চেপে ধরবে বাছাধনকে।

নিজের স্টুডিওর ভিতরে ক্যামেরা ফিট করে সামনে চেয়ার বসিয়ে কালুরাম তৈরি হল। সেলফ টাইমারের বোতাম টিপে গিয়ে চেয়ারে বসল। তারপর দু'ধারে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, হুঁ হুঁ বাবা, এত সোজা নয়। এসো দেখি এবারে বাছাধন, দেখাব মজা।

ক্লিক করে ক্যামেরার অটোমেটিক শাটারের শব্দ হল। কালুরাম চারদিকে চেয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হল, কেউ নেই।

কিন্তু ছবিটা প্রিন্ট করার পর কালুর একগাল মাছি। ছবিতে তার নিজের চিহ্নও নেই। চেয়ারে সেই ফিচেল লোকটাই গোঁফ চুমরে হাসি-হাসি মুখে বসে আছে।

কালুরাম দুশ্চিন্তায় ঘেমে উঠল। অন্য সব ছবিতে লোকটা এসে হানা দেয় বটে কিন্তু যাদের ছবি তোলা হয় তাদের কেউ অদৃশ্য হয়ে যায় না। কিন্তু এ ছবিতে তাই ঘটেছে। কালুরাম সম্পূর্ণ অদৃশ্য। বসে আছে ফিচেলটা।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কালুরাম স্টুডিওতে বসে বসে রাত গভীর করে ফেলল। তার দেরি দেখে ভিতর বাড়ি থেকে তার স্ত্রী এসে বলল, কী ব্যাপার। তুমি এখনও বসে বসে কী করছ? রাত হয়ে গেছে যে!

কালুরাম বিরসবদনে বলল, বড্ড চিন্তা হচ্ছে।

কিসের চিন্তা! বাঃ, এই ছবিটা কোথায় পেলে? এই বলে কালুরামের বউ ফিচেলের ফটোটা তুলে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগল।

কালুরাম কৌতূহলী হয়ে বলল, ছবিটা কেমন দেখছ?

চমৎকার। দেখাওনি তো আমাকে কখনও?

চেনো নাকি লোকটাকে?

কালুরামের বউ অবাক হয়ে বলল, ও আবার কিরকম কথা? যার সঙ্গে পঁচিশ বছর ঘর করছি তাকে চিনব না মানে? বিয়ের সময় তো তোমার এই গোঁফই ছিল। ঝ্যাটা গোঁফ পছন্দ করি না বলে বকে বকে ছাঁটিয়ে ছিলুম। ওই তো গালের আঁচিলটা দেখা যাচ্ছে। আর এই যে বাঁ ভ্রু-র ওপর কাটা দাগ!

কালুরামের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, কিন্তু....কিন্তু....

বউ হেসে বলল, তুমি তো জন্মেও ফটো তোলাও না। এমন কি বিয়ের সময় পর্যন্ত ছবি তোলাতে রাজি হওনি। আমার যেজন্য ভারী দুঃখ ছিল। যে দুনিয়াসুদ্ধু সকলের ফটো তুলে বেড়ায় তার নিজের কোনো ফটো নেই। কিন্তু এই ফটোটা যে তুলিয়েছিলে তা কখনও বলোনি তো! এটা আমি নিলুম, বাঁধিয়ে রাখব।

কালুরামের একেবারে বাক্য হরে গেল। তবে কথাটা মিথ্যেও নয়। তার হঠাৎ মনে পড়ল, ঠিক এইরকম গোঁফ সে যৌবনে রাখত বটে। গালের আঁচিল এবং ভ্রু-র ওপর কাটা দাগ এখনও আছে। সে ফিচেল হাসিও হাসতে জানত একসময়ে। না, সন্দেহ নেই। এটা তারই ছবি বটে। তবে যৌবনকালের ছবি।

ফটোগ্রাফার কালুরাম রাতে ঘুমোতে পারল না। এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। তারপর একসময়ে থাকতে না পেরে ভূতের মতো গিয়ে নিজের অন্ধকার স্টুডিওতে ঢুকে বসে রইল। সে নিজেই কি করে ছবির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে? তাও এখনকার সে নয়, যৌবনের সে!

ভাবতে ভাবতে কালুরাম বিড়বিড় করে বলল, অসম্ভব! এ হতে পারে না। আমারই মাথার গণ্ডগোল।

অন্ধকারে ফিচ্ করে কে যেন হাসল।

কালুরাম চমকে উঠে বলল, কে রে?

আমি গো আমি। আমি কালুরাম। তার মানে আমি হচ্ছি তুমিই।

অ্যাঁ! বলে কালু হাঁ করে রইল।

অবিশ্বাসের কী আছে হে? আমিই তুমি। বহুকাল ধরে একসঙ্গেই আছি।

কালুরাম কথা বলতে পারছিল না। অনেক কষ্টে শুধু বলল, কী করে হয়?

ফিচ্ করে একটু হাসি শোনা গেল অন্ধকারে। ফিচেলটা বলল, কালুরাম, একসময়ে তোমার গোঁফ ছিল, হাসি ছিল, মজা ছিল। এখন তুমি এক গোমড়ামুখো ফটোগ্রাফার। তোমার ভিতরকার হাসিখুশি কালুরামটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। তাই একদিন হাসিখুশি কালুরাম গোমড়ামুখো কালুরামের ভিতর থেকে ফট করে বেরিয়ে এসেছে।

অ্যাঁ! বলো কী?

তাই তো বলছি। গোমড়ামুখো কালুরামের সঙ্গে পোষাল না বলে ভেন্ন হয়েছি, তাই বলে কি আর খুব তফাত হতে পারি? কাছাকাছিই আছি হে।

কিন্তু ফটোর ভিতরে ঢুকছ কী করে?

খুব সোজা। আমাকে এমনিতে তুমি দেখতে পাও না বটে, কিন্তু তোমার ক্যামেরা তো আমাকে ভালই চেনে। তোমাকে জব্দ করার জন্য হুট করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যাই।

কিন্তু আমার যে ব্যবসা লাটে উঠতে বসেছে তোমার জন্য।

তার আমি কী করব? গোমড়ামুখো লোক আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।

কালুরামের এবার ভয় কেটে গিয়ে খুব রাগ হল। এই ফিচেলটা যদি সে নিজেই হয়ে থাকে তাও ক্ষমা করা যায় না। সে রাগে গরগর করে বলে উঠল, ভাল চাও তো শিগ্‌গির ফের আমার ভিতরে ঢুকে পড়ো। নইলে—

নইলে কী করবে? তোমাকে ভয় খাই নাকি?

তবে রে—বলে কালুরাম গলার স্বরটা লক্ষ করে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল দ্বিতীয় কালুরামের ওপর।

তারপর যা ঘটল তা আর কহতব্য নয়। ধুন্ধুমার লড়াই চলতে লাগল। ক্যামেরা-ট্যামেরা সব উলটে পড়ে গেল, কাচ ভাঙল, চেয়ার ওলটাল, কালুরামের গা থেকে গলগল করে ঘাম ঝরতে লাগল। কিন্তু কে হারল, কে জিতল তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে একসময়ে লড়াই থামল। কালুরাম তখন মেঝের ওপর পড়ে হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে। পাশাপাশি আর একটা লোকও পড়ে আছে, টের পেল কালুরাম।

একটু মায়া হল কালুরামের। শত হলেও লোকটা তো সে নিজেই। লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে কালুরাম বলল, খুব লেগেছে নাকি?

তুমি মহা পাজি লোক।

আহা রাগ করো কেন? মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। ওঠো, হাতে-মুখে জল দিয়ে এসো।

তুমি দাও, তাহলেই আমারও হবে।

একটা কথা ছিল।

কি কথা?

বলছিলাম কি, এবার আর আমি অত গোমড়ামুখো থাকব না। বেশ হাসিখুশি লোক হয়ে যাবো। চাও তো বেশ জম্পেশ গোঁফও রাখতে পারি।

মাঝে মাঝে নিজের ফটো তোলাবে?

তাও তোলাবো। সব হবে। এবার টুক করে আমার মধ্যে ঢুকে পড়ো তো কালুরাম।

কালুরাম কালুরামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরদিন থেকে আর কালুরামের ফটোতে কোনো গণ্ডগোল রইল না।

কথার দাম

কেউ যদি বলে, এটা আপনার ছদ্মনাম, তা হলে রহস্যময়বাবু খুবই অসন্তুষ্ট হন। এমনকী, রেগেও যান। রহস্যময় তাঁর নিজস্ব পিতৃদত্ত নাম। রহস্যময় একজন অত্যন্ত সফল উকিল। তাঁর বাড়ির চেম্বারে রাত দশটা-এগারোটা অবধি মক্কেল গিসগিস করে। টাকাপয়সার লেখাজোখা নেই।

এখন রাত সাড়ে দশটা। মফফ্সল শহরে শীতটা এবার খুব জম্পেশ হয়ে পড়েছে। ক'দিন হল মেঘলা এবং টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে নাগাড়ে। আজ আবার একটা ঝোড়ো হাওয়াও দিচ্ছে সন্ধে থেকে। ফলে আজ তেমন মক্কেলের ভিড় নেই। তবু মোট চারজন এখনও আছে। একজন মক্কেলের সঙ্গে রহস্যময়বাবু চেম্বারে বসে কথা বলছেন। বাইরের ঘরে আরও তিনজন বসে আছে। তাদের মধ্যে আরসাদ মিঞা বুড়ো এবং কালা মানুষ। তিনি বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্য দু'জনের একজন আট গাঁয়ের গণেশ সাহা, তেলের কারবারি। তিন নম্বর লোকটা হল মনসাতলার নন্দ হাজরা। নন্দ আর গণেশের এই উকিলবাবুর চেম্বারেই চেনা হয়েছে। বসে থেকে-থেকে সেথা গল্পও হল। গল্প হতে হতে দু'জনেরই হাঁফ ধরল। এখন দু'জনেই একটু ঝিমোচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ নিস্তব্ধতা খানখান করে বিকট একটা ঝনঝন শব্দ হল। সেই শব্দ এমনই সাংঘাতিক যে, রহস্যময়বাবুর মতো ঠান্ডা মাথার লোকও লাফিয়ে উঠে 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' বলে চেঁচাতে লাগলেন। তাঁর মক্কেল সনাতন হালদার ধাঁ করে টেবিলের নীচে ঢুকে পড়ল। নন্দ চমকে উঠে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। আর গণেশ একটিও কথা না বলে টপ করে উঠে ঘরের বাইরে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে পাঁই-পাঁই করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। শুধু আরসাদ বুড়োরই কোনও ভাবান্তর হল না। শান্ত মুখে ঘুমিয়ে রইলেন, ঘাড়টা একটু লটকে দিয়ে। কানে না-শোনার কিছু ভাল দিকও তো আছে।

রহস্যময়বাবুর বাড়ির লোকজনও শব্দে আতঙ্কিত হয়ে দোতলা থেকে নেমে এল। বউ, দুই ছেলে, এক মেয়ে, রহস্যময়বাবুর বুড়ি মা, রান্নার ঠাকুর হরিহর এবং কাজের মেয়ে অন্নদা। রহস্যময়বাবু দু'মিনিট ধরে 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' বলে চেঁচালেও ঘর ছেড়ে বেরোতে পারেননি। তাঁর ধুতির খুঁট টেবিলের ড্রয়ারের টানায় আটকে গিয়েছিল। স্ত্রী মানময়ী মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'ভূমিকম্পটা আবার কখন হল? ভূমিকম্প তো নয়, একটা কাচ ভাঙার শব্দ হয়েছে!'

এ কথায় রহস্যময়বাবু একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'থাক! কাচ ভাঙবে কেন? ভূমিকম্প হলেই তো কাচটাচ ভাঙে।'

'মোটেই নয়, ঢিল মারলেও ভাঙে।'

'ঢিল! আমার জানালায় ঢিল মারে কার এমন বুকের পাটা? পাঁচশো ছয় ধারায় ঠুকে দেব না! আমার নাম রহস্য উকিল।'

এই বলে বুক চিতিয়ে অহংকারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবে তিনি রোগা মানুষ, বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেও তেমন কিছু ভয়ংকর দেখাল না। তাঁর ছোট ছেলে পটু হামাগুড়ি দিয়ে মেঝে থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে আনল। একটা কাগজে মোড়া জিনিস। সেটা দেখেই রহস্যময়বাবু আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বোমা! বোমা! ফেলে দে, ফেলে দে!'

বোমা শুনে সনাতন হালদারের বুদ্ধি কাজ করল। সে একটা বোমার মামলারই আসামি। বলতে নেই বোমা বানানোয় তার একটু বেশ হাতযশও আছে। ভূমিকম্প হচ্ছে না জেনে সে টেবিলের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে টপ করে পুটুর হাত থেকে বোমাটা কেড়ে নিয়ে বলল, 'উকিলবাবুর বুদ্ধিরও বলিহারি, বোমা ফেলে দিতে বলছেন। বাচ্চা ছেলে যদি ছুড়ে ফেলে দেয় তাহলে বোমা ফেটে ঘরসুদ্ধু লোক মরবে না?'

'তা বটে।' রহস্যময়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বোমার পণ্ডিত সনাতন বোমাটা একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, হাতে একটু নাচিয়ে ওজনটা পরীক্ষা করল, একটু শুঁকেও দেখল। তারপর ভ্রুকুটি করে বলল, 'উকিলবাবু, জিনিসটা বোমা বলে মনে হচ্ছে না।'

বলেই ওপর থেকে কাগজটা সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে সনাতন যে জিনিসটা তুলে সবাইকে দেখাল তা একটা পাথরের টুকরো। বলল, 'এটা কেউ ছুড়ে মেরেছে বাইরে থেকে।'

একটা জানালার ওপর লম্বা ভারী পরদা ঝুলছিল। সেটা সরিয়ে দেখা গেল, শার্সি হাঁ হয়ে আছে। মেঝেময় কাচের টুকরো ছড়ানো।

রহস্যময়বাবু আস্তিন গোটানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু গায়ে শুধু গেঞ্জি এবং তার ওপর আলোয়ান জড়ানো বলে পেরে উঠলেন না। তবে মুখে বললেন, 'পাঁচশো ছয় ধারা। কালপ্রিটকে অ্যায়সা শিক্ষা দেব—'

সনাতন ঢিলের ওপরকার কাগজের খোসাটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে মন দিয়ে কী যেন দেখছিল। সে বলল, 'উকিলবাবু, বেশি চেঁচামেচিতে কাজ নেই।'

'কেন বলো তো!'

'এই কালপ্রিট খুব সুবিধের নয়। করালী-ডাকাতের চিঠি বলে মনে হচ্ছে। সে কাল রাতে আপনার বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে বলে লিখেছে। আগের দিন এসব প্রথা ছিল, ডাকাতরা চিঠি দিয়ে আসত। আজকাল সব ভাল ভাল প্রথাই তো লোপাট হয়েছে। তা এই করালীই যা কিছু ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। আহা, নমস্য লোক!'

রহস্যময় ধাঁ করে চিঠিটা প্রায় কেড়ে নিলেন। চিঠিটা পড়েই তিনি আলমারি খুলে পেনাল কোড বের করে উপুড় হয়ে দেখতে দেখতে আপনমনে বলতে লাগলেন, 'ডাকাতির ভয় দেখানো? দাঁড়াও, ধারাটা আগে দেখে নেই।'

সনাতন একটু গলাখাঁকারি দিয়ে সসম্ভ্রমে বলল, 'আজ্ঞে, ধারা দেখার মেলা সময় পাবেন, যদি বেঁচেবর্তে থাকেন। ধারা দিয়ে হবেটা কী? করালী-ডাকাত যা বলে তা-ই করে। ধারা-ফারা সব আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের জন্য। করালীর জন্য ধারায় হবে না। আপনি বরং কাল সকালেই শ্বশুরবাড়ি চলে যান। টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি সব পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাবেন।'

রহস্যময়বাবু ফের বুক চিতিয়ে বললেন, 'পালাব! কেন, পালাব কেন? দেশে পুলিশ নেই? আদালত নেই? সরকার নেই?'

সনাতন মাথা চুলকে বলল, 'তা বটে। তেনারাও তো আছেন। তাহলে তো আর ভাবনার কিছু নেই।'

কথাটা এমনভাবে বলল, যেন মশকরা করছে। রহস্যময়বাবু কটমট করে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'ভাবনার কী থাকবে? অ্যাঁ! কাল সকালেই পুলিশের কাছে যাচ্ছি।'

এই বলে রহস্যময়বাবু দফতর গুটিয়ে ফেলতে লাগলেন। রাগে ফুঁসছেন।

সনাতন মৃদু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'বাইরে যে এখনও তিনজন মক্কেল বসে আছে উকিলবাবু।'

'তাদের যেতে বলে দাও। আজ আর হবে না।'

'সেই ভাল।'

পরদিন সকালেই পুলিশের কাছে গিয়ে সব বললেন রহস্যময়বাবু। দারোগা মদনলাল খাঁড়া বন্ধু লোক। চিঠিটা দেখে এবং ঘটনার কথা শুনে মদনলাল কিছু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রহস্য, করালী-ডাকাতের কথা কি তুমি শোনোনি?'

'শুনব না কেন? ঢের শুনেছি। তোমরা অপদার্থ বলে তাকে এতকাল ধরে জেলে পুরতে পারোনি।'

মদনলাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বড় ঠিক কথা বলেছ। আর অপদার্থ বলেই সরকার আমাকে দূরের একটা জায়গায় বদলি করে দিয়েছেন। সামনের মাসে চলে যাচ্ছি। তবে আমি একা নই, আমার আগে আরও সাতজন দারোগা ওই একই কারণে বদলি হয়েছে।'

'তা হলে মানেটা কী হল? তুমি আমার একটা বিহিত করবে না?'

'তুমি উকিল মানুষ, তার ওপর বন্ধু লোক। তোমাকে বাঁচাতে যা করার সবই করব। দুপুর থেকেই তোমার বাড়িতে বন্দুকধারী কয়েকজন সেপাই বহাল থাকবে তারপর তোমার ভাগ্য।'

রহস্যময়বাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে করালীর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমার তেমন গা নেই।'

'রক্ষাকর্তা ভগবান, আমি কে? ভগবানকে ডাকো।'

'তার মানে, করালীকে তুমিও ভয় পাও।'

মদনলাল করুণ হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'না রে ভাই। ভয়টয় পাওয়ার মতো অবস্থা আর আমার নেই। গত দু' বছরে অন্তত ত্রিশটা বাড়িতে করালী আগে থেকে খবর দিয়ে ডাকাতি করেছে। ত্রিশটা বাড়িতেই আমি ফোর্স নিয়ে গেছি।'

রহস্যময়বাবু সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'এঁটে উঠিনি ভায়া। ত্রিশটা বাড়ির একটা বাড়িতেও সে হানা দেয়নি। তবে ওই রাতেই সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় ডাকাতি করে আমাদের বোকা বানিয়েছে।

রহস্যময়বাবু সোৎসাহে বললেন, 'তাহলে আমার বাড়িতে আজ ডাকাতি হবে না?'

'আজ না হলেও, হবে। যেদিন রামবাবুর বাড়িতে হওয়ার কথা, সেদিন শ্যামবাবুর বাড়িতে হয় বটে, কিন্তু রামবাবুও শেষ অবধি রেহাই পায় না। যেদিন যদুবাবুর বাড়িতে হওয়ার কথা, সেদিন রামবাবুর বাড়িতে সে হানা দেয়। সুতরাং তুমি আজকের দিনটা কাটিয়ে দিলেও অন্য কোনও সময়ে করালীর থাবা খাবেই খাবে।'

রহস্যময়বাবু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'লোকটা দেখছি এক কথার মানুষ নয়। অথচ কাল আমার এক মক্কেল বলছিল, করালী নাকি যা বলে তাই করে।'

ভ্রূ কুঁচকে মদনলাল বললেন, 'কে মক্কেল? কী নাম?'

রহস্যময়বাবু নিপাট মুখে বললেন, 'নামটা বলছি না। সে ক্রিমিন্যাল। সাবধানে থেকো।'

রহস্যময়বাবু কোর্টে গেলেন। আদালতের কাজে মন দিতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। দেখলেন জনা আষ্টেক সেপাই তাঁর বাড়ির সামনে পাহারায় বসে গেছে।

সন্ধেবেলা আজ আর মক্কেলরা কেউ বাড়িতে ঢুকতে পারল না। রহস্যময়বাবু এবং তাঁর পরিবারের সবাই আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম অবশ্য কারও এল না। বারবার উঠে সবাই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বাইরের দিকে দেখতে লাগলেন। এই করতে রাত শেষ হয়ে এল। সেপাইরাও জানে, ডাকাত আসবে না। তারা সারারাত বসে দিব্যি ঘুমোল। ভোরবেলায় রহস্যময়বাবুকে সেলাম জানিয়ে বখশিশ নিয়ে বিদেয় হল।

রহস্যময়বাবু খুবই দুশ্চিন্তার সঙ্গে বাইরের ঘরে পায়চারি করতে করতে আপন মনে বলছিলেন, 'কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না তারা বিশ্বাসঘাতক। লোকটা দেখছি একেবারে যাচ্ছেতাই। ছ্যাঃ!'

'পেন্নাম হই উকিলবাবু।'

বিরক্ত রহস্যময়বাবু ফিরে দেখলেন, খোলা দরজায় তেলচুকচুকে চেহারার গোলগাল একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অমায়িক হাসি।

'কী চাই?'

'আজ্ঞে, আপনাকে একটু পেন্নাম করতেই আসা। সঙ্গে স্যাঙাতরাও আছে।' বলে পিছু ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে কাকে যেন ডাকল, 'ওরে, আয়! আয়! পেন্নাম কর এসে।'

পাঁচ-সাতজন মোটাসোটা লোক ঘরে ঢুকে পড়ল।

রহস্যময়বাবু বললেন, 'কে তোমরা? কী চাও?'

তেলচুকচুকে লোকটা বলল, 'আমিই করালী। একটু দেরি করে ফেলেছি। আপনি রাগ করেননি তো?'

রহস্যময়বাবু লোকটার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন। তারপর বলেন, 'তুমিই করালী?'

'যে আজ্ঞে!'

রহস্যময়বাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'এটা কেমন কথা হে? অ্যাঁ! তুমি আমার শার্সি ভেঙে, ঢিল মেরে, বীরত্ব দেখিয়ে চিঠি দিলে! আর আসল কাজের বেলায় লবডঙ্কা! কথা দিয়ে যারা কথা না রাখে, তারা কীরকম মানুষ বলো তো?'

করালী জিভ কেটে বলে, 'কথাটা সত্যি। তবে কিনা আপনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন, সেপাইরাও মোতায়েন ছিল তাই...'

দ্বিগুণ রেগে রহস্যময়বাবু বললেন, 'বিপদ আছে বলে কথার খেলাপ করবে? তোমার মতো কুলাঙ্গার ডাকাত আমি কমই দেখেছি। জানো, যার কথার দাম নেই তার মুখদর্শন করাও পাপ? আজকে ভোরবেলা তোমার মুখ দেখলাম, দিনটাই মাটি হল দেখছি। ছিঃ ছিঃ, তার ওপর সকালবেলায় ডাকাতি করতে এসেছ, সেটাও মস্ত বড় বেইমানি। এরকম তো নিয়ম নয়।'

করালী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, রহস্যময়বাবু তাকে পেল্লায় একটা ধমক দিলেন, 'চোপরাও বেয়াদব কোথাকার! লুটপাট করতে চাও সব বাক্স-প্যাঁটরা, আলমারি খুলে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের বউ, ছেলেমেয়ে আর দলবলের কাছে বড়াই কোরো না। কাপুরুষ আর কাকে বলে...ইত্যাদি।'

করালী-ডাকাত খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রহস্যময়বাবু তাঁর অগ্নিবর্ষী গলায় দেশের বীরপুরুষ ক্ষুদিরাম থেকে বাঘা যতীন, এমনকী গাঁধীজির প্রসঙ্গও এনে ফেললেন। এবং শেষে প্রশ্ন করলেন, 'দেশটা কোথায় যাচ্ছে বলো তো?'

করালীর চোখ ছলছল করছিল। হঠাৎ হাতজোড় করে ধরা গলায় বলল, 'আর এরকম হবে না। কথা দিচ্ছি।'

হাঃ হাঃ করে হাসলেন রহস্যময়বাবু, 'তোমার কথার কীই বা দাম!'

বলে ফের হাঃ হাঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি।

করালীচরণ ডাকাতি না করেই পালাতে পালাতে অনেক দূর থেকেও সেই হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

Scanned with CamScanner

কুরুক্ষেত্র

যখনই কোনো কাজ খুব মন দিয়ে করতে যায় বজ্রকুমার, তখনই আপনমনে সে কেবল 'তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে তাক' আওড়াতে থাকে। এটাই তার মুদ্রাদোষ। এমন নয় যে, সে একজন ডাকসাইটে তবলচি। তবলার কিছুই সে জানে না। তবু মুখে কেন যে তেরে কেটে তাক উচ্চারণ হতে থাকে, তা সে নিজেও জানে না। বজ্রকুমার আসলে একজন শিক্ষানবিশ চোর। এ ব্যাপারে সে একজন বড়ো ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধেছিল। বিশ্বনাথ রায় পাল খুবই সিদ্ধহস্ত চোর। তার কাছে নানারকম কলাকৌশল শিখতে শুরু করেছিল। আর বছরটাক লেগে থাকতে পারলেই হত। কিন্তু বিশে পালের বুড়ো বয়সে ভীমরতি হল। কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করতে গিয়ে সে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেল। আর ফিরল না।

বিদ্যেটা পুরোপুরি শেখা না হলেও বজ্রকুমার যেটুকু শিখেছে তাতে পেট চলে যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম কৌশলগুলো না জানলে দাঁও মারা সম্ভব নয়। বিশে ওস্তাদ বছরে একটা কি দুটোর বেশি চুরি করতই না! এই একটি বা দুটিই ছিল মারাত্মক ধরনের। হেসেখেলে বড়োলোকি চালে দু-চার বছর কাটিয়ে দেওয়া যেত। কী নেই বিশে ওস্তাদের? জোতভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভরা মাছ, বাক্সভরতি টাকা, ঘরভরতি ছেলে-মেয়ে, মনভরতি আনন্দ। মাথায় টেরি, কানে আতর, পরনে মলমলের পাঞ্জাবি, ফাইন ধুতি। দুপুরে গরম ভাতে ঘি, রাতে শেষ পাতে ক্ষীর, একবেলা মাছের মুড়ো তো অন্য বেলা কচি পাঁটার ঝোল। বিশে গিন্নির পা থেকে মাথা অবধি সোনার গয়না।

বজ্রকুমারের আর বিশে ওস্তাদ হওয়া ঘটে নেই। তবু বাঁচতে তো হবে। সে এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে রোজই ছিঁচকে চুরি করে পেটটা চালায়। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ বই তো নয়। সে হল ওস্তাদের কনিষ্ঠ চেলা। বিশের বড়ো বড়ো চেলারাও কম যায় না। দেশে-বিদেশে তারা সব ভালো ভালো শহরে জমিয়ে বসেছে। টাকাপয়সার ভাগাভাগি।

বজ্রকুমার মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বড়ো বড়ো বাড়িতে ঢোকার এলেম তার নেই। সে এখনও সিন্দুক বা ভারী লোহার আলমারি খুলতে পারে না। এখনও হাঁচি বা কাশির ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আসেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা, এখনও কাজ করার সময় তেরে কেটে তাক বলার বদ অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। প্রায়ই তাকে কুকুরে তাড়া করে, গেরস্ত সজাগ হয়ে পড়ে। আর নানারকম গণ্ডগোল বেধে যায়।

সনাতন কর্মকার একজন সোনার বেনে। তার বাড়িতে সোনাদানার আশায় হানা দিয়েছিল বজ্র। জানালার গরাদে ফাঁক করে ঢুকেও পড়েছিল। একটু এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করছে, এমন সময় সনাতন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়ল। হাঁক মেরে বলল, 'অ্যাই, ফটকে, খুব তবলাবাজ হয়েছিস তো! মাঝরাতে তবলার বোল আওড়াচ্ছিস।'

আর এক ঘর থেকে ফটকে বলে উঠল, 'তুমি গান-বাজনার বোঝোটা কী বলো তো দাদা? অ্যাঁ! সোনা গলিয়ে গয়না বানাচ্ছ, তাই নিয়েই থাকো না!'

'কে বললে আমি গান বুঝি না? নিধুবাবুর টপ্পা, কেত্তন, ভজন সব বুঝি। তোর মতো বে-আক্কেলে নাকি? রাতবিরেতে তবলার বোল ফুটিয়ে পাঁচজনের ঘুমের বারোটা বাজাচ্ছিস!'

ফটকে বলল, 'ইচ্ছে করে বোল তুলেছি নাকি? ঘুমোতে ঘুমোতে শুনতে পেলুম, কে যেন তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে তাক করছে। তাই ঘুম ভাঙতে কয়েকটা বোল একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম মুখে মুখে।'

'উদ্ধার করছ। ঘরভরতি সোনাদানা নিয়ে এমনিতেই আমার ঘুম হয় না। যাও-বা একটু তন্দ্রা এসেছিল দিলি তার পিত্তি চটকে। যাই, নন্দীবাবুর মেয়ের নেকলেসটা রাত জেগে শেষ করে ফেলি।'

বজ্রকুমার তাড়াতাড়ি গরাদের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একখানা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি মাত্র জুটেছিল।

একদিন গণেশ সাঁতরার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল বজ্রকুমার। ঢুকতেই ভারি বিপদ। যে ঘরখানায় ঢুকেছিল সেটাতে গণেশ সাঁতরার নব্বই বছর বয়সি পিসিমা থাকেন। বায়ু-চড়া বলে বোধ হয় ঘুমের বালাই নেই। দরজা ফাঁক করে আঙুল ঢুকিয়ে কায়দা করে ছিটকিনি খুলে ভেতরে পা দিতেই একেবারে মুখোমুখি।

পিসিমা একগাল হেসে বললেন, 'এলি দাদা? আয়। সেই সন্ধে থেকে হাঁটুর ব্যথায় মরে যাচ্ছি। বাতের তেলটা তুই ছাড়া আর কে মালিশ করে? ওদের সব কড়া-পড়া হাত। তোর হাত দুটি যেন মখমলের মতো। তখন থেকে ডাক-খোঁজ করছি, শুনলুম নাকি পটলডাঙা গেছিস, ফিরতে রাত হবে। তা রাত বেশি হয়নি বোধ হয়। আয় দাদা, একটু মালিশটা করে দিয়ে যা, গোপাল আমার।'

নিজে ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে বজ্রকুমারকে সে-কাজও করতে হয়েছিল। বুড়ি চোখে মোটে দেখতে পান না, তাই রক্ষে। সব কথায় কেবল হুঁ দিয়ে গিয়েছিল সে। বেরোনোর সময় একখানা পেতলের ঘটি আর একখানা হারিকেন সঙ্গে নিতে পেরেছিল সে।

মনটা খুব বিগড়ে আছে। বড়ো না হোক, ছোটোখাটো একখানা দাঁও না মারলেই নয়। বিশে ওস্তাদের চেলা বলে নিজের পরিচয় দিতেও লজ্জা করে তার।

আজও নিশুত রাতে বেরিয়েছে বজ্রকুমার। মনের মতো একখানা বাড়ি খুঁজছে। কোনো বাড়িই তেমন পছন্দ হচ্ছে না। ঘনঘন মাথা নাড়ছে আর তেরে কেটে তাক করে যাচ্ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। আরে! এ বাড়িটা তো কখনো নজরে পড়েনি তার! রোজই এসব পথ দিয়ে যাতায়াত। তবু পড়েনি। ভারি লজ্জা হল বজ্রর। বিশে ওস্তাদ কি আর সাধে বলে, 'ওরে চোখ চাই, চোখ। তোদের চোখ থেকেও যে অন্ধ।' কথাটা অতি খাঁটি। তেমন চোখ থাকলে কী আর এতকাল বাড়িটা চোখ এড়িয়ে যেত তার? রায়চৌধুরীদের আমবাগানের পশ্চিমে একটু আবডালে চমৎকার ছোটোখাটো একটি প্রাসাদ বললেই হয়।

বজ্রকুমার বাড়িটা ঘুরে একটু জরিপ করে নিল। জানালা-দরজা খুবই মজবুত। গোটা দুই জানালা খোলা ছিল। বেশ পোক্ত শিক দেওয়া। বজ্র খুব বেছেবুছে একখানা জানালা পছন্দ করে ফেলল। তারপর চাড় দেওয়া যন্ত্র বের করে অনেক মেহনতে দু-খানা শিক বাঁকিয়ে ভেতরে ঢোকার ফোকর করে নিল।

একটু জিরিয়ে ওস্তাদ আর মা কালীর উদ্দেশে দুটো পেন্নাম ঠুকে ঢুকে পড়ল ঘরে।

অন্ধকারটা চোখে একটু সইয়ে নিয়ে সে চারদিকটা যা দেখল তা কহতব্য নয়। মেলাই জিনিস। ঘরে অন্তত দশখানা লোহার আলমারি। সিন্দুক আছে। কাঠের বাক্স-টাক্সও আছে। পরের ঘরটা আরও সরেস। দেওয়াল আলমারিতে কাচের আড়ালে রুপোর বাসন। আরও

ঘুরেফিরে দেখতে ইচ্ছে যাচ্ছিল। কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যা পাওয়া যাচ্ছে তাও কম নয়। সে খন্তা বের করে কাচ কাটতে লেগে গেল।

হঠাৎ কানের কাছে কে যেন চাপা গলায় বলে উঠল, 'তুই কে?'

ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল বজ্রকুমারের। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আজ্ঞে, ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না।'

'ভুল হয়ে গেছে? মজার আর জায়গা পাসনি? তুই বেজা চোর, বিশের চেলা।'

'যে আজ্ঞে।'

'আমাকে চিনিস? আমি হলাম গুলে ওস্তাদের এক নম্বর চেলা। গোবিন্দ। বিশের মতো এলেবেলে লোকের কাছে চুরি শিখিনি। তুই চুরির জানিস কিরে হতচ্ছাড়া গবেট?'

এ কথায় বজ্রকুমারের রাগ হল। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, রাগের চোটে তা ফের গরম হল। সে বেশ তেজালো গলায় বলল, 'বিশ্বনাথ রায় পালের কাছে গুলে ওস্তাদ! হাসালে দাদা! এ যেন সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ!'

'কে গোষ্পদ রে গবেট?' বলেই গোবিন্দ টকাস করে একটা গাঁট্টা মারল বজ্রর মাথায়। বলল, 'যত বড়ো মুখ নয়, তত বড়ো কথা। বিশে আবার ওস্তাদ হল কবে?'

বজ্রকুমার মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে ফুঁসে উঠে বলল, 'গুলে আবার চুরির জানেটা কী? বিশের হাতধোয়া জলও সে নয়।'

'তবে রে!' বলে গোবিন্দ সাপটে ধরল বজ্রকে।

বজ্রও কম যায় না। বলল, 'দেখাচ্ছি মজা।'

দেখতে-না-দেখতে দু-জনের মধ্যে তুমুল লড়াই লেগে গেল। কিল, ঘুসি, চড়। ঝনঝন করে কাচ ভেঙে পড়ল। চেয়ার-টেবিল পড়তে লাগল উলটে। এ যে পরের বাড়ি, গেরস্ত উঠে পড়তে পারে, এসব কথা কেউ খেয়াল করল না। ভাঙা কাচে দু-জনেরই হাত-পা কেটেকুটে একশা। একখানা ঝাড়বাতি অবধি খসে পড়ে শতখান হল।

ঘুসোঘুসি ছেড়ে দু-জনে দু-জনকে কুস্তির প্যাঁচে কাহিল করার চেষ্টা করল। তাতে কুমড়ো-গড়াগড়ি হল অনেকক্ষণ।

শেষমেশ লড়াই থামল বটে। কিন্তু দু-জনের আর তখন উঠে বসবার ক্ষমতা নেই। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। দু-জনে হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে। আধমরা অবস্থা।

এদিকে আকাশ ফরসা হল। জানালা দিয়ে সকালের রাঙা রোদ এসে পড়ল ঘরে।

এমন সময় একটা জাম্বুবানের মতো লোক এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পেল্লায় একখানা হাই তুলে তাদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোরা চোর নাকি?'

বজ্র আর গোবিন্দ দু-জনেই ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বলল, 'আর হবে না।'

লোকটা আড়মোড়া ভেঙে রাজ্যের আলিস্যি আর বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'ছ্যাঃ।'

মাটিতে পড়ে থাকা কাহিল দুই চোর জুলজুল করে চেয়ে রইল।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'তোদের হবে না। ওদেরও হয়নি কিনা।'

'কাদের কথা বলছেন আজ্ঞে।'

'বিশে আর গুলে। শেখাচ্ছিলুম। মাঝপথেই হঠাৎ শেখা ছেড়ে কাজে নেমে পড়ল। তোদের দেখেই বুঝেছি, তোরা তোদের ওস্তাদের মতো অপদার্থ।'

দু-জনেই ওস্তাদের নিন্দায় গরম হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টাও করল একটু, পারল না।

লোকটা তাচ্ছিল্যের চোখে চেয়ে বলল, 'আমার নাম কালু সারেঙ। নামটা চেনা ঠেকছে?'

দু-জনেই চমকে উঠল। কালু সারেঙের নাম কে না জানে? তবে...

বজ্র বলল, 'তিনি তো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। কিন্তু তিনি তো গত হয়েছেন।'

'গত হয়েছেন।' বলে লোকটা মুখ ভেঙচে বলল, 'গত হলেই কি সুবিধা হল তোদের? চুরি ছেড়ে অন্য লাইন ধর। সারারাত তোদের যা কীর্তি দেখলাম।'

বলেই লোকটা হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর বাড়িটা হয়ে গেল বেবাক ফাঁকা, পোড়ো একখানা বাড়ি।

দুই চোর পড়ি-কি-মরি করে উঠে দৌড়োতে লাগল।

ফটিকের কেরামতি

মাঝরাত্তিরে শিয়রের জানালাটায় মৃদু ঠুকঠুক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফটিকের। ঘুম তার খুব পলকা। সে উঠে হারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে জানালাটার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল। আঁট করে বন্ধ রয়েছে পাল্লা। এত রাতে কারও আসার কথা তো নয়। চোর-ডাকাত যে নয় তা ফটিক জানে, কারণ, চোরের বাড়িতে চোর আসে না। তবে কে হতে পারে?

ফটিক গলাখাঁকারি দিয়ে খুব বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'কে আজ্ঞে? কী চাইছেন?'

ওপাশ থেকে একটা ভারী গলা চাপা স্বরে বলল, 'জানালা খোলো। দরকার আছে।'

'কী দরকার?'

'তোমার কিছু রোজগার হবে।'

রোজগার জিনিসটা ফটিক বড়ো ভালোবাসে। রোজগারের মতো জিনিস নেই। গত দিন দশেক তার এক পয়সাও রোজগার হয়নি। দিনেরবেলা সে বেড়া বেঁধে বেড়ায়। রাতের বেলা একটু-আধটু চুরিটুরির চেষ্টা করত। দুটোর কোনোটাতেই তার সুবিধে হচ্ছে না। কচু-ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটছে। একা-বোকা মানুষ বলে চলে যায়।

ফটিক বুকে একটু সাহস এনে জানালাটা খুলল। কিন্তু বাইরে অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। ফটিক একটু ভয়ে-ভয়ে উঁকিঝুঁকি দিল। হঠাৎ দস্তানা-পরা একখানা হাত তলার দিক থেকে উঠে এসে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট ছুড়ে দিল তার পায়ের কাছে। ফটিক চমকে উঠে নীচু হয়ে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল। বেশ ভারী জিনিস।

বাইরে থেকে ভারী গলাটা বলল, 'ওটা একটা পিস্তল। গুলি ভরা। সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। কাজটা করতে পারলে আরও পাঁচশো।'

পিস্তল! ফটিকের হাত-পা কাঁপতে লাগল। বলল, 'আজ্ঞে এ যে ভয়ংকর জিনিস।'

'শুনতে ভয়ংকর, ব্যবহার করা খুব সোজা।'

'কাজটা কী বলবেন?'

'বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে পরশুদিন। হাজার লোকের নেমন্তন্ন। দেড়শো বরযাত্রী আসবে। বাজি-টাজি ফাটবে। তোমার কাজটা হল, গোলেমালে হরিবোল। ভিড়ের মধ্যে একফাঁকে বঙ্কুবাবুর কাছাকাছি চলে যাবে। নলটা পিঠের বাঁদিকে ঠেকাবে, ঘোড়াটা টেনে দেবে, বাস।'

'ওরে বাবা!' ফটিক ঘামতে লাগল।

'কোনো ভয় নেই। সন্ধে সাতটা থেকে বাজি ফাটবে। শব্দটা কেউ লক্ষই করবে না। কাজ সেরে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ফেলবে। তাড়াহুড়ো না করে ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আহা-উহু করবে। থানা থেকে পুলিশ আসতে অনেক দেরি হবে। ততক্ষণে বেরিয়ে নদীর ধারে বটতলার বাঁধানো চাতালের কাছে গিয়ে দেখবে ইট চাপা দেওয়া আরও পাঁচশো টাকা রয়েছে। টাকাটা নিয়ে পিস্তলটা ওখানেই রেখে চলে আসবে। তোমার কিছু হবে না। কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে তিনদিনের মধ্যে তোমাকে খুন করা হবে।'

ফটিক আঁতকে উঠে বলল, 'তা বঙ্কুবাবুকেও কেন আপনারাই সাবাড় করছেন না? আমি যে জীবনে খুনখারাপি করিনি।'

'আমাদের অসুবিধে আছে। কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'

'আমি কী পারব আজ্ঞে?'

একটা পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল। কেউ কোনো জবাব দিল না।

ফটিক ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। তার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, বুক এমন ধড়ফড় করছে যেন তবলার লহরা, খানিকক্ষণ বসে থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। তারপর মোড়কটা খুলে পিস্তলটা দেখল। এসব জিনিস সে চোখেও দেখেনি আগে। বিদঘুটে চেহারা, তাকালেই ভয় হয়।

রাতে আর ফটিকের ঘুম হল না। সারারাত আকাশ-পাতাল ভেবে মাথাটাই গরম হয়ে গেল। খুনখারাপি তার লাইন নয়। রক্ত দেখলে সে এখনও ভিরমি খায়। সে সামান্য চুরিটুরির চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতেও তার হাতযশ নেই। নিতান্ত অভাবে পড়েই চেষ্টা করতে হয়, নইলে চুরিও তার লাইন নয়। দুটো পেটের ভাতের জোগাড় হলে সে কস্মিনকালেও চুরি করত না। কিন্তু এরা যে তাকে খুনোখুনিতে কেন নামাতে চাইছে তা সে বুঝতে পারছে না। খুন না করতে পারলে খুন হতে হবে—কী সব্বোনেশে কথা! ঘন ঘন জল খেতে খেতে তার পেট জয়ঢাক হয়ে গেল, তবু বার বার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সকালবেলা মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাওয়ায় বসে রইল ফটিক। তার বাটি ভরতি পান্তা পড়ে রইল। খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে না। কাল বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে। আর কালকেই তাঁকে খুন করতে হবে।

মেয়ের বিয়ে বেশ জাঁকিয়েই দিচ্ছেন বঙ্কুবাবু। তাঁর মেলা পয়সা। চার-পাঁচ রকমের ব্যবসা আছে। বঙ্কুবাবুর বাড়ি ফটিকের একরকম গা ঘেঁষেই। রোজ দু-বেলা যাতায়াতের পথে সে দেখেছে, বিয়ের মস্ত আয়োজন হচ্ছে। বিশাল শামিয়ানা, দেবদারু দিয়ে তোরণ হচ্ছে, নহবত বসেছে। মেলা লোক খাটছে দিনরাত। দুঃখের বিষয়, এ-বিয়েতে ফটিকের নেমন্তন্ন নেই। হওয়ার কথাও নয়। তার মতো লোককে পোঁছে কে?

ভয়ে ফটিকের কেমন যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু কী করবে তা বুঝতে পারছে না। বঙ্কুবাবুর মতো পাজি লোক মারা গেলে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু খুন করাটায় তার ঘোর আপত্তি হচ্ছে।

ফটিকের মাথায় নানা ফিকির খেলছে। কিন্তু কোনোটাই মনোমতো নয়। একবার মনে হল, পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালানোটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যারা তার পেছনে লেগেছে, তারা হয়তো নজর রাখছে। পুলিশের কাছে যাবে? গিয়ে লাভ নেই, পুলিশ তার কথায় বিশ্বাস করবে না। উলটে পিস্তল রাখার দায়ে হাজতে পুরবে। বঙ্কুবাবুকে সব ভেঙে বলবে? লাভ কী? তিনি খুন না হলে সে নিজেই যে খুন হবে।

দুপুর অবধি মাথাটা পাগল-পাগল লাগল। তারপর নুন-লঙ্কা-তেঁতুল দিয়ে পান্তাটা খেয়ে নিল সে। পেট ঠান্ডা হল। মাথাটাও যেন একটু শীতল লাগতে লাগল। দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে সে ভাবতে লাগল। কে হতে পারে লোকটা? খুন করতে চায় কেন? তাকে দিয়েই খুনটা করাতে চায় কেন? বঙ্কুবাবুকে মেরে কার কী লাভ?

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ফটিক। একখানা কথা মনে পড়ে গেল তার। মাস তিনেক আগে বঙ্কুবাবুর বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে মুনিশ খাটানো হয়েছিল। সেই দলে ফটিকও ছিল। সারাদিন খাটিয়ে মাত্র পাঁচটি টাকা মজুরি দিয়েছিলেন বঙ্কুবাবু। খাবার জুটেছিল চিঁড়ে আর গুড়। তবে বড়ো ঘরের জানালার নীচে আগাছা কাটার সময় ফটিকের

কানে একটা কথা এসেছিল। ফটিকবাবু যেন কাকে বলছেন, 'ওই গ্যাঁড়াই আমাকে মারবে একদিন। তারপর সব গাপ করবে।'

এই গ্যাঁড়াটি কে তা ফটিক জানে না। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। সে পিস্তলটা বিছানার তোশকের তলায় লুকিয়ে রাখল। পাঁচশোটা টাকা ট্যাকে গুঁজল। গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বঙ্কুবাবুদের বাড়িতে সানাই বাজছে। মেলা লোকলশকর খাটছে। তোরণে ফুলের তৈরি প্রজাপতি বসানো হয়েছে। লুচি ভাজার গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। ফটিক বাড়িতে ঢুকে চারদিক দেখতে লাগল। তার মতো আরও অনেকেই দেখতে এসেছে। ফটকে দারোয়ানদের তেমন কড়াকড়ি নেই।

শামিয়ানার ওপরে বড়ো বড়ো ঝাড়লণ্ঠন লাগানো হচ্ছে। ঘাড় উঁচু করে দেখছিল ফটিক। হঠাৎ কে যেন বজ্রমুষ্টিতে তার ডান হাতের কনুই চেপে ধরে বলে উঠল, 'এই যে!'

ফটিক এমন আঁতকে উঠল যে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আজ্ঞে আমি না। আমি কিছু করিনি।'

বঙ্কুবাবু কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'তুই ফটিক না?'

'যে আজ্ঞে।'

বঙ্কুবাবু হাসি হাসি মুখ করেই বলেন, 'একটু উপকার কর তো বাবা। কুমুদের দোকানে পাঁচ সের সুপুরি রাখা আছে, আনার লোক নেই। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আয় তো।'

ফটিক ধাতস্থ হল। আঁতকে ওঠা ভাবটা চট করে কেটে গেল তার। কাল যে এ লোকটাকেই খুন করার কথা। ঘাবড়ালে চলবে কেন। সে হঠাৎ বলে বসল, 'লোক নেই কেন বঙ্কুবাবু? গ্যাঁড়াকেই তো পাঠাতে পারেন।'

বঙ্কুবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'গ্যাঁড়া, গ্যাঁড়াটা আবার কে?'

ফটিক সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'ও যে আপনার কী যেন হয়।'

আন্দাজে ঢিল মেরেছিল। বোধহয় লাগল না।

বঙ্কুবাবু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভ্রূ-জোড়া কুচকে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর তো সাহস কম নয়। জামাইকে দিয়ে সুপুরি আনাতে বলছিস। আর আমার বড়ো জামাই কী তোর ইয়ার যে গ্যাঁড়া-গ্যাঁড়া করছিস?'

ফটিক হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কত ভুলভাল বলে ফেলি।'

'যা সুমুখ থেকে। সুপুরিটা নিয়ে আয়।'

পথে হাঁটতে হাঁটতে দুইয়ে দুইয়ে চার করল ফটিক। বঙ্কুবাবুর দুটো মেয়ে, ছেলে-টেলে নেই। বঙ্কুবাবু মারা গেলে মেয়েরা ওয়ারিশান। বড়ো জামাই গ্যাঁড়া। তাকে চেনে না ফটিক। তবে একটা গন্ধ পাচ্ছে।

সুপুরি পৌঁছে দেওয়ার পর বঙ্কুবাবু একটা সিকি বকশিস দিলেন। তারপর হাসিমুখ করেই বললেন, 'হঠাৎ গ্যাঁড়ার কথা বললি কেন বল দিকি।'

'আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।'

বঙ্কুবাবু একখানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনেই বললেন, 'অকালকুষ্মাণ্ড। ছিবড়ে করে ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও।'

ফটিক বশংবদ দাঁড়িয়ে থেকে শুনে নিচ্ছিল।

'কী শুনছিস দাঁড়িয়ে?'

'আজ্ঞে গালাগাল দিচ্ছেন তো, চলে গেলে বেয়াদপি হবে যে!'

'গালাগাল তোকে দিইনি।'

'তবে কাকে?'

'নিজের কপালকে। এই যে দেখছিস না, চেহারা বাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই আমার কপাল।'

যাকে দেখিয়ে দিলেন বঙ্কুবাবু, তার বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। রং ফরসা, কোঁচানো ধুতি আর মুগার পাঞ্জাবি পরে ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থা দেখছে। 'বেশ জামাইটি আপনার বঙ্কুবাবু।'

'হ্যাঁ, একেবারে মনের মতো। এখন যা তো। জ্বলছি নিজের জ্বালায়।'

ফটিক লোকটিকে ভালো করে দেখে নিল। যাতে ভুল না হয়। তারপর ধীরে-সুস্থে ফিরে এল। মনটা একটু হালকা লাগছে।

মাঝরাতে আবার জানালায় ঠকঠক। ফটিক জানালা খুলে অমায়িক গলায় বলে, 'যে আজ্ঞে।'

ভারী গলায় বলল, 'মনে আছে তো।'

'খুব মনে আছে। বাকি টাকাটা দেবেন নাকি?'

'কাল পাবে। জায়গামতো। কাজে যদি গণ্ডগোল হয় তো মরবে।'

'আর বলতে হবে না।'

পরদিন ফটিক দোকানে গিয়ে ভালো করে সাঁটিয়ে খেল। দুপুরে ঘুমোল, বিকেলে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে হাজির হল বঙ্কুবাবুর বাড়িতে। সারা বাড়ি আজ যেন রাজবাড়ির মতো দেখাচ্ছে। আলোয় আলোয় স্বপ্নপুরী। ভিড়ে ভিড়াক্কার। বরসহ বরযাত্রীরাও সব এসে গেল সন্ধের মুখেই। গোলাপজল ছিটোনো হচ্ছে চারদিকে। বঙ্কুবাবু সবাইকে 'আসুন, বসুন' করছেন। পাশে গ্যাঁড়া। সেও খুব সেজেছে।

বাজি পোড়ানো শুরু হল। বাজির শব্দে চারদিক একেবারে গমগম করতে লাগল। হঠাৎ ফটিক লক্ষ করল, গ্যাঁড়া এই এত ভিড়ের মধ্যেও আড়চোখে তাকে নজরে রাখছে।

ফটিক মনে মনে হাসল। গ্যাঁড়া একমুহূর্তের জন্যও বঙ্কুবাবুর কাছ থেকে নড়ছে না।

লোকজন যখন শামিয়ানার বাইরে এসে ভিড় করে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে আতশবাজি দেখছে, ঠিক সেইসময় ফটিক এগিয়ে গিয়ে গ্যাঁড়ার পেছনে দাঁড়াল। নলটা তার পিঠে ঠেকিয়ে বলল, 'ইষ্টনাম স্মরণ করুন বঙ্কুবাবু!' গ্যাঁড়া হঠাৎ আঁতকে উঠে তখনই বলল, 'আমি বঙ্কুবাবু নাকি? আহাম্মক কোথাকার। ওই তো বঙ্কুবাবু।'

ফটিক মাথা চুলকে বলল, 'ইস, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল তো।'

গ্যাঁড়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'গাধা কোথাকার। যাও যাও, কাজ সারো, আর সময় নেই!'

ফটিক একগাল হাসল, 'বটে। তা টাকাটা জায়গামতো আছে তো।'

গ্যাঁড়া মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'আছে।'

'ঠিক তো।'

গ্যাঁড়া ঘুরে তার গালে একখানা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, 'বেয়াদপ কোথাকার।'

ব্যাপার দেখে বঙ্কুবাবু এগিয়ে এলেন, 'এ কী। কী হয়েছে?'

ফটিক গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'হয়নি। তবে হবে।'

'কী হবে ফটিক?'

ফটিক গ্যাঁড়ার দিকে চেয়ে বলল, 'বলব বাবু?'

গ্যাঁড়ার মুখটা হঠাৎ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। আচমকা সে ভিড় ঠেলে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল। তাকে আর দেখা গেল না।

বঙ্কুবাবু চালাক লোক। ফটিকের হাত ধরে ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন চট করে।

'ফটিক, ব্যাপারখানা কী?'

ফটিক লজ্জায় অধোবদন হয়ে সবই বলল। খুব অপরাধী মুখ করে। কিন্তু বঙ্কুবাবুর মুখখানা চকচক করতে লাগল। একটু খুশির গলাতেই বললেন, 'ব্যাটা অনেকদিন ধরেই নানা মতলব আঁটছিল। তুই বেজায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিস। তোর বুদ্ধি আছে। ও ব্যাটা আর ইদিকে আসবে না শিগ্‌গির।' বঙ্কুবাবু খুশি হলেই হাত-উপুড়। আর তাঁর হাত উপুড় মানেই পর্বত। বঙ্কুবাবু ফটিককে একখানা দোকান করে দিলেন। বেশ বড়োসড়ো মুদির দোকান। আর বটগাছের তলায় পাঁচশো টাকাও পেয়ে গিয়েছিল সে। পিস্তলটা বঙ্কুবাবুকে দিয়েছিল ফটিক। বঙ্কুবাবু বললেন, 'এটা আমারই জিনিস। গ্যাঁড়া গেঁড়িয়েছিল।'

তা কথাটা হল, ফটিককে আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হচ্ছে না।

নিত্যহরি ও মঙ্গারাম

মাঝরাতে চৌকিদার হরদেও সিং চেঁচিয়ে জানান দিল, 'হোঁশিয়ার। হোঁশিয়ার! ডাকু মঙ্গারাম আ রহা হ্যায়।'

সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে ঘরে সাজো সাজো রব শুরু হয়ে গেল। তার মানে এই নয় যে, গাঁয়ের লোকজন ডাকাত ঠেকাতে লাঠিসোঁটা খুঁজতে লাগল। মোটেই তা নয়। বরং ভয়ের চোটে যে যেখানে পারে লুকিয়ে পড়তে লাগল। কেউ খাটের তলায়, কেউ আলনার পিছনে, কেউ বাড়ির বাগানে কচুগাছের আড়ালে। কেউ কেউ রাতে গাছে উঠে বসে রইল।

মঙ্গারামের নামে গোটা পরগনা কম্পমান। দারোগা-পুলিশ অবধি তার নামে শিউরে ওঠে।

নয়নপুর গঞ্জে নতুন গেমসার হয়ে এসেছেন নিত্যহরি মিত্র। বয়স বেশি নয়। ছোকরা মানুষ। নিজে ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান। খেলাধুলো নিয়েই সারাদিন মত্ত থাকেন। তিনি এসেই ছেলেদের এমন মাতিয়ে তুলেছেন যে, নয়নপুরের ভোলানাথ ইনস্টিটিউশনের ছেলেরা দু'মাসের মধ্যেই খেলাধুলোয় বেশ উন্নতি করে ফেলেছে। নিত্যহরি স্কুলেরই মাস্টারমশাই দুলালবাবুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে আছেন। এখনও উপযুক্ত বাসা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মাঝরাতে গোলমাল শুনে নিত্যহরি উঠে পড়লেন।

দুলালবাবু কাঁপতে কাঁপতে এসে বললেন, 'কী যে হবে কে জানে। মঙ্গা ডাকাত আসছে। কার বাড়িতে যে হানা দেবে তা কে জানে। চলুন, বাড়ি ছেড়ে আমরা পিছনে পুকুরপাড়ের আগাছার জঙ্গলে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকি।'

নিত্যহরি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এর জন্যই তো চোর-ডাকাতদের সাহস দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছে। ডাকাত আসছে তো কী? আপনারা সবাই মিলে এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়ালে ডাকাত তো পালানোর পথ পাবে না।'

'সেসব পরে ভাবা যাবে নিত্যবাবু। আপাতত প্রাণরক্ষা করা দরকার। মঙ্গারাম সাঙ্ঘাতিক ডাকাত। কত সেপাই-সান্ত্রী মিলে চেষ্টা করেও তার কিছু করতে পারেনি।'

নিত্যহরি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনারা পালাতে চাইলে বাধা দেব না। কিন্তু আমি তত ভিতু নই। আমি একাই তার মুখোমুখি হব।'

একথা শুনে দুলালবাবু হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'অন্যায় সাহস ভাল নয় মশাই। বিদেশ-বিভুঁয়ে চাকরি করতে এসে বেঘোরে প্রাণ দিতে চান? আপনি চাইলেও আমি তো তা হতে দিতে পারি না।'

দুলালবাবুর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরাও এসে বলল, 'মাস্টারমশাই, মঙ্গারাম বড় সাঙ্ঘাতিক লোক। তার সঙ্গে কেউ পারে না। আপনি ওরকম দুঃসাহস দেখাবেন না, তাতে আমরাও মরব।'

নিত্যহরি পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি কিছু করব না। তবে পালিয়েও থাকব না। আমি মঙ্গারামকে চোখে দেখতে চাই।'

বিস্তর টানা-হ্যাঁচড়াতেও নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন নিত্যহরি। তিনি পালাবেন না।

রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করবেন। মঙ্গারামের কাণ্ডকারখানা দেখে তারপর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাববেন।

বাড়ির লোক যথারীতি বাড়ির পিছনের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে রইল। নিত্যহরি বেরিয়ে এলেন।

একটু বাদেই পশ্চিম দিক থেকে কিছু লোককে হইহই করে ছুটে আসতে দেখা গেল। তাদের হাতে জ্যোৎস্নার আলোয় লাঠি-সড়কি-দা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছিল। তারা সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে পুবদিকে এগিয়ে গেলে নিত্যহরিও তাদের পিছু নিলেন।

নয়নপুর গ্রাম হলেও সমৃদ্ধ জায়গা। এখানে অনেক সম্পন্ন লোকের বাস। রাস্তার দু'ধারেই দেওয়ালঘেরা বেশ বড়সড় বাড়িঘর। ডাকাতের দল একটা বিশেষ বাড়ির সামনেই গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ডাকাতদের সর্দার—মঙ্গারামই হবে বোধ হয়, বেশ লম্বা ছিপছিপে চেহারার একটা লোক পিছন ফিরে বলল, 'ফটক ভিতর থেকে বন্ধ। আমি ভিতরে গিয়ে ফটক খুলে দিচ্ছি। তারপর তোরা ঢুকবি।'

এই বলেই লোকটা একটু পিছিয়ে এসে কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে এক লাফে উঁচু ফটকটা পেরিয়ে ভিতরে গিয়ে পড়ল। নিত্যহরি নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ফটকটা যথেষ্ট উঁচু। চোখের আন্দাজে তাঁর মনে হল সাত ফুটের কাছাকাছি। এতটা উচ্চতা বড় বড় হাইজাম্পাররা ডিঙোয় ব্যাক ফ্লিপে, তাও ওপাশে পুরু নরম ফোম রবারের গদি থাকে।

ডাকাতরা হইহই করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। পিছনে নিত্যহরিও। বিশাল বাড়ি। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। ডাকাতরা গিয়ে সদর দরজায় দুম দুম করে লাথি মারতে লাগল।

হঠাৎ ভিতর থেকে দুম দুম করে বন্দুকের শব্দ হল। আর দরজা খুলে পিল পিল করে বন্দুকধারী পুলিশেরা বেরিয়ে এল। হঠাৎ চারদিকে জ্বলে উঠল সার্চলাইট।

বোঝা গেল, গোপন খবর পেয়ে পুলিশ আগে থেকেই ওত পেতে ছিল এ বাড়িতে। নিত্যহরি একটু আড়ালে সরে গিয়ে লড়াই দেখতে লাগলেন।

লড়াই অবশ্য হল না। আচমকা এবং অপ্রত্যাশিত প্রতি-আক্রমণে ডাকাতরা পিছু ফিরে চোঁ চাঁ পালাতে লাগল। নিত্যহরি লক্ষ করছিলেন শুধু একজনকে। সে মঙ্গারাম। ফটকের দিকে পলায়নপর ডাকাতদের দিকে গুলি চালানো হচ্ছে দেখে মঙ্গারাম সেদিকে গেল না। বাড়ির উত্তরধারে একটা পুকুরের দিকে দৌড়ে গেল। নিত্যহরি ভাবলেন, বোধ হয় পুকুরে ডুবে লুকিয়ে থাকার মতলব। কিন্তু তাঁকে অবাক করে দিয়ে মঙ্গারাম চিতাবাঘের গতিতে দৌড়ে গিয়ে এক লাফে পুকুর ডিঙিয়ে গেল। আর যে গতিতে দৌড়ল, তেমন গতি কখনও কারও দেখেননি নিত্যহরি। আর তারপর হাতের লম্বা লাঠিতে ভর দিয়ে চমৎকার একটা পোল ভল্টে উঁচু দেওয়ালটা ডিঙিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দারোগা দীনেশ সাধুখাঁ হাতে পিস্তল আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এসে সখেদে বললেন, 'নাঃ ব্যাটাকে আজও ধরা গেল না।'

নিত্যহরি হতবাক, মুগ্ধ, উত্তেজিত। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দীনেশ সাধুখাঁকে বললেন, 'কিন্তু ওকে যে ধরতেই হবে দারোগাবাবু।'

দীনেশ অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'নতুন গেমসার নিত্যহরিবাবু না? তা আপনি এই হাঙ্গামার মধ্যে কী করছেন?'

নিত্যহরি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এক অসাধারণ প্রতিভাকে দেখছি।'

'তার মানে?'

'মঙ্গারাম তুচ্ছ ডাকাত হলেও সে ইচ্ছে করলে আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।'

দীনেশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সেসব জানি না মশাই। তবে সে আমার মুখে চুনকালি দিয়েছে। আজ নিখুঁত ফাঁদ পেতেছিলুম, তবু পালিয়ে গেল।'

'দারোগাবাবু, মঙ্গারামের ঠিকানাটা আমাকে দেবেন?'

'দূর মশাই, ডাকাতের আবার ঠিকানা কী? ঠিকানা থাকলে তো কবেই ধরে আনতাম। তবে শুনেছি, উত্তরের জঙ্গলে থাকে। দুর্গম জায়গা বলে সেখানে রেইড করতে পারছি না।'

পরদিন সকালেই নিত্যহরি মাপবার লম্বা ফিতে নিয়ে এসে প্রথমে ফটকটার মাপ নিলেন। সাত ফুট দুই ইঞ্জি। তারপর পুকুরটা মেপে দেখলেন। আটাশ ফুট দু'ইঞ্চি। দেওয়ালের উচ্চতা মেপে দেখলেন। আঠারো ফুটের কাছাকাছি। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। প্রত্যেকটা লাফ এবং ভল্টই বিশ্বরেকর্ডের কাছাকাছি। মঙ্গারাম যে দূরত্বটা দৌড়ে পুকুর ডিঙিয়েছিল, সেই দূরত্বটা মেপে নিত্যহরি দেখলেন, একশো মিটারের ওপর। তাঁর অনুমান, এই দূরত্বটা মঙ্গারাম দশ সেকেন্ডের মধ্যেই পেরিয়েছে। যদি ঠিকমতো তালিম দেওয়া যায়, তাহলে মঙ্গারাম হাই জাম্প, লং জাম্প, পোল ভল্ট এবং দৌড়ের সবকটাতেই বিশ্বরেকর্ড করবেই।

নিত্যহরি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সকালের জলখাবার খেয়েই উত্তরের জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়লেন। মঙ্গারামকে খুঁজে বের করতেই হবে।

খুঁজে পাওয়া বড় সহজ হল না। বিস্তর মেহনত করতে হল। প্রথমে তো কেউ পথ দেখাতে চায় না। দ্বিতীয়ত, জঙ্গলে বাঘ-ভালুক আছে। হাতি, বুনো কুকুর আর সাপেরও আস্তানা। তবে শেষ অবধি তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে লক্ষ করে গুপ্তচর সন্দেহে অবশেষে মঙ্গারামের লোকেরাই ধরে তাদের আস্তানায় নিয়ে মঙ্গারামের সামনে হাজির করে দিল।

ঘোর জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়িতে মঙ্গারামের আড্ডা। একখানা খাটিয়া পেতে বসে মঙ্গারাম শরবত খাচ্ছিল। নিত্যহরিকে দেখে চোখ পাকিয়ে তাকাল।

আবেগে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না নিত্যহরি। তারপর বললেন, 'মঙ্গারাম, তোমার ভিতরে কী সাঙ্ঘাতিক প্রতিভা আছে, তা তুমি জানো না। তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

মঙ্গারাম হাঁ।

নিত্যহরি নিজের বিপদের কথা ভুলে গেছেন। তাঁর সামনে শুধু অলিম্পিকের দৃশ্য। আর সেখানে মঙ্গারাম একের পর এক স্বর্ণপদক জয় করে চলেছে।

নিত্যহরি মঙ্গারামকে বোঝাতে শুরু করলেন। বোঝাতে বোঝাতে রাত হয়ে গেল। রাতটা মঙ্গারামের ভাঙা বাড়িতেই কাটল তাঁর। পরদিন সকালে ফের মঙ্গারামকে বোঝাতে বসলেন।

টানা তিনদিন পর মঙ্গারাম রাজি হল। সে ডাকাতি ছেড়ে এবার স্পোর্টসে নাম দেবে।

নিত্যহরির মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটল।

মঙ্গারাম বলল, 'কিন্তু পুলিশ তো আমাকে ছাড়বে না নিত্যবাবু।'

'সে দায়িত্ব আমার। এত বড় প্রতিভা কি নষ্ট হবে নাকি?'

নিত্যহরি নয়নপুরে ফিরেই সোজা গিয়ে দারোগাবাবুর কাছে হাজির। দারোগাবাবুকে অবশ্য বেশি বোঝাতে হল না। প্রস্তাব শুনে তিনি বললেন, 'মঙ্গারাম যদি ডাকাতি ছেড়ে স্পোর্টসে নামে, তাহলে তো আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি মশাই। কিন্তু তাকে তালিম দিচ্ছে কে? আপনি নাকি?'

নিত্যহরি বিরস মুখে বললেন, 'দিতে চেয়েছিলুম। তবে মঙ্গারাম সময় দিতে পারবে না। কোচিং নিতে গেলে ডাকাতিতে ফাঁক পড়বে, রুজি-রোজগারে টান ধরবে। তবে ওসব বিরল প্রতিভার আর কোচিং-এর দরকারই বা কী! সামনেই জেলা স্পোর্টস। একবারে সেখানেই ওকে হাজির করব।'

কথাটা রটে যেতে দেরি হল না। চারদিকে হইহই পড়ে গেল। মঙ্গারাম ডাকাত ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসে লাফঝাঁপ আর দৌড় প্রতিযোগিতায় নামবে, এর মতো অভাবনীয় খবর আর কী আছে?

স্পোর্টসের দিন ভোরবেলা থেকে লোক ভেঙে পড়ল জেলা শহরের মাঠে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব থেকে গণ্যমান্যর কেউ বাকি নেই আসতে। চারদিকে তুমুল চেঁচামেচি। নয়নপুর ইস্কুলের গেমসার নিত্যহরির নাম লোকের মুখে মুখে। ওরকম একজন সাঙ্ঘাতিক ডাকাতকে স্পোর্টসে নামিয়ে তিনি একটা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শোনা যাচ্ছে, আগামী অলিম্পিকে মঙ্গারাম একাই পাঁচ-ছ'টা সোনার মেডেল আনবে। সুতরাং উত্তেজনা তুঙ্গে।

যার জন্য এত উত্তেজনা, সেই মঙ্গারামকে একেবারে গাড়িতে চাপিয়ে উত্তরের জঙ্গল থেকে এনে হাজির করেছেন নিত্যহরি। কারও সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছেন না।

যাই হোক, বেলা দশটার সময় পতাকা উত্তোলন, বক্তৃতা ইত্যাদির পর স্পোর্টস শুরু হল। প্রথমে হিট। একশো মিটার দৌড়ের প্রথম হিটেই মঙ্গারাম নামল। মাঠ ফেটে পড়ল হর্ষধ্বনিতে।

কিন্তু দৌড় শুরু হতেই—এ কী! সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মঙ্গারামের পা যেন চলছেই না। থপ থপ করে এমন দৌড়চ্ছে যে, দৌড় না হাঁটা তো বোঝার উপায় নেই।

চোখের পলকে বাকি ন'জন দৌড়বাজ তাকে পেরিয়ে গেল। মঙ্গারাম পৌঁছল সবার শেষে। তাও হাঁফাতে হাঁফাতে। চারদিকে সবাই হোঃ হোঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠল।

চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে দৌড়ে গেলেন নিত্যহরি, 'এটা কী হল হে মঙ্গারাম। তুমি যে দশ সেকেন্ডে একশো মিটার দৌড়ও।'

মঙ্গারাম অধোবদন হয়ে বলল, 'তখন পারি।'

'তখন যে পারে সে এখনও পারে। মঙ্গারাম, তুমি মন দিচ্ছ না। নিজেকে মোটিভেটেড করো। মনের জোর আনো। নইলে যে আমার মুখরক্ষা হবে না।'

তা হলও না মুখরক্ষা। হাই জাম্পে মঙ্গারাম পাঁচ ফুটও ডিঙোতে পারল না। অন্য সবাই তার চেয়ে ঢের বেশি লাফাল।

উত্তেজিত নিত্যহরি বললেন, 'আমি যে নিজে মেপে দেখেছি মঙ্গারাম তুমি আটাশ ফুট চওড়া পুকুর ডিঙিয়ে গেছ।'

মঙ্গারাম অধোবদন হয়ে বলল, 'তখন পারি।'

হতাশ নিত্যহরি মাথা নেড়ে বললেন, 'অবিশ্বাস্য। এ যেন মনে হচ্ছে দু'নম্বর মঙ্গারাম। কী করে এরকম হয়?'

পোল ভল্টে আরও যাচ্ছেতাই কাণ্ড হল। দশ ফুট উঁচুতে বার লাগানো হয়েছিল। সবাই টপাটপ পেরিয়ে গেল। মঙ্গারাম বাঁশে ভর দিয়ে উঠল বটে, কিন্তু শূন্যে বাঁশের গায়ে কিছুক্ষণ ঝুলে থেকে তারপর পিছন দিকে মাঠের ওপর পড়ে কুমড়ো-গড়াগড়ি। সারা মাঠ 'দুয়ো দুয়ো', 'শেম শেম' বলে চেঁচাতে লাগল।

নিত্যহরি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি যে আঠারো ফুট ডিঙিয়েছ, এবং আরও ছোট বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে, তা তো আমার স্বচক্ষে দেখা মঙ্গারাম। তা হলে তোমার এই হাল কেন?'

অধোবদন মঙ্গারাম মাথা নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে, তখন পারি।'

'এখন পারো না!'

করুণ মুখখানা তুলে মঙ্গারাম বলল, 'না মাস্টারমশাই।'

মাসির বাড়ি

নবাবগঞ্জে পৌঁছে সে শুনল, মাদলপুরের শেষ বাস সন্ধেবেলা ছেড়ে গিয়েছে। রাতে ওদিকে যাওয়ার যানবাহন বলতে কিছু নেই।

শুনে অগাধ জলে পড়ল গয়ারাম। ট্রেনটা তিন ঘণ্টা লেট না করলে এতক্ষণে তার মাসির বাড়িতে পৌঁছে বিকেলের ফলার সেরে ওঠার কথা। খিদেও বড়ো কম পায়নি। মাত্র বাইশ বছর বয়স। গোবিন্দপুর গাঁ থেকে টানা তিন মাইল হেঁটে এসে ট্রেন খারাপ। রাস্তায় একটু বাদামভাজা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। পয়সা বেশি নেইও সঙ্গে। রাস্তায় চোরে-ডাকাতে কেড়ে নেবে বলে মা রাস্তা-খরচটুকু ছাড়া আর মাত্র পাঁচটা টাকা দিয়েছেন। অবশ্য মাসির বাড়ি পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। কিন্তু পৌঁছোনো নিয়েই চিন্তা।

তার মাসতুতো দাদা কালীশঙ্করের বিয়ে। কাল ভোরবেলা বরযাত্রীরা বর নিয়ে রওনা হয়ে যাবে। কালীদার ভাবী শ্বশুরবাড়ি নাকি একবেলার পথ। খানিকটা নৌকোয় গিয়ে তারপর হাঁটাপথ। অবশ্য বরযাত্রীদের জন্য গোরুর গাড়ি আর বরের পালকিও থাকবে। আর বরযাত্রী যাওয়ার জন্যই তাড়াহুড়ো করে আসা। মাসি পইপই করে আসার জন্য চিঠি লিখেছেন।

কিন্তু গয়ারাম এখন করে কী?

নবাবগঞ্জ জায়গা মন্দ নয়, দোকানবাজার আছে, স্টেশন আছে, পোস্ট অফিস আছে। মাদলপুর অবশ্য নিকষ্যি গাঁ। নবাবগঞ্জ আর মাদলপুরের মাঝখানে একখানা পেল্লায় জলা জমি আছে। লোকে বলে পেতনির জলা। ভূতপ্রেতের কথা ছেড়ে দিলেও এই শীতে সন্ধের পর রোজই বাঘ বের হয়। কমলপুরের জঙ্গল থেকে বুনো কুকুরের ঝাঁকও কখনো কখনো হানা দেয়। তারা বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

বাজারের প্রান্তে অশ্বত্থ গাছটার তলায় বাঁধানো চাতালে বসে যখন গয়ারাম সাত-পাঁচ ভাবছে, তখনই হঠাৎ টের পেল, চাতালের ওদিকটায় অন্ধকারে বসে দুটো লোক গভীর শলাপরামর্শ করে যাচ্ছে, দু-একবার 'গুণময় রায়' আর 'মাদলপুর' শব্দ দুটো কানে এল। সে একটু উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

একজন বলল, 'শোন পচা, বুক ঠুকে কাজটা করে ফেলতে পারলে আমাদের আর চিন্তা নেই। ধর, যদি গয়না বেচে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে যাই, তাহলে দু-জনে মিলে নবাবগঞ্জে মনোহারি দোকান দেব। কথা দিচ্ছি, আর জীবনে চুরি-জোচ্চুরি করব না, এই একবারটি ছাড়া।'

'দ্যাখ গদা, আমি জীবনে কখনো ওসব করিনি, ওসব করলে ভগবান পাপ দেয়।'

'আহা, বলছি তো, এবারকার মতো পাপটা করে ফেলে একাট প্রায়শ্চিত্তির করে নিলেই হবে। ওরে, ভগবান তো পাপীদের জন্যই আসেন। তাই তো বলে, 'পতিতপাবন'।'

'যদি ধরা পড়ে যাই?'

'সে ভয় নেই। বিয়েবাড়ি বলে কথা! লোকজনের যাতায়াত লেগেই আছে। ডেকরেটরের লোক, জেনারেটরের লোক, না হয় তো রান্নার জোগালি, যা হোক একটা ভেক ধরে নিলেই হবে। চার মাইল তো মোটে রাস্তা। টুক করে কাজ সেরে ফিরে আসব।'

এরা তার মাসির বাড়িতে চুরি করার মতলব আঁটছে দেখে গয়ারাম খুশিই হল। এলাকার ছেলে, সুতরাং পথঘাট চেনে, তা ছাড়া পথের সাথিও পাওয়া যাবে।

গয়ারাম একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'ভায়ারা, একটু আনাড়ি মনে হচ্ছে।'

ছোকরা দু-জন তার দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'তুমি কে?'

গয়ারাম হাতে হাত ঘষে বলল, 'দাশরথি পয়মালের নাম জানা আছে?'

পচা আর গদা তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার দু-পাশে জেঁকে বসে বলল, 'না ভাই, তিনি কে?'

'এ লাইনে তিনিই শেষ কথা। অতবড়ো গুণী আর এ লাইনে নেই। কুঞ্জপুরের কাছে থাকেন, একেবারে সাধুসন্তের মতো জীবন! পাপের টাকা ভোগ করেন না, বিলিয়ে দেন। তাঁর ছেলেরা অবশ্য ওই কর্ম করেই খাচ্ছে।'

পচা বলল, 'বটে। কিন্তু ভাই, তুমি তো এ তল্লাটের লোক নও। কী মতলবে উদয় হয়েছ?'

'আমাদের কি তল্লাট বলে কিছু আছে? পেটের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। তবে দাশরথি পয়মালের চেলা তো, পেটে বিদ্যেটা আছে বলে অসুবিধে হয় না।'

গদা খুব আহ্লাদের সঙ্গে বলল, 'এই তোমার মতোই একজন সঙ্গীকে আমরা খুঁজছি। আজ রাতে মাদলপুরের এক বিয়েবাড়িতে একটা বড়ো দাঁও আছে। শুনেছি মেলা গয়নাগাটি আর টাকাপয়সার ব্যাপার আছে।'

গয়ারাম খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। ভাবখানা, ছোটোখাটো কাজে তার গা নেই। বলল, 'তা ছেলের বিয়ে না মেয়ের বিয়ে? ছেলের বাড়িতে তো বিশেষ গয়নাগাটি থাকবার কথা নয়। মেয়ের বাড়ি হলেও না হয় কথা ছিল।'

পচা মাথা চুলকে বলে, 'ছেলের বাড়িই বটে। তবে গুণময় রায় ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ লাখ তুলেছে, আর মদন স্যাকরাকে বিস্তর গয়নার বরাত দিয়েছে, এটা পাকা খবর।'

গয়ারাম বলল, 'রাস্তা চেনা আছে? শুনেছি মাদলপুর যেতে বড়ো একটা জলা পড়ে।'

'ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। রাতবিরেতে আমাদের ওদিকে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়।'

গয়ারাম নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলল, যাক বাবা, চার-পাঁচ মাইল রাস্তা যে এই অন্ধকারে একা ঠ্যাঙাতে হবে না, এটাই যথেষ্ট। গয়ারাম বলে, 'তা না হয় হল, কিন্তু পেটে যে ছুঁচো ডন মারছে, খালি পেটে কী আর হাত-পা সচল থাকে?'

এবার গদা বলল, 'এই বাজারেই আমার পিসেমশাইয়ের পাইস হোটেল, আমিই এবেলা ম্যানেজারি করেছি। খাওয়ার ভাবনা কী?'

গয়ারাম ফের আরামের শ্বাস ছাড়ল। ভগবান একেবারে ছপ্পড় ফুঁড়ে দিচ্ছেন।

খাওয়াটা মন্দ হল না। ডাল, ভাত আর নিরামিষ তরকারি, সঙ্গে একবাটি মাংস। চেটেপুটে খেয়ে তিনজন রওনা হয়ে পড়ল।

ভূতনির জলা মাঠ ঘোর অন্ধকার। তবে পচা আর গদা পথঘাট ভালোই চেনে। ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, আঁকাবাঁকা রাস্তায় ডাঙা জমি দিয়ে দিব্যি যাচ্ছে। পিছনে গয়ারাম।

কিন্তু খানিকটা হাঁটার পরই গয়ারাম শুনতে পেল, অন্ধকারে এই নির্জন পথে তারা ঠিক একা নয়। আশপাশে যেন আরও লোকজন চলেছে এবং তাদের ফিসফাস কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে।

গয়ারাম একটু ঠাহর করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল এবং একটু বাদেই শুনতে পেল, হাত দশেক তফাতে বাঁ ধারে এক বুড়ো মানুষের কাশির শব্দ। তারপরই ঘড়ঘড়ে গলায় কেশো লোকটা কাকে যেন বলল, 'বুঝলি গাব্বু, এই কাশির জন্যই চুরি করা ছাড়তে হয়েছিল আমাকে। চোর কাশলেই সর্বনাশ। অথচ এমন দাঁওটাই কি ছাড়া যায়, বল তো!'

'আহা, তোমার ভিতরে যাওয়ার কী দরকার? তুমি বাইরে বসে কাজের লোকেদের সঙ্গে গপ্পোসপ্পো কোরো। আমি ভিতরে ঢুকে কাজ সেরে আসব। গুণময় রায়ের বাড়ির আনাচকানাচ আমার চেনা।'

গয়ারাম প্রমাদ গুনল, পচা আর গদাই শুধু নয়, আরও নিশিকুটুমরাও তার মাসির বাড়ি যাচ্ছে!

কয়েক কদম এগোতে-না-এগোতেই পিছন থেকে কয়েক জোড়া দৌড়-পায়ের আওয়াজ পেল গয়ারাম। তার ডানদিক দিয়ে মাত্র চার-পাঁচ হাত তফাতে গোটাকয়েক ছোকরা গোছের লোক ছুটে গেল। পিছনেরজন একটু উঁচু গলায় বলল, 'মাদলপুরের শীতলাতলায় গুণময় রায়ের বাড়ি, বুঝলি তো? ভুল বাড়িতে ঢুকিস না।'

তারা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল।

পচা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা কী হচ্ছে বল তো?'

গয়ারামও অবাক। বলল, 'তাই তো? এরা কারা?'

'বুড়োটা পুরোনো চোর কাশী, সঙ্গে ওর নাতি গাব্বু, আর যারা ছুটে গেল, তারা পোড়াগাছতলার নন্দকিশোর সংঘের ছেলে, সব ক-টা চোর।'

গদা বলল, 'সর্বনাশ! চল চল, পা চালিয়ে চল।'

পচা বলল, 'দৌড়োতে হবে, নইলে পারব না।'

তিনজনে যথেষ্ট বেগে দৌড়োতে লাগল।

আশ্চর্যের বিষয়, দৌড়েতে দৌড়োতে আরও তিনটে দলকে একে একে ছাড়িয়ে গেল তারা। কিন্তু চতুর্থ দলটাকে পারল না। হঠাৎ পটাপট ল্যাং মেরে তিনজনকেই ফেলে দিল জনাদশেক চোরের একটা দল।

মুখে টর্চ মেরে একটা লোক বলল, 'অ্যাই খবরদার, আমাদের টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করলে লাশ পুঁতে দেব। আমরা গিয়ে আগে চেঁছেপুঁছে নিই, তোরা পরে প্রসাদ পাবি।'

তিনজনে চিঁচিঁ করতে লাগল পড়ে থেকে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে যখন তারা মাদলপুর পৌঁছল, তখন তাদের দম বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা।

কিন্তু মাদলপুর পৌঁছে তাদের চক্ষু চড়কগাছ। রাত ন-টা বেজে গিয়েছে। এই সময় গাঁ-গঞ্জের লোকের নিশুত রাত। কিন্তু কোথায় কী? গাঁয়ে ঢোকার মুখেই বটতলায় বেশ কয়েকটা হ্যাজাক জ্বলছে। আর সারি সারি টেবিল-চেয়ার পেতে গাঁয়ের ছেলেছোকরারা বসে কীসের যেন টিকিট বিক্রি করছে। বিভিন্ন টেবিলের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক লোক টিকিট কাটছে। গয়ারাম অবাক হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কীসের লাইন দাদা?'

'ওসব চোরেদের লাইন।'

'কেন, কেন, চোরের আবার লাইন কীসের?'

'আহা, গুণময়বাবুর ছেলের বিয়ে শুনে চারদিক থেকে চোরেরা হাজির হচ্ছিল যে। নানারকম ভেক ধরেই আসছিল। ধরা পড়ে পেটাইও হচ্ছিল। কিন্তু গুণময়বাবুর দয়ার শরীর

তো! তাই তিনি বললেন, 'ওরে বাপু, চোরেদেরও তো করে খেতে হবে। চুরি করতে চায় তো চেষ্টা করুক না। তবে বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, তাও দেখতে হবে। তাই টিকিটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দু-টাকার টিকিট কাটলে চুরি করার জন্য এক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। তবে চুরির সময় ধরা পড়লে পাঁচ টাকা ফাইন।'

পচা আর গদা করুণ মুখে বলল, 'আমরা কি পারব? কত বড়ো বড়ো নামজাদা সব চোরদের দেখতে পাচ্ছি।'

গয়ারাম দমে গিয়ে বলল, 'তাই তো হে!'

অগত্যা টিকিট কেটেই তারা তিনজন গাঁয়ে ঢুকল। গিয়ে দ্যাখে, গুণময়বাবুর বাড়ির সামনে বেশ লম্বা লাইন। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। পেল্লায় বাগান, দু-মহলা বাড়ি, চারদিকে দাসদাসী, লোকলশকরের অভাব নেই।

চোরেদের সঙ্গে লাইন দিয়ে নিজের মাসির বাড়িতে ঢুকতে গয়ারামের প্রেস্টিজে লাগছিল। কিন্তু উপায় বা কী? সুতরাং পচা আর গদার পিছনে সেও লাইনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

একটা ছোকরা চোর একটা শসা, একটা পাতিলেবু চুরি করে বেরিয়ে এল। একজন আধবুড়ো লোক একটা পুরোনো গামছা পেয়ে সেটা পতাকার মতো নাড়তে নাড়তে বিদেয় হল। একজন একটা নারকেল পেয়ে সেটাকেই চুমু খেয়ে সবাইকে হাত উঁচু করে দেখাল। একজন পেয়েছে একমুঠো কাঁচালঙ্কা, তার মুখখানা ভারি বেজার। বুড়ো চোর শশিপদ এখন চোখেও কম দ্যাখে, কানেও কম শোনে। সে একগাছা ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে এসে বিড়বিড় করতে করতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়িমুখো রওনা হল। তবে এর মধ্যেই এক ছোকরা চোর একখানা তাঁতের শাড়ি বগলে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতেই পচা বলল, 'ওই হচ্ছে পাঁচটা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান চোর, ফটিক।'

ঘণ্টাখানেক বাদে তাদের পালা আসতেই তিনজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ি-ঘর-দেওয়ালের মধ্যে।

সামনেই মেসোমশাই গুণময় রায়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গয়ারাম তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রণাম করল। কিন্তু গুণময়বাবু তাকে মোটেই পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।'

'মেসোমশাই, আমি গয়ারাম।'

'আয়ারাম-গয়ারামদেরই তো দেখছি রে বাবু।'

রাতের অতিথি

গোপালবাবু যে! শুনলুম কাল রাতে আপনার বাড়িতে চোর এসেছিল!

ওঃ, সে কী কাণ্ড মশাই! চোর বলে চোর! সাংঘাতিক চোর!

চোর-ডাকাতের যুগ পড়েছে মশাই। চারদিকেই চুরির একেবারে মোচ্ছব পড়ে গেছে। কী চুরি হচ্ছে না বলুন। সোনাদানা, টাকাপয়সা, বাসন-কোসন, জামাকাপড়, এমনকী জুতো, ঝাঁটা, বস্তা, পাপোশ যা পাচ্ছে চেঁছেপুঁছে নিয়ে যাচ্ছে। পরেশবাবুর বাড়িতে যেদিন চুরি হল তার পরদিন তো তাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকু পর্যন্ত ছিল না।

তা যা বলেছেন। চোরদের আস্পদ্দা দিন দিন বাড়ছে।

অতি সত্য কথা। নরেনবাবুর বাড়িতে যে চোরটা এসেছিল সে তো রীতিমতো নরেনবাবুকে দু-চার কথা শুনিয়ে যেতে ছাড়েনি। কিপটে, কঞ্জুস, নীচু নজর, রুচিহীন, এমনকী এমন কথাও বলে গেছে, আপনার বাড়িতে চুরি করতে এসে যে ভুল করেছি, গঙ্গাস্নান করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে...

বটে! এ তো সাংঘাতিক অপমান।

অপমান বলে অপমান! নরেনবাবু তো সেই থেকে ভারি মনমরা হয়ে পড়েছেন। দু-দিন অন্নজল গ্রহণ করেননি। তবে কিনা বিশ্বকঞ্জুস নরেনবাবুর সেই থেকে হাত বেশ দরাজ হয়েছে। এখন দেখছি বাজার থেকে বড়ো মাছ, ময়রার দোকান থেকে সন্দেশ, এসব কিনছেন।

তাই নাকি! এইজন্যেই সব জিনিসেরই খারাপ আর ভালো দুটো দিক থাকে।

তা আপনার বাড়ি থেকে কী কী চুরি গেল?

সেসব এখনও হিসেব করা হয়নি।

কিন্তু গোপালবাবু, আপনার কবজিতে রোলেক্স হাতঘড়িটা এখনও দেখতে পাচ্ছি যে! ব্যাপারটা কী? চোর কি ওটা দামি ঘড়ি বলে বুঝতে পারেনি?

পারেনি মানে! ঘড়িটা একটানে খুলে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কত সালের কোন মডেল, কত দাম সব গড়গড় করে বলে গেল মশাই।

তাজ্জব কথা! তবু নেয়নি?

না। ঘড়িটা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'এ ঘড়ির এখন অনেক দাম। সাবধানে রাখবেন।'

বলেন কী? কলিযুগ কি শেষ হয়ে গেল নাকি মশাই? তারপর ধরুন, আপনার স্ত্রীর গলায় একটা পনেরো ভরির সীতাহারের কথাও শুনেছি। সবাই বলে খুব দামি হার নাকি। তা সেটা নিশ্চয়ই গেছে।

উঁহু। সীতাহারটা তো ছুঁলই না। দূর থেকেই বলে দিল চোদ্দো ভরি আট রতি মাপ আছে। এখনকার বাজারদর নাকি দেড় লাখ টাকার ওপরে।

সেটাও নেয়নি! এ আবার কেমনধারা চোর? আপনার লোহার আলমারিটা খোলেনি?

খুলেছে বই কী। চোর বলে কথা! খুলল, দেখল।

এই আলমারিতেই তো বোধহয়—

ঠিকই ধরেছেন। আমার সব ক্যাশ টাকা ওই আলমারিতেই থাকে। আজ লেবার পেমেন্টের জন্য আড়াই লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ওই আলমারিতেই রেখেছিলাম। টাকাগুলো বের করে গুনে-টুনে দেখলও।

তারপর থলিতে ভরল তো!

হ্যাঁ, থলিও তার সঙ্গে একটা ছিল বটে। রাকস্যাকের মতো একটা ব্যাগ। ভরার উপক্রমও একবার করেছিল। তারপর নিজের মনে 'না থাক' বলে যেমন ছিল তেমনি আবার আলমারিতে সাজিয়ে রেখে দিল।

আড়াই লাখ টাকা। চোর আড়াই লাখ টাকা হাতে পেয়েও নিল না মশাই! এঃ, আমারই তো হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আপনার সেই দুবাই না তেহরান থেকে আনা হিরের কালেকশনটা? লোকে তো বলে পূর্ব ভারতে আপনার মতো হিরের কালেকশন কারও কাছে নেই।

ঠিকই বলে। আমি বহুকাল ধরেই হিরে কালেকশন করে আসছি, ওটাই আমার নেশা। রেয়ার সব হিরে মশাই। লাখ লাখ টাকা দাম।

তা সেসব কি ছাড়তে পারে?

ছাড়েওনি। আমাকে দিয়ে জোর করে সিন্দুক খুলিয়ে সব আঁতিপাঁতি করে দেখেছে। দেড়শো হিরে ছাড়াও নানা সাইজের মুক্তো, নীলা, পোখরাজ, চুনি, গোমেদ মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকার পাথর।

আহা, শুনেই আমার পিলে চমকাচ্ছে। তা গেল তো সেগুলো! যাবেই। অত দামি জিনিস কি বাড়িতে রাখতে আছে মশাই? ব্যাঙ্কের ভল্টে বা মাটির নীচে পুঁতে-টুঁতে রাখতে হয়।

তা বটে। সেরকম একটা ফন্দি মনে মনে ঠিকও করে রেখেছি। কিন্তু সেটা কার্যকর করার আগেই কাল মধ্যরাতে চোরের আবির্ভাব।

জানালা ভেঙে ঢুকল বুঝি?

না, অতি ঘোড়েল চোর। ভাঙচুর করলে তো শব্দ শুনতে পেতাম। আমার আবার ভারি সজাগ ঘুম। বাড়ির দেউড়িতে দারোয়ান আছে, দু-দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর, টোটাভরতি বন্দুক আছে, বালিশের তলায় পিস্তল নিয়ে শুই। সুতরাং মোটামুটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্রই বলা যায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার বাড়িটা তো দুর্গ-বিশেষ। কুকুর দুটোও খুবই তেজি। দারোয়ান দুটোও বেশ তাগড়াই চেহারার বটে। তাহলে চোরটা ঢুকল কীভাবে বলুন তো।

সেটাই রহস্য। আমি চোরটাকে জিজ্ঞেসও করেছিলুম, 'বাপু হে, এ বাড়িতে ঢোকা অত সহজ নয়! তুমি ঢুকলে কী করে?'

জবাবে কী বলল?

বলল, 'দুনিয়ায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। সব জায়গাতেই ঢোকা সম্ভব। আমি আপনার বাড়ির সামনের তেঁতুল গাছ থেকে হুক সমেত একটা নাইলন দড়ি ছুড়ে ছাদের রেলিংয়ে আটকে দিয়ে সেইটা বেয়ে ছাদে এসে নামি।'

এ তো দেখছি টারজান!

তা বলতে পারেন। দিব্যি কসরত করা চেহারা। ভদ্রঘরের ছেলের মতোই মনে হয়।

দিনকাল যা পড়েছে, ভদ্রঘরের বেকার ছেলেদেরও এইসব পথেই নামতে হচ্ছে। তা তারপর কী হল?

চোরেরা নিঃশব্দে চুরি করে, সেটাই রেওয়াজ। কিন্তু এর কায়দা আলাদা। খুব মোলায়েম গলায় আমার নাম ধরে ডেকে ঘুম ভাঙাল।

নাম ধরে? ছিঃ ছিঃ, আপনি বয়স্ক মানুষ।

না, সে আমাকে গোপালকাকা বলে ডেকেছিল।

বাঁচোয়া। তারপর বলুন।

আমি পিস্তল খুঁজতে গিয়ে দেখি, সেটা যথাস্থানে নেই। চোরটা বলল, 'অস্ত্রশস্ত্র আমি সরিয়ে নিয়েছি। আলমারি সিন্দুক সব খুলুন। সময় নেই।'

ওরে বাবা! এ তো চোরের বেশে ডাকাত!

তাও বলতে পারেন। সব দেখল। টাকাপয়সা, হিরেজহরত, সোনাদানা, কিন্তু কোনোটাই তার যেন তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। হিরেজহরতগুলো একটু নাড়াচাড়া করল বটে, কিন্তু যেন তেমন গা করল না।

এ কেমন বেয়াদব চোর মশাই! এত কসরত করে ঢুকল, সব হাতের নাগালে পেল তাও তার গাল উঠল না কেন?

সেইটেই রহস্য। সব দেখেশুনে বলল, 'আপনার আর কোনো দামি জিনিস নেই?' আমি অবাক হয়ে বললুম, 'এর চেয়ে দামি জিনিস আর কী থাকবে?' চোরটা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এসব দামি জিনিস বটে, কিন্তু আমার দরকার লাগবে না।'

বটে! খুব নবাবপুত্তুর দেখছি। তারপর?

তারপর সে বলল, 'আপনার বইপত্র কোথায় থাকে।' আমি বললুম, 'নীচের লাইব্রেরি ঘরে।'

বইপত্র! ছোঃ! বইপত্র দিয়ে কী হবে?

সেইটে তো জানি না। তবে নিয়ে যেতে হল। দেখলাম বইপত্রে তার বেশ আগ্রহ আছে। বিস্তর বই বের করে করে দেখল, আবার যত্ন করে জায়গায় রেখে দিল। অনেকক্ষণ ধরে প্রতিটি আলমারি ঘাঁটল সে।

বই ঘেঁটে সময় নষ্ট করা কেন বাপু?

আমিও তাকে সে-কথাই বলেছিলুম। সে বলল, 'ও আপনি বুঝবেন না।'

তারপর?

বললে বিশ্বাস করবেন না, খুঁজে পেয়ে সে একখানা বই বের করল। বেশ পুরোনো বই। নাম নীলবসনা সুন্দরী। কার লেখা জানি না। বইপত্র পড়ার অভ্যাস আমার নেই। বাপ-দাদার আমল থেকেই ওগুলো পড়ে আছে।

নীলবসনা সুন্দরী! তা সেটা কী করল?

সেটাই চুরি করল মশাই। বলল, 'এটা চুরি করতেই আমার আসা।'

শুধু একটা বই?

হ্যাঁ, বইটা নিয়ে সে হাওয়া হয়ে গেল মশাই।

আশ্চর্য! এরকম আহাম্মক আর দেখিনি!

ওর হবে

কালীকিঙ্কর তার কালীমন্দিরের নাটমণ্ডপে বসে ভক্তদের চরণামৃত বিলি করছিল। পরনে রক্তাম্বর, মাথায় ঝুঁটি, কপালে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা। চেহারা এই বুড়ো বয়সেও ভয়ংকর। দেখলেই বোঝা যায় সে সোজা পাত্র নয়।

তা কালীকিঙ্কর সোজা পাত্র ছিলও না কোনোকালে। ডাকাতে কালীর নামে এলাকায় থরহরি কম্প হত। আবার তার বীরত্বের কথাও বলত মানুষ।

কিন্তু কালীর এখন আর সেই দিন নেই। এখন সারাদিনই প্রায় সে এই কালীমন্দিরে পড়ে থাকে।

হরিপদ একটু দূরে উবু হয়ে বসা। একসময়ে সে কালী ডাকাতের সাকরেদ ছিল। হরিপদ বলছিল, দীনু ডাকাত কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে কালীদা। খুব নাম হয়েছে ইদানীং। পরশুদিন মকরগঞ্জের কাছারি লুট করল। কী সাহস! চারটে দোনলা বন্দুক আর সড়কি-বল্লমধারী পাইকদের সামনে কাছারি লুট করা চাট্টিখানি কথা নয়।

কালী এক থুত্থুরে বুড়ির হাতে চরণামৃত দিয়ে বলল, হুঁ।

হরিপদ বুঝছিল এসব কথায় কালী খুশি হচ্ছে না। কিন্তু সে আজ একটু উত্তেজিত। বলল, আর কাজটাও করে গেল নিখুঁত। ভোর রাতে পাহারায় একটু ঢিলেমি আসেই। সেই সময়ে রণ-পায়ে করে মাঠ ভেঙে এসে একেবারে নিঃশব্দে সবকটা অস্ত্রধারীকে চোখের নিমেষে বেঁধে ফেলে কাজ হাসিল করে চলে গেল। খুনখারাপি রক্তপাত কিছুই করেনি। নয়ন দারোগা অবধি কাজ দেখে বলেছে, নাঃ এ তো দেখছি চ্যাম্পিয়ন ডাকাত। একটা সূত্রও ফেলে যায়নি। সাবাস!

কালী একটু দাঁত কিড়মিড় করে বলে, রাজপুরের দারোগা শিবু হালদার যে আমাকে মেডেল দিতে চেয়েছিল সেটা কি ভুলে গেছিস?

হরিপদ বলে, আরে না, সে কি ভোলা যায়? সেবারে তুমি নন্দকিশোর মহাজনের গদিতে ডাকাতি করেছিলে, দলে আমিও ছিলাম। নন্দকিশোরের বাড়ির কাছে সে রাতে যাত্রাগানের আয়োজন তুমিই করেছিলে। চারটে পাইককে সিদ্ধি খাওয়ানো হল সন্ধেবেলা। সব মনে আছে। যখন ডাকাতি হচ্ছে তখন স্টেজে রাবণ বধ হচ্ছে। হনুমান আর রাক্ষসদের চ্যাঁচামেচির চোটে নন্দকিশোরের বাড়ির লোকদের চ্যাঁচামেচি কেউ শুনতেই পায়নি।

তবে?

না, তুমিও তোমার আমলে ডাকাতের রাজা ছিলে বটে কিন্তু এই দীনুও কম যাচ্ছে না। গত মঙ্গলবার নাটুবাবুর বাড়িতে কী কাণ্ডটাই করলে বলো তো! ভোর রাতে কীর্তনের দল নিয়ে পাড়া টহল দিয়ে নাটুবাবুর বাড়ির সামনে এসে সে কী 'হরিবোল, রাধাবোল' কীর্তন! সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁসি ঘণ্টা। নাটুবাবু ধর্মভীরু মানুষ। বেরিয়ে কীর্তনের দলকে পয়সা দিতে যাচ্ছিলেন, তখন হুড়মুড় করে গোটা কীর্তনের দলটাই বাড়িতে ঢুকে সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেল। তা ধরো লাখ তিনেক টাকা তো হবেই, সঙ্গে আরও লাখখানেক টাকার গয়না।

কালী এক বুড়োকে চরণামৃত দিয়ে বলল, এ আর এমন কি? আমি তো গরানহাটার বিভূতিবাবুর বাড়িতে ঢুকেছিলাম তার জামাইয়ের গলা নকল করে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে। জামাইয়ের নৌকো আমরা আখেরগঞ্জের ঘাটে আটকে রেখেছিলাম। তুমি গিয়ে জামাইয়ের গলা নকল করে ডাকতেই—

তবেই বোঝ দীনু আর এমন কী করেছে।

সে কথা সত্যি, তোমার এলেম তো দুনিয়াসুদ্ধু লোকে জানে। তবে ধরো এই গত অমাবস্যায় কুঞ্জপুকুরের চণ্ডীমণ্ডপে ভর সন্ধেবেলা একদল বিধবা বসে গোবিন্দ গোঁসাইয়ের কথকতা শুনছিল আর ভক্তিতে চোখের জল ফেলছিল। তারাই যে কথকথার আসর থেকে ফুলুবাবুর ঠাকুমার পিছু পিছু তার বাড়িতে গিয়ে সেঁধোবে আর সেঁধিয়েই নিজের মূর্তি ধরবে তা কি কেউ ভেবেছিল? শুনলুম তারাই নাকি ফুলুবাবুর ঠাকুমার কাছ থেকে কথায় কথায় ফুলুবাবুর বউয়ের কয় ভরি গয়না আছে তা জেনে নেয়। আর বুদ্ধিরও বলিহারি। অতগুলো বিধবা দেখে বাড়ির লোক এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় যে ডাকাতিটা ভালো করে বুঝেই উঠতে পারেনি।

ফুঃ, ও কি একটা মরদের মতো কাজ হল? আমিও তো দীনবন্ধুর বাড়িতে দলবল নিয়ে তার মেয়ের বিয়ের দিন বরযাত্রী সেজে ঢুকেছিলুম। সে কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তবে যাই বলো দাদা দীনুও কিন্তু কম যাচ্ছে না।

ওরে অত ঘাবড়াস কেন? কালী ডাকাত বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু তাকে ছাড়ানো মুখের কথা নয়। আগে দশ-বিশ লাখ টাকা কামাক, আমার মতো একটা কালীমন্দির বানাক, তবে বুঝব। যে ডাকাতের কালীমন্দিরই নেই সে আবার কিসের ডাকাত?

তা সত্যি কথা, তবে শুনেছি, দীনু নাকি কালীর তেমন ভক্ত নয়। সে খুব শিবের ভক্ত।

বলিস কী? ডাকাত হয়ে সে কালীসাধনা করে না?

কিন্তু দাদা, শিবও তো দেখছি কম যাচ্ছে না।

দূর দূর! ওর তাহলে কিছু হবে না। যে ডাকাত কালীসাধনা করে না সে উচ্ছন্নে যায়।

তা কথাটা তুমি বোধহয় মন্দ বলোনি। কানাঘুষো শুনতে পাই, দীনু নাকি কখনো খুনখারাপি পছন্দ করে না। তার নামে ডাকাতির অনেকগুলো নালিশ আছে বটে, কিন্তু একটাও খুনের মামলা নেই।

ছ্যাঃ ছ্যাঃ! বলিস কী! খুনখারাপি না করলে আবার ডাকাত কিসের রে? এর তো তবে ডাকাতির দুধের 'দাঁত' ওঠেনি!

উঁহু, কথাটা মানতে পারছি না। খুনখারাপি করার তাকত তার খুবই আছে। কিন্তু সে বলে, ওসব হল অধর্মের কাজ। রক্তপাত না ঘটিয়ে ডাকাতি করাটাই নাকি সত্যিকারের মরদের মতো কাজ।

দ্যাখ হরিপদ, দীনু কিন্তু তোর মাথাটা খেয়েছে। বয়স তো তোর মেরে কেটে ষাট-বাষট্টি, আমার চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোটো। এই বয়সে কি আর সব বোঝা যায়?

বলো কী কালীদা? ষাট-বাষট্টি কি কম বয়স হল? পাকা চুলে ভরা মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বোঝার আর বাকি কী আছে?

অনেক আছে। দীনুর নামে কেউ নানা গল্প রটাচ্ছে। ওসব বিশ্বাস করিসনি। এখনও কালী ডাকাতের নাম শুনলে লোকে সেলাম ঠোকে।

তা তো বটেই। দেশের তুমি একজন গণ্যমান্য লোক।

তবে? দীনু তো সবে হামা দিচ্ছে। আগে দাঁড়াক, তবে দেখা যাবে।

সেটা অবশ্য ন্যায্যই বলেছ। তোমার নামে এখনো লোকে ছড়া কাটে, গান বাঁধে, তোমার গল্প বলে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ায়।

তবেই বোঝ দীনু কোথায় পড়ে আছে।

তা বলতেই হবে, তোমার কাছে দীনু কিছু নয়। তোমার কালীমন্দিরেও দিন দিন ভিড় বেড়েই চলেছে দেখছি। আজ তো লম্বা লাইন পড়ে গেছে দাদা।

বাস্তবিক আজ কালীমন্দিরে লোকে একেবারে লোকারণ্য। চরণামৃত দিতে দিতে কালীর হাত ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। যত ভিড় বাড়ে, ততই কালীর আনন্দ। হ্যাঁ, তার জাগ্রত কালীর মহিমা চারদিকে খুব ছড়িয়ে পড়েছে বটে।

বুড়ো-বুড়ি, পুরুষ-মেয়ে, বাচ্চা-কাচ্চা, বাঙালি-হিন্দুস্থানিতে মিলে একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা।

কালী চরণামৃত দিতে দিতে বলে, দ্যাখ রে হরিপদ, ভালো করে চেয়ে দ্যাখ। পারবে দীনু এরকম মায়ের মহিমা প্রচার করতে?

ভিড়টা বড্ড চাপাচাপি হচ্ছে এখন। উঠোনে যেন তিল ধারণের জায়গা নেই। হরিপদ ভিড়ের আড়ালে পড়ে গেছে। খুব ক্ষীণ গলা পাওয়া গেল হরিপদর, সবই মানছি দাদা, তবে ভিড়টা যে বড্ড চেপে এসেছে। এত ভিড় কি ভালো?

কালী একটা হুঙ্কার ছেড়ে বলে, ভালো নয়, মানে? এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? দেখছিস না ভক্তের পায়ের ধুলোয় একেবারে তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠছে জায়গাটা!

বুড়ো পুরুতমশাই রোগাভোগা মানুষ। এতক্ষণ মন্দিরের বারান্দায় চুপচাপ বসেছিলেন। তা ভিড় সেখানেও ঠেলে ওঠায় তিনি আসন গুটিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে জবা গাছটার তলায় দাঁড়ালেন। নাঃ আজ ভিড়টা যেন বড্ড বেশি। অথচ আজ কোনো বিশেষ তিথি-নক্ষত্রের যোগ নেই, কোনো বিশেষ ছুটির দিনও নয়। ভিড়ে ভিড়ে মন্দির-চত্বর, মন্দির, কালীমূর্তি সবই যেন চাপা পড়ে গেল।

কালীর চারদিকে এত লোক আর এত হাত এগিয়ে আসছে যে কালী হিমসিম খাচ্ছে। 'এই যে আমাকে', 'এই যে এধারে' বলে ভীষণ চিল্লামিল্লি হচ্ছে। দু-একটা হাতের আঙুলের খোঁচাও এসে লাগছে কালীর পেটে বা কোমরে, তার ভীষণ কাতুকুতু লাগে।

ওরে বাপু, একটু সরে লাইন দাও না তোমরা? অমন গায়ে এসে পড়ছ কেন? ভয় নেই, সবাই পাবে। চরণামৃত না দিয়ে আমি যাচ্ছি না।

একজন বলল, সেই কখন থেকে লাইন দিয়েছি মশাই। একটু চরণামৃত পেতে এক ঘন্টার ওপর লাগছে!

আর একজন বলল, ওঃ আমি তো দেড় ঘন্টা দাঁড়িয়ে—কালীর ঝুঁটি খুলে পড়েছে, রক্তাম্বর সরে গেছে গা থেকে। সাংঘাতিক অবস্থা।

তারপর হঠাৎ যেমন ভিড়টা জমে উঠেছিল তেমনই আবার হঠাৎ করে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। তারপর সব ভোঁ ভাঁ, সুনসান।

প্রথম দেখেন পুরুতমশাই, ও কালীবাবু, সর্বনাশ! মায়ের গায়ের সব সোনার গয়না যে গায়েব! মাথার হিরে বসানো টিকলিটাও যে নেই!

অ্যাঁ!

কালী হাঁ। মা কালীর গায়ের অন্তত বিশ ভরি সোনা, হিরে-মুক্তো, স্ফটিকের মালা, রুপোর মালা, বাটি-গেলাস, সোনার ঘন্টা সব গায়েব।

হরিপদ একগাল হাসল, বললুম কিনা কালীদা, দীনু অনেক ওপরে যাবে। তোমাকেই না টেক্কা দিয়ে দ্যায়।

কালী কিছুক্ষণ ব্যোম হয়ে থেকে বলল, ওর হবে।

বড় চোর ছোট চোর

হরেকেষ্ট বোষ্টমের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকতে যাবে এমন সময় শীতল সাধুখাঁর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি। নবু দাস কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'শীতলদাদা যে!'

শীতল একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'দিনকাল কী পড়ল রে নবু, মগজ পাকল না, হাত মক্‌শো হল না, গুরুবরণ হয়নি, দুধের ছোকরারা সব লাইনে নেমে পড়ল! ছি ছি! বিদ্যেটার উপর ঘেন্না ধরে গেল রে!'

শীতল দাস মান্যগণ্য লোক। লাইনে তার খুব নামডাক। বয়সেও বড়। তবু কথাগুলো শুনে নবুর ভারী আঁতে লাগল। বলল, 'দ্যাখো শীতলদাদা, আমাদেরও ঘর-সংসার আছে, আমাদেরও পেট চালাতে হয়। একজন লুটেপুটে খাবে, আর আমরা আঙুল চুষব, এ তো নিয়ম নয়। আর মগজ পাকার কথা বলছ? মগজ কি আর ঘরে বসে থাকলে পাকবে? কাজে নামলেই মগজ খোলে। আর হাত পাকানোর কথা যদি বলো, তা হলে আমিও বলি, গেল হপ্তায় কি আমি বিদ্যেধর মণ্ডলের লোহার সিন্দুক ভাঙিনি?'

শীতল কঠিন হাসি হেসে বলল, 'তা ভেঙেছিস! তবে পেয়েছিলি তো লবডঙ্কা! সিন্দুকের জিনিস সেদিনই বিদ্যেধর সব সরিয়ে ফেলেছিল। তোর বরাতে জুটেছিল এক বান্ডিল দস্তাবেজ, এক পুঁটুলি তামার পয়সা আর পঁচিশটি টাকা।'

নবু বলল, 'সেটা বড় কথা নয় শীতলদা। সিন্দুক যে ভেঙেছিলাম, সেটা তো স্বীকার করবে?'

এইভাবে দুজনের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে গেল। তবে কোনও চেঁচামেচি নেই, ঝগড়া হচ্ছিল ফিসফিস করে, যাতে গেরস্তর ঘুম না ভেঙে যায়। ফিসফিস করে ঝগড়া করা সোজা কথা নয়। এলেম লাগে।

শীতল বলল, 'দ্যাখ নবু, বড়দের মুখে-মুখে যে কথা বলতে নেই, এই শিক্ষেটাও তোর হয়নি দেখছি। চোর-ডাকাত যা-ই হোস, মানীর মানটা তো দিবি। যাকগে, এখন তুই কেটে পড়। সামনের ফাল্গুনে আমার ছোট মেয়ের বিয়ে। পাত্রপক্ষ ছ'হাজার টাকা পণ চেয়েছে। তার উপর সোনাদানা। বিয়ের খরচখরচা তো বড় কম নেই! তুই বরং শিবু হালুইয়ের বাড়িতে গিয়ে কাজ সেরে আয়। সকালে গোরু কিনতে প্রতাপপুরের গোহাটায় যাবে বলে শিবু সাত হাজার টাকা জোগাড় করে রেখেছে। খাটের নীচে মেটে হাঁড়িতে আছে। যা। গিয়ে হাসিল করে আয়।'

প্রেস্টিজে লাগলেও নবু আর কথা বাড়ায়নি। শীতলদাকে চটিয়ে লাভ নেই। বুড়ো চোরদের একটা জোট আছে। সে নতুন লাইনে নেমেছে, ট্যান্ডাইম্যান্ডাই করলে, বিপদ হতে কতক্ষণ? বুড়ো চোরদের সে পছন্দ করে না বটে, কিন্তু এটা মানে যে, শীতল সাধুখাঁ, বিরিঞ্চি মণ্ডল, বিরু গায়েন, হরিপদ কীর্তনীয়ার মতো ওস্তাদদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। ওদের দোষ একটাই। নবুকে তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না।

একটু দাঁড়িয়ে শীতল সাধুখাঁর হাতের কাজ আর কৌশলটা দেখার ইচ্ছে ছিল নবুর। কিন্তু দেরি হয়ে যাবে বলে আর দাঁড়ায়নি।

মুশকিলটা হল শিবু হালুইয়ের বাড়িতে ঢুকতে যেতেই শিবুর মেজোখুড়ো যে একটু মাথাপাগলা লোক, এটা তার খেয়াল ছিল না। লোকটার দোষ হল, দাওয়ায় বসে সারারাত বকবক করে। লোকে বলে, পবনখুড়ো নাকি ভূতপ্রেতের সঙ্গে কথা কয়।

দাওয়ার দিকটায় সুবিধে নেই দেখে, নবু পিছন দিকটায় কচুবন পেরিয়ে গিয়ে জানলা ফাঁক করল বটে, কিন্তু কাজটা মোলায়েম হল না। দু'বার দুটো খটাং আর মচাং শব্দ করে ফেলল। শীতল সাধুখাঁ ভুল বলেনি। এখনও তার সত্যি হাত মক্‌শো হয়নি, গুরুমারা বিদ্যেও নেই। তবে পাকা মাথা হলে ভালো করে সুলুকসন্ধান আর আপৎকালের ফন্দিফিকির জেনে বুঝে আসত। বিপদটা হল, ওই শব্দে সামনের দাওয়ায় পবনখুড়োর বকবকানি বন্ধ হয়ে গেল। আর ঘরের ভিতর থেকে শিবু হালুই ঘুমজড়ানো গলায় একটা হাঁক মারল, 'বলি ও মেজোখুড়ো, কথা কইছ না যে বড়! তোমার কথা বন্ধ হলে যে আমার ঘুমের অসুবিধে হয়।'

পবনখুড়ো বলল, 'এই একটু জল খেলুম বাপ। কথা তো সেলাই করতে হয় কিনা, তাই গলাটা শুকিয়ে যায়। টেনে ঘুম দে বাপু। কথা আর থামাচ্ছি না।'

পবনখুড়ো ফের বকবক শুরু করল। শিবু হালুইয়েরও নাক ডাকতে লাগল। নবু ডিং মেরে জানলা গলিয়ে ঘরের ভিতর সেঁধিয়ে গেল। কিন্তু খাটের নীচে নজর করে বড্ড দমে গেল সে। মেটে হাঁড়ির যেন হাট বসে গিয়েছে। গিজগিজ করছে মেটে হাঁড়ি। এর কোনটায় হালুইয়ের পোর সাত হাজার টাকা আছে, তা কে জানে? প্রথম হাঁড়ির মুখ থেকে মালসা সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেখল, গলা অবধি ধান। পরেরটায় চিটেগুড়। তার পরেরটায় তিসির তেল। কিন্তু হাল ছাড়লে তো হবে না! পরের হাঁড়িটা হাতড়ে দেখে নবু বুঝল, জায়গাটা ফাঁকা। কিন্তু হাঁড়ি রাখার বিড়েটা পড়ে আছে। অর্থাৎ চার নম্বর হাঁড়িটা যথাস্থানে নেই। তা হলে কি হাঁড়ি নিয়ে কেউ হাওয়া হয়েছে? গুটিদশেক হাঁড়ি তল্লাশের পর হাল ছাড়তে হল। কারণ, পবনখুড়োর বকবকানি থেমেছে এবং শিবু হালুইয়ের ঘুমও ভেঙেছে। সে হাঁক দিল, 'এ খুড়ো! ফের চুপ মেরে গেলে কেন?'

'চুপ কি আর সাধে মারি বাপ? তোর ঘরে যে ইঁদুর ঢুকেছে। বেজায় কুটুর-কুটুর শব্দ শুনছি। বলি, টাকাগুলো যদি কেটে রেখে যায়, তাহলে কাল সকালে কী দিয়ে গোরু কিনবি বাপু?'

'তাই তো?' বলে শিবু ধড়মড় করে উঠে পড়ল। নবু লহমায় জানলা গলে বাইরে লাফ মেরে পড়ল। পড়েই ছুটতে যাবে, এমন সময় জানলা গলে আর-একটা লোকও লাফিয়ে নেমে এসে ক্যাঁক করে তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আহাম্মক কোথাকার! আর একটু হলেই যে কাজটা কাঁচিয়ে দিয়েছিলি রে হারামজাদা!'

লোকটাকে চিনতে পেরে নবু নিশ্চিন্তির শ্বাস ছাড়ল। শত্রুপক্ষের লোক নয়। এ হল নিবারণ সরকার। তা নিবারণদাদারও হাতযশ আছে। নিবারণদাদার বউ রিকশা করে বাজারে যায়। তার খোকাখুকিরা প্রাইভেট মাস্টারের কাছে পড়ে। বাড়িতে টিউবওয়েল আছে। দোহাত্তা কামায়।

নবু হাত কচলে দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'পাকা খবর পেয়েই ঢুকেছিলাম। তবে ফসকে গেল।'

নিবারণ অবাক হয়ে বলল, 'কীসের পাকা খবর রে? সেই গোরু কেনার সাত হাজার টাকা নাকি? সে তো আমি কখন গস্ত করে বসে আছি। সাত হাজার তো এখন আমার ট্যাকে। একটা হাঁড়িতে খানিক আমসত্ত্ব পেয়ে গেলাম বলে এই দেরি। ও জিনিস তো আর হালুমহুলুম করে খাওয়া যায় না! চিবিয়ে রসস্থ করে খেতে হয়। তা তোর জ্বালায় কি আর শান্তিতে বসে খেতে পারলুম!'

নবু লজ্জায় নতমুখ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

নিবারণ বলল, 'ওরে, মন খারাপ করিস না। রাত কাবার হতে এখনও মেলা দেরি। নন্দরামের ছেলের বিয়ে গিয়েছে পরশুদিন। শুনেছি পণের টাকা নন্দরামের বালিশের তলায় আছে, তা কম হবে না, হাজার দশেক তো বটেই। বেশিও হতে পারে। দ্যাখ চেষ্টা করে।'

নবু প্রমাদ গুনল। একসময় নবু নন্দরামের বাড়িতে মুনিশ খাটত। হাড়ভাঙা মেহনত করে মাসকাবারে তিরিশটি টাকা মাত্র জুটত। তার উপর নন্দরাম ভারী রাগী মানুষ, রেগে গেলে হাতের কাছে যা পাবে তাই ছুড়ে মারবে। গরু হারিয়ে যাওয়ায় নবুর উপর রেগে গিয়ে তার দিকেও ছুড়ে মেরেছিল বটে, তবে তখন নন্দরামের জলখাবারের সময় বলে হাতে ছিল একটা লুচিতে জড়ানো রসগোল্লা। তাই বরাতজোরে নবু বেঁচে যায়। আর সেই প্রথম রসগোল্লা দিয়ে লুচি খেতে কেমন লাগে তা টের পেয়েছিল। স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। সুবিধে শুধু এইটুকু যে, নন্দরামের অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা তাকে খুব চেনে। আর বাড়ির সুলুকসন্ধানও নবুর জানা।

দেওয়াল টপকে বাগানে ঢোকা জলের মতো সহজেই হয়ে গেল। কুকুরটা তেড়ে আসতেই নবু 'আমি রে, আমি' বলে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সেটা লেজ নেড়ে হাত-পা চেটে দিতে লাগল। সাফাইয়ের লোক ঢোকার ছোট দরজাটার ছিটকিনি বরাবরই নড়বড়ে ছিল। বাইরে থেকে সেটা খুলে ফেলতে কোনও মেহনতের দরকার হল না। গ্রিলের তালাটা মটকে দোতলায় উঠে যাওয়া অবধি গা মোটে ঘামলই না নবুর। তবে তার তো কপালটা বিশেষ ভালো নয়, শেষ রক্ষে হলে হয়!

মুখখানা গামছায় ভালো করে জড়িয়ে নিল নবু। তারপর নন্দরামের শোওয়ার ঘরের দরজাটায় হাত লাগাল। পাকা হাত হলে কোনও সমস্যাই নয়। কিন্তু মুশকিল হল, নবুর হাত এখনও নিতান্তই কাঁচা। শিক ঢুকিয়ে ভিতরের ছিটকিনি খুলবার কসরত করার সময় একটা ঢপ এবং একটা ঠং শব্দ সে সামাল দিতে পারল না। আর কপালের এমনই ফের যে, দরজার পাল্লাটা খুলতে যেতেই কব্জায় এমন বিকট ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হল যে, তাতে পাথরেরও ঘুম ভেঙে যায়।

আর হলও তাই। কাঁচা ঘুম ভেঙে নন্দুবাবু উঠে বসলেন। গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'কে রে? কার এত সাহস? কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে, এই অসময়ে আমাকে বিরক্ত করিস?'

নবু বুঝল, এই মওকাটাও গেল। শীতলদাদা যা বলেছিল তা হাড়েহাড়ে সত্যি। সে এখনও দুধের শিশু। বারবার তিনবার কাজ ফস্‌কে যাওয়ায় মাথাটাও যেন কেমনধারা হয়ে গেল নবুর। সে হঠাৎ বলে বসল, 'কাজের সময় অত চ্যাঁচামেচি করবেন না তো মশাই। ওতে ভারী অসুবিধে হয়।'

একথা শুনে নন্দরাম এমন হতবাক হয়ে গেল যে, প্রথমটায় মুখে বাক্য সরল না। তারপরই হঠাৎ 'তবে রে' বলে একটা হুঙ্কার ছেড়ে উঠে হাতের কাছে যা ছিল তাই তুলে ছুড়ে মারল নবুর দিকে। বরাবরই নন্দরামের হাতের টিপ খুবই ভালো। লুচিতে জড়ানো রসগোল্লাটাও নবুর কপালে এসে লেগিছিল, এটাও লাগল। নবু দু-হাতে কপাল চেপে ধরে 'আঁক' শব্দ করে বসে পড়ল বটে, কিন্তু বসে পড়েই বুঝতে পারল, তার হাতের কোষে এক বান্ডিল নোট।

ধুতির কষি আঁটতে আঁটতে নন্দরাম খাট থেকে নামবার আগেই অবশ্য নবু একলাফে চৌকাঠ ডিঙিয়ে দুদ্দাড় সিঁড়ি ভেঙে, বাগান পেরিয়ে, দেওয়াল ডিঙিয়ে হাওয়া।

পরদিন কালুচরণের দোকানে ঢুকেই নবু টের পেল, বুড়ো চোরেরা তাকে আড়ে-আড়ে দেখছে। তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাবটা আর যেন নেই বলেই মনে হচ্ছে। শীতল সাধুখাঁর চোখে একটু শ্রদ্ধার ভাবও যেন দেখতে পাচ্ছিল নবু। তা সে যাই হোক, নবু বেশ বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করেই বসে রইল।

হারজিৎ

আরে, জয়রামবাবু যে। তা এই সাত সকালে হন্তদন্ত হয়ে চললেন কোথায়? আবার কি গরু হারিয়েছেন? এই তো গত বুধবার আপনার গরু হারিয়েছিল, আজও কি আবার গো-হারা হলেন?

দেখুন সর্বেশ্বরবাবু, এটা আপনার খুব অন্যায়। আমার কি শুধু গরুই হারায়? আর কিছু কি হারনোর নেই আমার? এই তো গত বুধবার আমার ছাগল রাইকিশোরী হারিয়ে গিয়েছিল, গত হপ্তায় আমার তোতাপাখি তটিনি উধাও হয়েছিল, গত চোত মাসে আমার মেজো ছেলে হারু হারা-উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গিয়েছিল, বোশেখে আমার ছোট মেয়ে তিন বছরের বুঁচি নিরুদ্দেশ হয়েছিল, তারপর ধরুন দিন পনেরো আগে আমার শালা গদাই গায়েব হয়ে গেল। তারপর ধরুন কোদাল-কুড়ুল-নস্যির ডিবে-চশমা বাঁধানো-দাঁত হারানোর জিনিসের কি অভাব আছে?

তা বটে, হারানোর ব্যাপারে এ তল্লাটে আপনার ধারেকাছে কেউ আসতে পারে না। চণ্ডীমণ্ডপে রোজ সন্ধেবেলা আপনাকে নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে, সবাই বলে, হ্যাঁ, জয়রামবাবু হচ্ছেন হারাধনদের মধ্যে সেরা।

হারাধন! আমাকে কি আপনারা হারাধন বলে ডাকেন নাকি?

তবে? হারাধন বললে তো আপনাকেই বলতে হয় জয়রামবাবু! হারাকিরি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখন প্রশ্ন হল, আপনার হারানোর মতো আর কিছু আছে কি?

নেই মানে? দুনিয়ায় কি হারানোর জিনিসের অভাব? আপনি এমনভাবে কথা কইছেন যে, মনে হয় আপনার কস্মিনকালে কিছু হারায় না।

না না, তা বলিনি। আমারও কি আর হারায় না? খুব হারায় মশাই, খুব হারায়। গত বছর আমার জমির দলিল হারিয়েছিল, তার দু-বছর আগে আমার এক মেসোমশাই হারিয়ে গিয়েছিলেন, এই তো মাস ছয়েক আগে আমার পোষা নেড়ি কুকুরটা কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে গিয়েছিল। তবে কিনা, কার সঙ্গে কার তুলনা, আপনার কাছে হারানোর ব্যাপারে আমরা কি দাঁড়াতে পারি? বলতে কী ওই একটা ব্যাপারে আপনার কাছে আমরা গো-হারা হয়ে চলে আসি। আপনার কাছে ও ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে মশাই।

তবেই বুঝুন! হারানোর মতো কত জিনিসই আছে গুণে শেষ করতে পারবেন?

তা মশাই জয়রামবাবু, আজ আপনার কী হারাল? এমন হারা-উদ্দেশ্যে সকালবেলাতেই বেরিয়ে পড়েছেন যে!

শুনবেন? শুনলে হয়তো আপনার হাসি পাবে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা হাসির নয় মোটেই। হারিয়েছে এক কেজি চিনির একটা ঠোঙা।

বলেন কী! চিনির যা দাম হয়েছে আজকাল! এক কেজি চিনি তো সোজা কথা নয়! এক তোলা সোনাই মনে করুন।

যে আজ্ঞে। সোনা আর চিনি ক্রমশই কাছাকাছি চলে আসছে। তা গতকাল হরিহর হোড়ের মুদির দোকান থেকে এক কেজি চিনি কিনেছিলাম।

বুকের পাটা আছে বটে আপনার। আমি তো একশো গ্রাম, দুশো গ্রামের বেশি চিনি কিনবার সাহসই পাই না। তাও কেনা হয় কালেভদ্রে। তারপর চিনিটা হারাল কী করে?

সেটাই তো বড় দুঃখের কাহিনি মশাই। নবগোপাল নস্করকে চেনেন কি?

নবু নস্কর তো! খুব চিনি। একাবোকা লোক।

তা হরিহরের দোকানে সেই নবুর সঙ্গে দেখা। তা নবু বলল, আগের রাতে নাকি তার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। আমি সবে চিনিটা কিনে দাম দিয়েছি। হরিহর চিনি মেপে ঠোঙায় ভরে বেঁধেছেঁদে কাউন্টারে রেখে দিয়েছে। চিনিটা ব্যাগে ভরব বলে হাতও বাড়িয়েছি, ঠিক এই সময়ে নবু খুব উত্তেজিত হয়ে হাজির হয়ে বলল, মশাই কাল রাতে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।

বটে! চোরদেরও আজকাল নজর বড্ড নীচু হয়ে গেছে! নইলে এত বাড়ি থাকতে কেউ নবু নস্করের বাড়িতে চুরি করতে ঢোকে। সে তো হাড় কিপটে, তার সব টাকা-পয়সা ব্যাংকে গচ্ছিত। আড়াই টাকার বেশি নগদ তার কাছে কস্মিনকালেও থাকে না।

আহা, সেই জন্যই তো আমি ভারি অবাক হয়ে শুনছিলাম। তা বলল, রাত তিনটের সময় নাকি ঘরে খুটখাট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙেই সে বুঝল যে, ঘরে চোর। নবু খুব দুশ্চিন্তায় পড়ল। চোরের আবার অস্তর থাকে। কারও কারও গায়ে জোরও থাকে, অনেক চোর আবার গুন্ডাও হয়। তাই নবু কিছুক্ষণ কী করা উচিত ভাবল। তারপর শুনতে পেল, দুজন লোক ফিসফিস করে ঝগড়া করছে।

ফিসফিস করে ঝগড়া! সে আবার কীরকম মশাই?

সেটাই তো কথা। কিন্তু নবু স্পষ্ট শুনেছে, দুজন লোক তার ঘরের মধ্যে ঢুকে ফিসফিস করে ঝগড়া করছে। প্রথমটায় ভয়ে সে কথা কয়নি, সাড়াও দেয়নি। কিন্তু ঝগড়াটা অনেকক্ষণ ধরে চলছিল দেখে সে আর থাকতে না পেরে গলাখাঁকারি দিয়ে ফেলে। তখন হঠাৎ ঘরের আলো জ্বেলে দুটো জোয়ান মদ্দা চোর তার সামনে এসে দাঁড়ায়। দুজনেই একখানা কাঁসার থালার দু'দিক চেপে ধরে আছে। তারা বলল, এই যে নববাবু, আপনিই মীমাংসা করে দিন দেখি থালাটা ন্যায্য কার পাওনা। আমি হলুম গে কালু, আর ও হল ভুলু। দুজনেই থালাটা চুরি করব বলে সাপটে ধরেছি, কিন্তু মীমাংসা হচ্ছে না।

বটে! তারপর কী হল?

ওঃ, সে কাণ্ড বটে। নবু দু-তরফের বক্তব্য শুনল। শুনতে শুনতে ভোর হয়ে গেল। কিন্তু মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। তখন নবু বলল, ওহে আমাকে প্রাতঃকৃত্য করতে যেতে হবে। তোমরা লটারি করে ঠিক করো থালাটা কার। এই নাও একটা টাকা। টস করে দেখ।

এ তো সাংঘাতিক কথা! চোরের আস্পর্ধা তো আকাশে উঠেছে।

আমিও তো তাই বলি। সেই রোমহর্ষক গল্প শুনতে শুনতে কখন যে চিনির পোঁটলাটা ফেলে চলে এসেছি!

তা থালাটা কে পেল তা জানেন?

সেটাও জানা দরকার বলেই তো আজ সকালে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছি! প্রথমে চিনির পোঁটলা। তারপর লালু না ভুলু।

তাহলে বরং পা চালিয়ে আগু হয়ে পড়ুন জয়রামবাবু।

যে আজ্ঞে।

মোল্লারহাটের নেমন্তন্ন

ট্রেন থেকে নেমে মাইল দুই হেঁটেছেন আশুবাবু। আশ্বিনের শেষ, রোদ তেমন তেজালো নয়, আর মাথায় ছাতা ছিল বলে গরমে তেমন হাপশে পড়েননি ঠিকই, কিন্তু বিষ্টুপুরের বটতলা অবধি এসে মনে হল, নাঃ, একটু না জিরোলেই নয়। আরও মাইল দুই পথ বাকি আছে বলে আন্দাজ। সেই বাকি রাস্তাটায় তেমন জনবসতি নেই বলেই যেন হরেকেষ্ট বলেছিল।

এই হল বিষ্টুপুরের বিখ্যাত বটতলা। বেশ জমাটি জায়গা। দোকানপাট আছে। লোকজনের যাতায়াত আছে। আশুবাবু টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে বটতলার বাঁধানো জায়গায় বসে হাঁফ ছাড়লেন। দিব্যি বাতাস লাগছে ফুরফুর করে। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। লোকজন বিষয়কর্মে ব্যস্ত। দুটো লজঝড়ে বাস ধুলো উড়িয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

এ হল চৌপথী। এখান থেকে কোনো একটা রাস্তা মোল্লারহাট হয়ে মুনসিগঞ্জ পর্যন্ত গেছে। আগে নাকি বাস চলত। তবে গত বর্ষায় রাস্তা ভেঙে পোল ভেসে গিয়ে গাড়িঘোড়া বন্ধ, এখন শ্রীচরণ ভরসা।

পাশে বসা একটা লোক ঝিমোচ্ছিল। আশুবাবু তাকেই বেশ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'অ মশাই, বলি শুনছেন!'

'বলে ফেলুন।'

'এখান থেকে মোল্লারহাট কোন রাস্তাটা গেছে বলুন তো।'

লোকটা চোখ চেয়ে আশুবাবুকে বড়ো বড়ো চোখে একবার ভালো করে দেখল। তারপর বলল, 'কেন, মোল্লারহাটে কী দরকার?'

'আমি সেখানে যাব যে!'

লোকটা নির্বিকারভাবে বলে, 'মোল্লারহাট কেউ যায় না মশাই!'

'সে কী? সেখানে যে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি।'

'অ। তা আত্মীয়টি কে?'

'আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগনে।'

'জানেন তো যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা।'

আশুবাবু লোকটার ওপর ভারি চটে গিয়ে বললেন, 'বলতে না চাইলে বলবেন না। তা বলে ভাগনের নিন্দে করছেন কেন?'

লোকটা একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে বলে, 'মোল্লারহাটে কারও ভাগনে থাকে বলে কখনো শুনিনি মশাই।'

'কেন, মোল্লারহাটে ভাগনে থাকলে দোষটা কী?'

'গুণের কথাও নয় কিনা।'

'তার মানে?'

'যার ভাগনে মোল্লারহাট থাকে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

'কেন মশাই?'

'সত্যি কথা শুনতে চান?'

'কেন চাইব না?'

'শুনলে সহ্য করতে পারবেন তো?'

আশুবাবু ধুতির খুঁটে কপালের ঘাম মুছে দুর্বল গলায় বললেন, 'এমন কী কথা মশাই? আমার যে একটু ভয় ভয় করছে।'

'না শুনেই ভয় করছে? আসল কথা শুনলে তো দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাবেন। এখন ভালো করে ভেবে বলুন আসল কথা শুনতে চান কি না। নইলে ধুলোপায়েই বিদেয় নিয়ে যেখান থেকে এসেছেন সেখানেই ফিরে যান।'

আশুবাবু খুম দমে গেলেন। তিনি অতিশয় ভীতু মানুষ। খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, 'অনেক দূর থেকে এসেছি, ধকল বড়ো কম হয়নি। এসপার-ওসপার যাই হোক বলে ফেলুন।'

'শুনবেন তাহলে?'

'শুনব।'

'না, আপনাকে দেখলে নিতান্তই গোবেচারা মনে হয় বটে, কিন্তু আপনার বুকের পাটা আছে।'

আশুবাবু একথায় ভারি খুশি হয়ে একটু হাসলেন। বললেন, 'এই তো গত চোত মাসে হরিহরপুরের গাজনের মেলায় আমি একজন মুরগিচোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলাম।'

লোকটা অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বলল, 'ও বাবা, মুরগিচোর ধরা তো চাট্টিখানি কথা নয় মশাই; যে মুরগিচোর ধরতে পারে সে তো বাঘ-সিংহীও মারতে পারে। তা একাই ধরলেন নাকি?'

আশুবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'একরকম একাই বলতে পারেন। তবে আরও পাঁচজন একটু হাত লাগিয়েছিল আর কী।'

'তাতে আপনার গৌরব কিছুমাত্র কমেনি। শাস্ত্রেই তো বলেছে, দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ। তা আপনিই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বুঝি মুরগিচোরটার ওপর।'

আশুবাবু ভারি বিনয়ের সঙ্গে মাথা চুলকে বললেন, 'একরকম তাই। তবে ঝাঁপ দিতে একটু দেরি করে ফেলায়, ওই পাঁচজনই আগে ঝাঁপ দিয়ে ফেলে।'

'তাতে কী? ওতেও প্রমাণ হয় যে আপনি একজন নির্ভীক মানুষ। অকুতোভয়। নাঃ, আপনাকে দেখে আমার ভারি শ্রদ্ধা হচ্ছে। দেশে আজকাল ডাকাবুকো লোকের বড়োই অভাব।'

আশুবাবু বললেন, 'তা ইয়ে, মোল্লারহাটের কথা কী যেন বলছিলেন, এদিকে আবার বেলাও হয়ে যাচ্ছে কিনা।'

'বলব মশাই বলব। দু-দণ্ড একটু বসুন। আপনার মতো প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের সঙ্গ যতটা পারি করে নিই। এমন সুযোগ আর কি পাওয়া যাবে।'

একথা বলার পর লোকটার আবার একটু ঢুলুনির মতো এল। তারপর হাই তুলে বলল, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন!'

'আজ্ঞে, মোল্লারহাটের রাস্তাটা।'

'তাহলে মোল্লারহাটে আপনি যাবেনই? নাকি আরও একটু ভেবে দেখবেন।'

আশুবাবু দোনোমোনো করে বললেন, 'সেটা কি খুবই বিপদের জায়গা মশাই?'

লোকটা ফস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বিপদ বললে তো কিছুই বলা হল না, সে হল প্রাণঘাতী জায়গা। পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সেখানে গিয়ে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে কি না।'

'ও বাবাঃ, তাহলে লোকে সেখানে বসবাস করে কী করে?'

'কে বলল বসবাস করে? খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন সেখানে যারা বসবাস করে তারা কেউ মানুষ নয়।'

'অ্যাঁ, বলেন কী?'

'তাদের অ্যাই বড়ো বড়ো নখ, অ্যাই বড়ো বড়ো দাঁত, ভাঁটার মতো চোখ। তারা মানুষের রক্ত শুষে খায়।'

আশুবাবু কাহিল গলায় বললেন, 'এরকম কথা তো কই হরেকেষ্ট আমাকে বলেনি!'

'হরেকেষ্ট কে?'

'আমার ভাগনে।'

'মোল্লারহাটের একটা গাছকেও বিশ্বাস করবেন না মশাই। পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সবাই জানে, মোল্লারহাটের গাছ, গোরু, ছাগল সবাই মিথ্যে কথা বলে।'

'অ্যাঁ!' বলে খুবই ভাবিত হয়ে পড়লেন আশুবাবু। তাঁর যেন কেমন একটা শীত শীত করতে লাগল।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠ্যাঙাড়ে, ডাকাত, খুনে, গুন্ডা, বজ্জাত, ফেরেব্বাজ মোল্লারহাটে গিজগিজ করছে। দেখবেন সেখানে গাছে গাছে নরমুণ্ড ঝুলে আছে, পথে পথে পড়ে আছে করোটি আর হাড়গোড়। সেখানকার কামারশালায় দিনরাত তৈরি হচ্ছে, রাম দা, ছোরাছুরি, হেঁসো, মোল্লারহাটের মুদির দোকানে চাল-ডালের সঙ্গে বন্দুক, পিস্তল বিক্রি হয়। সেখানকার লোক বাইরের মানুষ দেখলেই পিছন থেকে মাথায় মুগুর বসিয়ে দেয়।'

আশুবাবুর গলা বসে গিয়েছিল। বার বার গলাখাঁকারি দিয়ে তবে স্বর বেরোল। খুবই ক্ষীণ স্বর। বললেন, 'অথচ সেখানে আজ আমার এক ভাগনির বিয়ে। হরেকেষ্ট নেমন্তন্ন করে গেছে। এখন করি কী বলুন তো। যাওয়ার জন্য বহু ঝোলাঝুলি করে গেছে যে?'

লোকটা উদাস গলায় বলল, 'তা যাবেন যান। কিন্তু বিয়েবাড়ি পৌঁছোতে পারবেন কি না দেখুন!'

শীত শীত ভাবটা উবে গিয়ে আশুবাবুর এখন ঘাম হতে লেগেছে। কপালটা ধুতির খুঁটে মুছে নিয়ে বললেন, 'আপনি দেখছি মোল্লারহাটের সব খবরই রাখেন।'

'তা আর রাখব না! ওই মোল্লারহাটেই তো আমার বউ আর ছেলে-মেয়ে কয়েদ হয়ে আছে কিনা।'

'কয়েদ? কে কয়েদ করে রেখেছে তাদের?'

'ছয় ফুট লম্বা, দৈত্যের মতো চেহারার একটা লোক। তার আশি ইঞ্চি বুকের ছাতি, মুগুরের মতো হাত, কথা কইলে মনে হয় বাজ ডাকছে।'

'এ তো ভারি অন্যায় কথা! তা থানা-পুলিশ করলেন না কেন?'

ফের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটা বলল, 'তার উপায় নেই যে।'

'কেন উপায় নেই কেন?'

'লোকটা যে আমার শ্বশুর।'

'শ্বশুর! বলেন কী? মোল্লারহাটে আপনার শ্বশুরবাড়ি নাকি?'

'তবে আর বলছি কী? বারো বছর ধরে ঘরজামাই আছি মশাই, কোনোদিন জামাই আদর পেয়েছি বলে কেউ বলতে পারবে না। উপরন্তু শ্বশুরমশাইয়ের ফাইফরমাশ খাটা, খেতের কাজকর্ম দেখা, মুনিষ খাটানো, হিসেবপত্র রাখা, মামলা-মোকদ্দমার তদবির করা, কী করতে হয় না বলুন তো। তাও কি শ্বশুরের মন ওঠে? দোষের মধ্যে একদিন একটু পয়সার টান

পড়েছিল বলে শাশুড়ির রুপোর পানের ডিবেটা বিষ্টুপুরের চরণ দাসের দোকানে বেচে দিয়েছিলাম বলে শ্বশুরমশাই জুতোপেটা করে তাড়ালেন। গতকাল থেকে এই বটতলায় বসে আছি মশাই, দানাপানিটুকু পর্যন্ত জোটেনি। কেউ খোঁজটুকু অবধি করেনি এখন অবধি।'

আশুবাবু একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'অ তাই বলুন। সেইজন্যই এতক্ষণ মোল্লারহাটের নিন্দেমন্দ করছিলেন?'

লোকটা একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'তা ইয়ে হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

'ফস করে একটা কথা মনে পড়ে গেল।'

'আবার কী কথা?'

'মনে পড়ে গেল যে, হরেকেষ্ট হল আমার শালা। আর আজ আমার শালি আন্নাকালীর বিয়ে।'

'অ্যাঁ। তাহলে আপনি হরেকেষ্টর ভগ্নীপতি হন! কী আশ্চর্য!'

লোকটা বিরস মুখে বলল, 'হরেকেষ্টর ভগ্নীপতি হওয়া এমন কিছু গৌরবের ব্যাপার নয় যে, অবাক হতে হবে। তা বলছিলাম কী, মোল্লারহাটের রাস্তা আপনাকে এক শর্তে দেখিয়ে দিতে পারি।'

'শর্তটা কী?'

'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। গিয়ে আমার শ্বশুরমশাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করে যদি...'

আশুবাবু উঠে পড়লেন। বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি! এ আর শক্ত কাজ কী? চলুন মশাই, চলুন। হরেকেষ্টর বাবা সুধাংশুবাবু আমার ভগ্নীপতি। অতি সজ্জন মানুষ। আমার সঙ্গে তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল একসময়। অনেকদিন যোগাযোগ নেই, এই যা। কিন্তু তাঁর কোনো ঘরজামাই আছে বলে তো শুনিনি।'

'সব কী আর আপনাকে জানিয়েছে?'

'তা আপনি ঘরজামাই হয়ে আছেন কেন? নিজে কিছু করেন না?'

বিরস মুখে লোকটা বলে, 'করি না কে বলল?'

'কী করেন?'

'সাতপুরার নাম শুনেছেন, আমি সেখানকার দারোগা।'

'অ্যাঁ! তবে যে বললেন ঘরজামাই।'

'তাও একরকম বলতে পারেন। ঘন ঘন যাতায়াত তো করতে হয়। শ্বশুরবাড়িতে বেশি যাতায়াত করা মানে একরকম ঘরজামাইয়ের মতোই ব্যাপার।'

'আর পানের বাটা চুরি! সেটা কে করল?'

লোকটা ফের একটা হাই তুলে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'সেই সকাল থেকে বিষ্টুপুরের বটতলায় আপনার জন্যে বসে আছি মশাই। শ্বশুরমশাই বললেন, বাবা, তোমার হল দারোগার চোখ, আশুকে দেখলেই তুমি চিনতে পারবে। তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসো তো। তাই বসে থেকে থেকে ঝিমুনি এসে গেল। তখনই গল্পটা ফেঁদে ফেললাম আরকী! ভালো হয়নি গল্পটা?'

'খুব ভালো, খুব ভালো।'

সেয়ানে সেয়ানে

এই রে! বাবু কি জেগে আছেন নাকি?

জেগে আছি কি আর সাধে রে বাপু! এই তোদের মতো চোর-ছ্যাঁচোড়দের জ্বালায় জেগে থাকতে হয়।

তা বাবু, দুনিয়ায় চোর-ছ্যাঁচোড়দেরও তো টিকে থাকতে হয় কিনা। কিন্তু এই মাঝরাত্তির অবধি রোজ জেগে থাকলে কি আপনার শরীরে সইবে কর্তা? হজমে গোলমাল হবে, বায়ুর ঊর্ধ্বগতি হবে, পেট ফাঁপবে, অনিদ্রায় ধরবে, ঠিক কিনা!

ওঃ, আমার জন্য যে তোর দরদ একেবারে উথলে উঠল! তা এতই যদি দরদ তাহলে আমার বাড়ির আশেপাশে নিশুত রাতে ঘুরঘুর করিস কেন? রাত জেগে তোর পেটে কি বায়ু হয় না? নাকি তোকে বদহজম বা অনিদ্রায় ধরে না?

কী যে বলেন বাবু! আমাদের শরীর কি আর মনিষ্যির শরীর! তবে কথাটা বড্ড জব্বর বলেছেন। এই সব অধর্মের কাজ করা আমাদের উচিত হচ্ছে না। দিনে ঘুমোনো, রাতে জাগা, পরের জিনিস হাতিয়ে নেওয়া, এসব কি আর ভালো কাজ কর্তা? মাঝে মাঝে ভারী চিন্তা হয়, যমরাজা যখন জেরা করবে তখন কী জবাব দেব?

ওঃ, একেবারে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এলেন! তা এত টনটনে ধর্মজ্ঞান নিয়ে চুরি-ধারি করিস কেন? গতর খাটালে কি ভাত জোটে না?

আজ্ঞে সেসবও কি ভাবিনি বাবু? তবে এ হল সেই বাপ-পিতেমোর বৃত্তি। বাপ-দাদাকেও দেখেছি কিনা। দিনমানে পড়ে পড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোত, আর নিশুতরাতে সিঁদকাঠি আর আরও সব যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরোত, পাপ-তাপ কাটানোর জন্য কার্তিক ঠাকুর আর মা কালীর পুজোও করত।

বাপ রে! তুই তো চোর-বংশের ছেলে!

আজ্ঞে। তা বংশ তেমন খারাপ ছিল না। ঠাকুর্দা পীতাম্বরের ভারী নামডাক ছিল, দারোগাবাবু অবধি খাতির করে কথা কইত, বাপ জনার্দনও বেশ নাম করেছিল। আমারই তেমন হাতযশ হল না, এটাই দুঃখ।

আহা, দুঃখের কি? তোর এখনও তো বয়স পড়ে আছে।

তা আছে। তবে বয়স পাকলেই কি হাতও পাকবে? এই যে আপনার কাছে আজ ধরা পড়ে গেলুম, আমার বাপ-দাদা হলে কি পড়ত?

ধরা পড়েছিস। ধরা পড়লি কোথায়? তুই জানলার বাইরে, আর আমি ঘরের মধ্যে।

না, জাপটে হয়তো ধরেননি, পুলিশও ডাকেননি, কিন্তু একরকম ধরেই তো ফেললেন, এটাও তো লজ্জার কথা! পাঁচজন যে দুয়ো দেবে আমাকে।

ওরে, ঘাবড়াসনি। আমি তো আর থানা-পুলিশ করতে যাচ্ছি না। সেই মতলবে রাত জেগে বসে আছি বলে ভেবেছিস নাকি?

না কর্তা, থানা-পুলিশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো। এই অনেকটা বাপ-ছেলের মতোই। তারা আমাদের ভালোমন্দ দেখে, আমরাও তাদের ছেদ্ধা-ভক্তি করি, ও নিয়ে

ঘাবড়াচ্ছি না। এই যে আপনার নজরে পড়ে গেলুম তাতেই জিব কাটতে ইচ্ছে হচ্ছে। তেমন তেমন চোরকে ধরা-ছোঁয়া দূরে থাক, চোখের দেখাটাও শক্ত ব্যাপার কিনা, তাই একটু একটু আত্মগ্লানি হচ্ছে কর্তা।

আত্মগ্লানি ভারী ভালো জিনিস, বুঝলি। আত্মগ্লানি হলেই চট করে মানুষের উন্নতির পথ খুলে যায়। এই আমার কথাই ধর না, ক্লাস সিক্স-এ ফেল করে বাবার মারের ভয়ে আত্মগ্লানিতে নদীতে ঝাঁপ দিলুম মরব বলে। কিন্তু মরব কি, কিছুতেই ডুবজল পাচ্ছি না, পায়ের তলায় কী যেন ঠেকছে। তখন হাতড়ে হাতড়ে জিনিসটা তুলে এনে দেখি, একজন বুড়ো মানুষ। কী আর করা, তখন বুড়োর পেট চেপে জল বার করতে হল। বুড়োও কঁৎ করে শ্বাস ছেড়ে উঠে বসে বলল, বাবা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার জন্য কী করতে পারি বলো। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললুম, আমার জন্য আর কারও কিছু করার নেই মশাই। আমি ক্লাস সিক্সে ফেল করেছি। আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। তখন উনি বললেন, ক্লাস সিক্সে তো! ওতে তো বেশির ভাগই ফেল মারে, আমি ক্লাস সিক্সেই ফেল করেছিলাম। তা তুমি আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমার একটা হিল্লে করে দেব।

তা দিল নাকি হিল্লে করে, কর্তা?

তাহলে আর বলছি কী? সেই বুড়োই আমার দাদাশ্বশুর হল কিনা। তারই বাড়িঘর, জমিজমা ভোগ করছি, বুঝলি?

তা বাবু, আপনার বাড়িতে তো আজ আর সুবিধে হল না। তা আমাদেরও তো বিষয়কর্ম আছে। তাহলে আজ আসি গিয়ে? নমস্কার।

ওরে দাঁড়া দাঁড়া, সবে গৌরচন্দ্রিকা করেছি, কথাটা শেষও হয়নি ভালো করে, এর মধ্যেই চলে যাচ্ছিস যে বড়! বলি অদ্রতা-ভদ্রতা বলেও কি কিছু নেই নাকি রে? তা তুই ভাবলি কী? আমারও কি বিষয়কর্ম নেই নাকি? এই রাত জেগে কি এমনি এমনি বসে আছি? চোর-ছ্যাঁচড়াদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করব বলে?

কী যে বলেন কর্তা। আমাদের মতো অধম মনিষ্যিদের সঙ্গে আপনার মতো মানুষের কি আর বিষয়কর্ম থাকতে পারে বলুন।

আহা, চোর বলে কি আর পচে গেছিস নাকি? ভালো করে ভেবে দেখলে সমাজে চোরও ফ্যালনা নয়। তারাও দেশের কাজই করে। তবে কিনা ঘুরপথে। থেমে থাকা টাকারে অরাই তো সচল করে, তাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুসার হয়, দেশের সম্পদ বাড়ে।

বটে কর্তা! এ তো তাজ্জব কথা শুনছি।

হক কথা শুনলে অনেক সময়ে আজব লাগে বটে। তবে যা বলছি একেবারে ন্যায্য কথা।

তা বাবু, কথাটা কী?

কথাটা অতিশয় গুহ্য। পাঁচকান যেন না হয়!

আজ্ঞে, মা কালীর দিব্যি।

ব্যাপারটা হল আমার দাদাশ্বশুর যা কিছু দিয়ে-থুয়ে গেছে তা ওই নিজের নাতনির নামে। আমার দাদাশ্বশুর নিতাইপদ দাস অতি ঘুঘু লোক ছিল, বুঝলি। তার নাতনির সঙ্গে বিয়ে ইস্তক আমি একরকম ঘরজামাই হয়ে আছি বটে, কিন্তু ভারী হাততোলা হয়ে থাকতে হয়। ইচ্ছেমতো কানাকড়ি খরচা করার উপায় নেই। নিতাইপদর নাতনি, অর্থাৎ আমার বউ বাতাসীও ভারী হুঁশিয়ার মেয়ে, দাদুর মতোই বাজার করার খরচা দিলে পাই পয়সার হিসেব নেয়,

এক পয়সা এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। তাই জীবনটায় ঘেন্না ধরে গেছে। বুঝতে পারলি কিছু?

একটু একটু যেন পারছি কর্তা। আর একটু ভেঙে বলুন।

বাতাসী হুঁশিয়ার মহিলা বটে, কিন্তু ঘুমোলে একেবারে কাদা। পটকা ফাটালেও তার ঘুম টসকায় না। তার আঁচল থেকে চাবিটা খসিয়ে নিয়ে সিন্দুকটা খুলে, বেশি নয়, এক বান্ডিল টাকা সরিয়ে নিবি বাপু? তোকে না হয় ওর থেকে দশটা টাকাই দেব।

মোটে! বান্ডিলে কত থাকার কথা?

ওরে, সে বেশি নয়, হাজার দশেক হবে মেরেকেটে। এ বাজারে সে আর কত টাকা?

তাহলেই বুঝুন, দশ টাকা এ বাজারে আরও কত কম! চোখেই দেখা যায় না।

আহা, না হয় পঞ্চাশই পাবি।

না মশাই, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে পারব না। আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। ও কাজ তো আপনি করলেই পারেন।

চেষ্টা কি আর করিনি রে বাপু। কী জানিস, আমি কাছাকাছি গেলেই বাতাসী যেন আমার গায়ের গন্ধ পায়। বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে, আত্মীয়দের সামনে এ বয়সে হেনস্থা হতে কার ভালো লাগে বলুন।

সে আপনি যাই বলুন, পাঁচ হাজারের নীচে হবে না। রাজি থাকলে বলুন, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।

তাহলে দু' বান্ডিল সরাস।

তাহলে দশ হাজার।

তুই তো ভারী সেয়ানা দেখছি।

সে তো আপনিও কর্তা। রাজি?

অগত্যা। আয় বাপু, পাছদুয়ারটা খুলে দিচ্ছি।

যে আজ্ঞে।

Edit By

banglapdf.net

পটকান যখন পটকালো

পটকান পালোয়ান ছিল শেরপুরের গর্ব। সে চেহারা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ষাট ইঞ্চি বুক, আশি ইঞ্চি পেট, গরিলার মতো হাত-পা। শরীরটার কোথাও কোনো ভেজাল নেই। ভুড়িখানা ঢালের মতো শক্ত। পটকান পালোয়ান ভুঁড়ি দিয়ে বিস্তর কুস্তিগীরকে চেপে দমসম করে দিয়েছে।

তিন কুলে পটকান পালোয়ানের কেউ ছিল না। খুব অল্প-বয়স থেকে ভীষণ খাই-খাই ছিল বলে খিটখিটে বাপ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই থেকে পটকান বিবাগী। অবশ্য সে বাপ এখন নেই, মাও গত হয়েছেন। পটকান তাই একা আনন্দে থাকে। সকালে দঙ্গলে গিয়ে তেল মাটি মাখে, কসরত করে, মুগুর ভাঁজে। অসংখ্য ডন-বৈঠক দেয়। একসের ছোলা দিয়ে সকালে জল খায়। বেলা পড়লে রুটির পাহাড় মাংসের পর্বত দিয়ে শেষ করে। বিকেলে একপুকুর দুধ আর এক গামলা বাদাম বাটা খায়, রাতে ফের ঘিয়ের পরোটার বংশ লোপ করে চারটে মুরগি দিয়ে। এর ফাঁকে ফাঁকে এন্তার ডিম, সব্জি, মিছরি, সরবত চালান হয়ে যায় তার অজান্তে। এসব ছোটোখাটো খাবারগুলো সে খাওয়ার মধ্যে ধরে না।

পটকানের সঙ্গে সেবার লড়তে এল পাঞ্জাবের ভীম সিং, তারও বিশাল চেহারা। খাওয়াদাওয়াও প্রায় পটকানের সমান। জমিদারের কাছারি বাড়িতে লোক ভেঙে পড়ল কুস্তি দেখতে। পটকান ভীম সিংকে তিন মিনিটে চিত করে হাত ঝেড়ে বলল—ছোঃ। জমিদারের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলল—হুজুর, বেয়াদপি মাপ করবেন। কিন্তু এসব চ্যাংড়া-প্যাংড়ার সঙ্গে লড়ার জন্য আমাকে ডাকা কেন?

সবাই ভাবে, ঠিক কথা, কিন্তু মুশকিল হল পটকান লড়বেই বা কার সঙ্গে? দেশ-বিদেশ থেকে যারাই লড়তে আসে, সে যত বড় ওস্তাদই হোক, পটকান তিন মিনিটের বেশি সময় নেয় না। লড়াইয়ের শেষে আবার বলে—ছোঃ। জমিদারের দিকে চেয়ে অভিমানের সঙ্গে বলে—আনাড়িদের সঙ্গেই কি আমাকে বরাবর লড়তে হবে হুজুর?

জমিদারমশাই মহা সমস্যায় পড়ে বললেন—তা বাপু, তোমার যোগ্য কুস্তিগীর পাই কোথায়? এঁরা যারা আসছেন লড়তে তাঁরাও সব নামডাকের লোক, কিন্তু তোমার কাছে কেউই ধোপে টেকে না দেখি—

—তার চেয়ে হুজুর বন্দোবস্ত করুন, ওরা দু'জন করে আসুক লড়তে, আমি একা।

তাই হল। লড়তে এল বচন পান্ডে আর হরি দোসাদ। দু'জনকে দু'বগলে নিয়ে হা হা করে হেসে ওঠে পটকান। তারপর তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে বলে—ছোঃ ছোঃ। বলে জমিদারবাবুর দিকে তাকায়—হুজুর, দেশে কি আর মানুষ পাওয়া গেল না!

জমিদারমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন—তাই তো! এরা তো দেখছি তেমন কিছু নয়। অথচ শুনেছিলাম এরা কিলিয়ে পাথর ভাঙে, পাঁচমন ওজন তোলে এক এক হাতে, হাতি বুকে নেয়। সে সব তো গল্পকথা নয় বাপু, নিজের চোখে দেখেই এনেছি। আচ্ছা দেখি তোমার উপযুক্ত যদি কাউকে পাই।

এরপর তিন পালোয়ান লড়তে এল একসঙ্গে। ভীষণ ভীষণ তাদের চেহারা। গোল্লা গোল্লা করে চায় আর দাঁত কিড়মিড় করে। তা সেই তিনজন যখন লড়তে নামল তখন বেলুন চুপসে আমসত্ত্ব হয়ে গেল ফের। তিনটেকে নিয়ে খানিক লোফালুফি খেলল পটকান, চেঁচিয়ে জমিদারমশাইকে বলল—হুজুর যখন বলবেন তখনই তিনজনকে মাটিতে ফেলব।

ফেললও তাই, তিনবার ছোঃ দিয়ে জমিদারমশাইয়ের দিকে তাকাতেই জমিদারমশাই বেজায় ভয়-খাওয়া মুখ করে মিন মিন করলেন—তাই তো বাপু, এ তো বড় মুশকিলে ফেললে তুমি।

খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে পটকান বলল—এরকম চললে আমাকে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে দেখছি।

এই কথায় সবাই ভারী চিন্তিত হয়ে পড়ে। জমিদারমশাইয়ের একেই হার্টের ব্যামো, বাঁ পায়ে বাতব্যাধি, রক্তচাপের রোগ, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, পেটটা ভুটভাট করে সব সময়ে। তার ওপর পটকানের এই কথা শুনে তিনি প্রায় অন্নজল ছাড়েন আর কি! শেরপুরের গর্ব পটকান পালোয়ান সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

শেরপুরের লোকেরা ভীষণ বিমর্ষ। পটকানের সঙ্গে কেউ লড়ে পারে না সে ঠিক, কিন্তু তা বলে একটু লড়াই হবে তো, কিছুক্ষণ কোস্তাকুস্তি করে তবে চিত হবি। এ যেন সব হেরোর দল মাটি নেওয়ার জন্যই আসে। এইসব হেরোর দলকে শেরপুরের লোকেরা হারু বলে উল্লেখ করে। জেতে বলে পটকানের নাম তারা দিয়েছে জিতেন। সবাই বলাবলি করে—জিতেনের সঙ্গে এবার কোন্ হারু লড়তে আসছে রে?

তা এল এবার। সারা দেশে লোক পাঠিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মানুষের চেহারার দশজন দানবকে ধরে আনা হল। তিন দিনে তারা শেরপুরের সব খাবার খেয়ে ফেলল প্রায়। চারদিকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। দশ পালোয়ান বাঘের মতো গর-র গর-র আওয়াজ ছাড়ে, মানুষের ভাষায় কথাই বলে না। দিনমানে তারা নিজেদের সামলাবার জন্য নিজেরাই নিজেদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। ভীষণ রাগী, কখন কার ঘাড় মটকে দিয়ে জেল হয়। তবু শেষরক্ষা হয় না বুঝি। তাদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা মজবুত পাকা ঘর। তবু দশ পালোয়ানের নড়াচড়ায় মেঝে দেবে গেল, দেওয়াল ভেঙে গেল একধারের। হাঁকডাকে চারধারে ভূমিকম্প হল কয়েকবার।

লড়াইয়ের দিন চারটে রথযাত্রার ভিড় ভেঙে পড়ল কাছারি বাড়িতে। হুলুস্থূল কাণ্ড। দশ দানব দঙ্গলের মাটি কাঁপিয়ে এসে ঢুকল একসঙ্গে। দশজনের সঙ্গে একা লড়বে পটকান।

চোখে দেখেও কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না ব্যাপারটা। পটকান দঙ্গলে ঢুকে গুরু প্রণামটা সেরে নিল কেবল। তারপরই দেখা গেল সে এক একটা দানবকে ধরে পটাপট ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, ঠিক যেমন গদাই মালি বাগানের আগাছা তুলে ছুড়ে দেয় বেড়ার বাইরে। দু'মিনিটে দশ পালোয়ান সাবাড় করে ঠিক দশবার ছোঃ দিল পটকান। তারপর ভীষণ অভিমানের চোখে তাকাল জমিদারমশাইয়ের দিকে। বলল—হুজুর—

রোগাভোগা জমিদারমশাইয়ের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে অপমানে। তিনি কয়েকবার গলা খাঁকারি দিলেন।

পটকান বলল, হুজুর, এরা সব কারা এসেছিল হুজুর? এসব রোগা দুব্‌লা লোক কোত্থেকে আনলেন?

হঠাৎ জমিদারমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—চোপরাও বেয়াদব! রোগা দুব্‌লা লোক? অ্যাঁ! রোগা দুব্‌লা লোক এরা সব!

বলতে বলতে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জমিদারমশাই বাতব্যাধির কথা ভুলে, হার্টের ব্যামোর কথা বিস্মরণ হয়ে, রক্তচাপকে পরোয়া না করে, পেটের ভুটভাটকে উপেক্ষা করে এক লাফে এগিয়ে এলেন দঙ্গলের মাটির ওপর।

কিছুতেই তোমার শিক্ষা হয় না, অ্যাঁ...বলতে বলতে জমিদারমশাই পটকানের ঘাড়টা ধরে এক ঝটকায় তুলে ফেললেন মাথার ওপরে। তারপর সে কি বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে লাগলেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

পটকান প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে তখন—বাবা গো! গেলাম গো! মেরে ফেললে গো! কে কোথায় আছো ছুটে এসো!

কে শোনে কার কথা! কয়েকবার আচ্ছাসে ঘুরিয়ে জমিদারমশাই পটকানকে এক বেদম আছাড় মারলেন। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন—ছোঃ!

লেজ

বাসা বদলানোর পর বদ্যিনাথ কিছু ফাঁপরে পড়ে গেল। যে বাড়িতে এল সে-বাড়ি না হোক তো এক-দেড়শো বছরের পুরোনো। নতুন চুনকাম করা সত্ত্বেও নোনাধরা দেওয়ালের চুনবালি খসে পড়ছে, গত বর্ষার জলের ছাপ এখনও দেয়াল থেকে মোছেনি। তার ওপর বড্ড ঘুপচি আর অন্ধকার, আলো-বাতাসের বালাই নেই। চারদিকে সব সময়ে একটা ভেজা-ভেজা ভাব। দেয়াল আর মেঝেয় হরেক রকমের ফাটল। তাতে কাঁকড়াবিছে-তেঁতুলবিছের আস্তানা, এখানে-সেখানে উইয়ের সুড়ঙ্গ পথ, আরশোলা ফরফর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দিন, লুকোনো গর্ত থেকে মাঝে মাঝে একটা ব্যাঙ ডাকে। বদ্যিনাথের নব্বই বছরের বুড়ি-মা দিন-রাত ঘ্যান-ঘ্যান করছেন, 'এ কী সোঁদরবন বাবা? কোন জীবজন্তুটা নেই এখানে? ঠাকুরঘরে বাদুড় পর্যন্ত ঝুলে আছে।'

'শুধু বাদুড়?' বদ্যিনাথের গিন্নি ঘোমটা খসিয়ে বলেন, 'ভাঁড়ার ঘরের জলনিকাশি ফুটো দিয়ে একটা লেজ বেরিয়ে যেতে দেখলুম। তা সে কীসের লেজ কে জানে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বদ্যিনাথের মা বলেন, 'লেজের কথা আর বোলো না। লেজ আমি দিনরাত দেখছি। পরশু রাতে ঘুম ভেঙে মশারির গায়ে একটা কাঁটাওলা লেজ, গতকাল আহ্নিকে বসে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে একটা লোমওলা লেজ, আজ সকালে বাইরের ঘরের চৌকির তলায় একটা লিকলিকে লেজ, আমার নিজের চোখে দেখা। তবে জন্তুগুলোকে ঠাহর করতে পারিনি।'

বদ্যিনাথের ছেলে মল্লিনাথ ছেলেবেলা থেকেই ভারি রোগা-ভোগা। ফ্যাকাশে সরু চেহারা। তার হাতে-গলায় রাজ্যের মাদুলি আর শেকড়-বাকড় বাঁধা। সে খেলে না, ছোটে না, দুষ্টুমি করে না। কাঁচকলা আর পেঁপের ঝোল দিয়ে ভাত খায় আর চুপ করে শুয়ে বসে থাকে। রোগে ভোগে বলে তার ঠাকুমা সবাইকে সাফ বলে দিয়েছেন, 'বংশের ওই একটিমাত্র সলতে। লেখাপড়ার ধকল যদি রোগা শরীরে না সয়? নাতি আমার বেঁচে থাক, লেখাপড়ার দরকার নেই।'

তাই মল্লিনাথ ইস্কুলে-পাঠশালেও যায় না। ঘরে বসে খুশিমতো একটু-আধটু পড়ে। কথাবার্তা বড়ো একটা বলে না কারও সঙ্গে। মা বা ঠাকুমার আঁচলের আড়ালে সে বড়ো হয়। মা-ঠাকুমার কথা শুনে মল্লিনাথও চিঁচি করে বলল, 'লেজ? লেজ তো আমিও দেখি। আমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ার থেকে মাঝে মাঝে একটা সবুজ রঙের ভারি সুন্দর লেজ বেরিয়ে ঝুলে থাকে।'

'কী সর্বনাশ!' মা-ঠাকুমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন।

বদ্যিনাথ গরিব মানুষ হলেও রোজ ছেলের জন্য খেলনা আনে, খাবার আনে। কিন্তু ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, চোখে মড়ার দৃষ্টি জ্যান্ত হয় না। বদ্যিনাথ বল কিনে এনে হাতে দেয়, খেলনা-বন্দুক দেয়, লাট্টু দেয়, ঘুড়ি-লাটাই দেয়, বলে, 'কী বাবা, একটু আনন্দ পাচ্ছ? এই দ্যাখো বল, এমনি করে পায়ে নিয়ে ছুটবে। দুম করে লাথি কষাবে, কেমন আনন্দ হবে দেখো।...ঘুড়ি কেমন শোঁ করে আকাশে ওড়ে, না বাবা? দেখেছ তো! তেমনি

ওড়াবে ছাদে উঠে, দেখবে বুকখানা ভারি হালকা হবে, ফুর্তি হবে খুব। বন্দুক দিয়ে রোজ টিপ করবে। কত আরশোলা, ইঁদুর, চামচিকে চারদিকে দেখছ তো।...টিপ করে করে মারতে মারতে দেখো রক্ত গরম হয়ে উঠবে।...এই দ্যাখো লাট্টু, কেমন বনবন ঘোরে জানো?'

কিন্তু খেলনা পড়ে থাকে, খাবারও ছোঁয় না মল্লিনাথ। মাদুলির ভারে কুঁজো হয়ে চুপ করে ফ্যাকাশে মুখে বসে থাকে। তার রক্ত গরম হয় না, আনন্দ হয় না, ফুর্তি হয় না। বদ্যিনাথ তার সামনে বল খেলে দেখায়, ঘুড়ি উড়িয়ে দেখায়, লাট্টু ঘুরিয়ে দেখায়, দেখাতে দেখাতে হাঁফিয়ে ওঠে, নেতিয়ে পড়ে, চিড়বিড়োতে থাকে।

নতুন বাসায় এসে মল্লিনাথ আরও ফ্যাকাশে হয়েছে, আরও রোগা, আরও ন্যাতানো। মা, ঠাকুমা বার বার তার দিকে তাকিয়ে সারা দিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। ছেলে বাঁচলে হয়। তাই সবুজ লেজের কথা শুনে সবাই আঁতকে উঠল। টেবিল ঝাড়পোঁছ করা তো হলই, সারা বাড়িতে ছড়ানো হল কড়া কীটনাশক। এক তান্ত্রিক এসে প্রায় বিশ গ্রাম ওজনের আর-একটা তাবিজ বেঁধে দিয়ে গেল গলায়। মল্লিনাথ আরও একটু কুঁজো হয়ে গেল তার ভারে। তা বলে সবুজ লেজটা কিন্তু তাকে ছাড়ল না। তাবিজ নেওয়ার পরদিন সকালে পড়ার টেবিলে বসে সে 'গুপ্তধনের খোঁজে' নামে একটা গল্পের বই পড়ছিল। কনুইতে সুড়সুড়ি লাগায় সে তাকিয়ে দেখল সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ড্রয়ার থেকে সেই কচি কলাপাতা রঙের সুন্দর সবুজ সরু লেজটা বেরিয়ে এসে খুব আদুরে-আদুরে ভাব দেখিয়ে নড়াচড়া করছে। মল্লিনাথ যে ভয় পেল তা নয়। সে চিরকাল কলকাতায় মানুষ। এই প্রায় দশ বছর পর্যন্ত সে একমাত্র চিড়িয়াখানায় ছাড়া আর কোথাও তেমন কোনো জীবজন্তু দেখেনি। লেজটা দেখে তাই তার ভারি অবাক লাগে। ভারি সুন্দর দেখতে, হাত দিতে ইচ্ছে করে। একটু ভয়ে-ভয়ে, সংকোচের সঙ্গে মল্লিনাথ হাত বাড়িয়ে লেজটা একটু ছুঁয়ে দিল। সুট করে সরে গেল লেজটা। পরদিন আবার বেরিয়ে এসে সুড়সুড়ি দিল হাতে। মল্লিনাথ আবার একটু ছুঁল। আর এইভাবেই রোজ সেই সবুজ লেজটার সঙ্গে তার দেখা হতে থাকে। একটু-একটু করে ভাব হতে থাকে। মল্লিনাথের ভারি ভালো লাগে লেজটাকে। একদিন ড্রয়ারটা একটু বেশি ফাঁক করে রাখল সে। লেজটা বেরিয়ে আসতেই উঁকি মেরে দেখল ভিতরে একটা বেশ লম্বা গড়নের সাপের মতো দেখতে প্রাণী কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমোচ্ছে। পরদিন ড্রয়ারটা আরও ফাঁক করল মল্লিনাথ, সকালবেলা যথারীতি আবার লেজটার সঙ্গে ভাব করতে করতে প্রাণীটিকে দেখল আড়চোখে। ছোটোখাটো একটা আমুদে সাপই হবে। অলসভাবে শুয়ে শুয়ে একটা আরশোলা চিবোচ্ছে।

পরদিন মল্লিনাথের ধৈর্য থাকল না। লেজটা বেরোতেই ড্রয়ারটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল। লেজটা ধরল মুঠো করে। করুণ স্বরে বলল, 'আমার যে আর কোনো বন্ধু নেই।'

সাপটা মল্লিনাথের এই আচরণে ভারি বিরক্ত হয়ে কিলবিলিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। সড়াত করে ড্রয়ার থেকে নেমে প্রাণপণে ছুটল ভেতর বাড়ির দিকে। মল্লিনাথও লাফিয়ে ওঠে। তার একমাত্র বন্ধু, ভাবের পাত্র পালিয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে মল্লিনাথও তার পিছনে ছোটে।

সবুজ সাপটা ভারি চালাক। সোজা পথে না গিয়ে সে খানিকক্ষণ এ-ঘর সে-ঘর করে পালিয়ে বেড়ায়। আলমারির তলা, খাটের তলা, জুতোর র‍্যাকের পিছন, চৌকাঠের আড়ালে ঘুরে অবশেষে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে ভাঁড়ার ঘরের পিছনে একটা ঘুপসি ঘুঁটে-কয়লা রাখার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের কোণে একটা মস্ত গর্তে সেঁধিয়ে গেল সুট করে।

মল্লিনাথ তা বলে হাল ছাড়ল না। গর্তের কাছে গিয়ে প্রথমে অনেক কাকুতি-মিনতি করল। কাজ হল না দেখে একটা লোহার শাবল এনে গর্ত বড়ো করতে বসল। মল্লিনাথের গায়ে

জোর নেই, মাদুলির ভারেই সে জর্জরিত। কিন্তু বন্ধু হারিয়ে যাওয়ার শোকে তার গায়ে দ্বিগুণ বল এল। তাবিজ কবচ মাদুলির জন্য শাবল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে এক-এক টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিল সেগুলো। ভারী শাবলটা প্রাণপণে চালাতে লাগল।

হাত দেড়েক গর্ত খোঁড়ার পরই সে একটা ভুসভুসে ইঁটের গাঁথনি পেল। শাবলের দুটো চাড়ে উপড়ে ফেলল ইঁট। দেখল ঘরের নীচে আর একটা গুপ্ত কুঠুরি রয়েছে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। গর্তে মুখ দিয়ে মল্লিনাথ ডাকে, 'এসো ভাই সবুজ লেজ, আমার যে তুমি ছাড়া বন্ধু নেই। আমি যে ইস্কুলে যাই না, কারও সঙ্গে ভাব করতে পারি না, সবাই যে আমাকে খ্যাপায়।'

কিন্তু সবুজ লেজ আর বেরোয় না। মল্লিনাথ একটা টর্চ নিয়ে এসে গর্তের মধ্যে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

চোর-কুঠুরিতে টর্চের আলো ফেলে সে দেখল, চারদিকে তিন-চারটে লোহা আর কাঠের সিন্দুক। অনেক রুপোর আর সোনার বাসন রয়েছে দেয়াল আলমারিতে। কিন্তু সেসব গ্রাহ্যও কবল না মল্লিনাথ। আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগল তার বন্ধুকে। সিন্দুক শাবলের চাড়ে খুলে ফেলে দেখল, রাশি রাশি সোনা আর রুপোর মোহর আর টাকা, হিরে জহরত, গয়না, সোনার বাঁট। সব হাঁটকে-মাটকে সে সবুজ লেজকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও পায় না। পায় না তো পায় না।

ক্লান্ত হয়ে সে একসময় শাবল আর টর্চ ফেলে দিয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর খুব রেগে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমিও মজা দেখাচ্ছি। আজ থেকেই আমি অন্য সব ছেলের সঙ্গে মিশব। তাদের সঙ্গে ভাব করব, খেলব। তখন দেখো তোমার হিংসে হয় কি না।'

এই বলে মল্লিনাথ কুঠুরির বাইরে বেরিয়ে আসে। গর্তের মুখ ভালো করে ইঁট আর মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেয়। তার চোখে জল, মুখ থমথম করছে অভিমানে।

দুম দুম করে পা ফেলে হেঁটে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পাড়ার ছেলেরা গলির মুখ আটকে ইঁট সাজিয়ে রবারের বলে ক্রিকেট খেলছিল। মল্লিনাথ গিয়ে বল কেড়ে নিল একটা ছেলের হাত থেকে। তারপর দৌড়ে গিয়ে এমন জোরে বল করল যে, ইঁটের স্ট্যাম্প পর্যন্ত তিন হাত ছিটকে গিয়ে ভেঙে পড়ল। ছেলেরা মল্লিনাথের এলেম দেখে খ্যাপাতে ভুলে গেল। 'ওস্তাদ ওস্তাদ' বলে চেঁচাল কয়েকটা ছেলে। মল্লিনাথ পরের বলটা করল আরও ভয়ংকর। বলটাই ফেটে গেল ফটাস করে। যার বল, সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

মল্লিনাথ কাঁদুনে ছেলেটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। আমার বল-ব্যাট অনেক আছে। আনছি।' বলে দৌড়ে গিয়ে মল্লিনাথ ব্যাট-বল আনে। খেলা আবার জমে ওঠে।

মল্লিনাথ ব্যাটও করল অসাধারণ। রাগে গা রি-রি করছে। তাই এত জোরে ব্যাট চালাল যে, মার খেয়ে তিনতলা চারতলা পাঁচতলা বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে বল গিয়ে ওভার বাউন্ডারি হতে লাগল। তার খেলা দেখে সবাই থ।

অনেকক্ষণ খেলে ঘেমে চুমে মল্লিনাথ যখন বাসায় ফিরল, তখন তার রাগ অনেকটা কমেছে, মুখে হাসি ফুটেছে, চোখে মড়ার দৃষ্টি খুব জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। সেই দৃশ্য দেখে তার মা আর ঠাকুমা ভয় খেয়ে কেঁদে খুন। 'ওগো, কে আমাদের বাছাকে ওষুধ করেছে?'

শুনে মিটিমিটি হাসল মল্লিনাথ। ছাদে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াল, বন্দুক টিপ করে তিনটে কাঁকড়াবিছে ঘায়েল করল, বনবন করে লাট্টু ঘোরাল। বিকেলে পাড়ার কাছে মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে তিন-তিনটে গোলও দিয়ে দিল মল্লিনাথ। সন্ধেবেলা বদ্যিনাথ বাড়ি ফিরলে সে গিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'বাবা, আমাকে ইস্কুলে ভরতি করে দাও। আমার অনেক বন্ধু চাই।'

শুনে বদ্যিনাথের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মল্লি ইস্কুলে আসতেই হাঁফ ধরে যাবে ছেলের!

ওদিকে মল্লিনাথের কাণ্ড দেখে মা আর ঠাকুমা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে চেঁচাচ্ছেন আর কাঁদছেন। তাঁদের ধারণা মল্লি পাগল হয়ে গেছে, এবার হয়তো কামড়ে দেবে। বাড়ির চাকর তান্ত্রিককে ডাকতে গেছে।

বদ্যিনাথও মূর্ছাই যাচ্ছিল। মল্লিনাথই তাকে জল-টল দিয়ে চাঙ্গা করল। বলল, 'সবুজ লেজটা আমার সঙ্গে খুব বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওকে আমি মজা দেখাব।'

বদ্যিনাথ হাঁ করে চেয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

তখন মল্লিনাথ ঘটনাটা খুলে বলে তার বাবাকে নিয়ে গিয়ে গর্ত দেখায়। মাটি ফের খুঁড়ে দু-জনে মিলে চোর-কুঠুরিতেও নামে। সব দেখিয়ে মল্লিনাথ বদ্যিনাথকে বলে, 'দেখলে তো সবুজ বন্ধুর জন্য খামোখা কত খেটেছি।'

বদ্যিনাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তা বটে।'

মল্লিনাথ একমুঠো হিরে তুলে নিয়ে রাগের চোটে মেঝেয় ছুড়ে মেরে বলে, 'ওকে মজা দেখাব। অনেক বন্ধু হবে আমার, তখন বুঝবে।'

'ঠিক, ঠিক।' বদ্যিনাথ হাসিমুখে বলে।

তারপর বাপ-ব্যাটায় উঠে এসে গর্ত বুজিয়ে ফেলে। পরদিন রাজমিস্ত্রি এনে জায়গাটা পাকা গাঁথনি দিয়ে দেয়।

এরপর থেকে মল্লিনাথ ক্রমে ক্রমে ভারি জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। যেমন লেখাপড়ায় তেমনি খেলাধুলায়।

চোর-কুঠুরির কথা বাপ-ব্যাটা আর মুখেও আনে না।

রাজার মন ভালো নেই

রাজার মন আর কিছুতেই ভালো যাচ্ছে না। মন ভালো করতে লোকেরা কম মেহনত করেনি। রাজাকে গান শোনানো হয়েছে, নাচ দেখানো হয়েছে, বিদূষক এসে হাজার রকমের ভাঁড়ামি করেছে। যাত্রা, নাটক, মেলা-মচ্ছব, যাগ-যজ্ঞ, পুজোপাঠ সব হল।

পুবের রাজ্য থেকে আনারস, উত্তরের হিমরাজ্য থেকে আপেল, পশ্চিম থেকে আখরোট, আঙুর, পেস্তা, বাদাম, দেশ-বিদেশ থেকে ক্ষীর আর ছানার মিষ্টি এনে খাওয়ানো হয়েছে। এখন সাহেব আর চিনে রসুইকররা দু'বেলা হরেক খাবার বানাচ্ছে। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘন্টায় ঘন্টায় বুক কাঁপিয়ে হুংকারে এক-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন!

'না হে, মনটা ভালো নেই।'

রাজবৈদ্য এসে সারাদিন বসে নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকেন। নাড়ি কখনও কখনও তেজি, কখনও মোটা, কখনও সরু। রাজবৈদ্য আপনমনে হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করেন, তারপর শতেকরকম শেকড়-বাকড় বেটে ওষুধ তৈরি করে শতেক অনুপান দিয়ে রাজাকে খাওয়ান, রাজা খেয়ে যান। তারপর হড়াস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়।

'না হে, মনটা ভালো নেই।'

রাজার মন ভালো করতে রাজপুত্তুর আর সেনাপতিরা আশেপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে, হেরো রাজাগুলোকে বন্দি করে নিয়ে এল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

'মনটা বড় খারাপ রে।'

তখন মন্ত্রীমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলশকর পাইক-পেয়াদা নিয়ে রাজা শ-দেড়েক তীর্থ আর দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, 'হায় হায়। মনটা একদম ভালো নেই।'

ওদিকে ভাঁড়ামি করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রাজনর্তকীর পায়ে বাত। সভাগায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকারদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে, রাজবৈদ্যকে ধরেছে ভীমররতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রীমশাইয়ের মাথায় একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করছেন।

রাজপুরোহিত হোম-যজ্ঞে এত ঘি পুড়িয়েছেন যে এখন ঘিয়ের গন্ধ নাকে গেলে তাঁর মূর্ছা হয়। প্রজাদের মধ্যে কিছু অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। সভাপণ্ডিতেরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন। রাজজ্যোতিষী রাজার জন্মকুণ্ডলী বিচার করতে করতে, আঁক কষে দিস্তা-দিস্তা কাগজ ভরিয়ে ফেলছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুলবাগিচায় বসে আছেন। চারদিকে হাজারোরকমের ফুলের বন্যা, রঙে-গন্ধে ছয়লাপ। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা মধুর স্বরে ডাকছে। সামনের বিশাল সুন্দর দিঘিতে মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

রাজা চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ সিংহগর্জনের মতো বলে উঠলেন, 'গর্দান চাই।'

মন্ত্রী পাশেই ছিলেন। আপনমনে বিড়বিড় করছিলেন। মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, 'কার গর্দান মহারাজ?'

রাজা লজ্জা পেয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হল কার যেন গর্দান নেওয়ার দরকার।'

মন্ত্রী বললেন, 'ভাবুন মহারাজ। আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।'

বহুকালের মধ্যে রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ায় মন্ত্রীর আশা হল, এবার রাজার মনমতো একটা গর্দান দিলে বোধহয় মন ভালো হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভার কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'না হে গর্দান নয়। গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।'

বিকেলবেলা রাজা প্রাসাদের বিশাল ছাদে পায়চারি করছিলেন। সঙ্গে রাজকীয় কুকুর, তাম্বুলদার, হুক্কাদার, মন্ত্রী। পায়চারি করতে করতে রাজা নদীর ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'বুড়ির ঘরে আগুন দে। দে আগুন বুড়ির ঘরে।'

মন্ত্রীর বিড়বিড় করা থেমে গেল। রাজার সমুখে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'যো হুকুম মহারাজ! শুধু বুড়ির নামটা বলুন।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'কী বললাম বলো তো!'

'আজ্ঞে এই যে বুড়ির ঘরে আগুন দিতে বললেন।'

রাজা ঘাড় চুলকে বললেন, 'বলেছি নাকি? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।'

সেইদিনই শেষ রাতে রাজা ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন, 'বিছুটি লাগা। শিগগির বিছুটি লাগা।'

পরদিনই খবর রটে গেল, রাজা বিছুটি লাগাতে বলেছেন। আতঙ্কে সবাই অস্থির।

মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিগ্যেস করলেন, 'মহারাজ! কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন, বিছুটি আনতে পশ্চিমের পাহাড়ে লোক পাঠিয়েছি।'

'বিছুটি!' বলে রাজা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গরুর গাড়ি বোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনের অঙ্গনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেদিকে মন নেই।

রাজা রঙ্গঘরে বসে বয়স্যদের সঙ্গে ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। মুখ গম্ভীর, চোখে অন্যমনস্ক একটা ভাব। বয়স্যরা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে জিতবার সুবিধা করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল।

খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, 'পুঁতে ফেললে কেমন হয়?'

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'খুব ভালো হয় মহারাজ। শুধু একবার হুকুম করুন।'

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, 'কীসের ভালো হয়? কিছুতেই ভালো হবে না মন্ত্রী! মনটা একদম খারাপ।'

মন্ত্রী বিমর্ষ হয়ে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন।

পরদিন রাজা শিকারে গেলেন। সঙ্গে বিস্তর লোকলশকর, অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া, রথ। বনের মধ্যে রাজার শিকারের সুবিধের জন্যই হরিণ, খরগোশ, পাখি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। একটা বাঘও আছে।

রাজা ঘোড়ার পিঠে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কিন্তু একটা তিরও ছুড়লেন না। দুপুরে বনভোজনে বসে পোলাও দিয়ে মাংসের ঝোল মেখে খেতে খেতে বলে উঠলেন। 'বাপ রে। ভীষণ ভূত।'

মন্ত্রীমশাই সঙ্গে সঙ্গে মাংসের হাত মাথায় মুছে উঠে পড়লেন। রাজামশাইয়ের সামনে এসে বললেন, 'তাই। বলুন মহারাজ। ভূত। তা তারই বা ভাবনা কী? ভূতের রোজাকে ধরে আনছি, রাজ্যে যত রোজা ধরে ধরে সব শূলে দেওয়া হবে।'

রাজা হাঁ করে রইলেন। বললেন, 'ভূত। না না ভূত নয়। ভূত হবে কী করে? ভূতের কি মাথা ধরে?'

মন্ত্রীমশাই আশার আলো দেখতে পেয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, 'মাথা ধরলেও বদ্যিভূত আছে। তারা ভূতের ওষুধ জানে।'

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি ভূতের কথা ভাবছি না। মনটা বড় খারাপ।'

কয়েকদিন পর রাজা এক জ্যোৎস্না রাতে অন্দরমহলের অলিন্দে রানির পাশাপাশি বসেছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'চলো রানি, চাঁদের আলোয় বসে পান্তাভাত খাই।'

রানি তো প্রথমে অবাক। তারপর তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এসে হাতজোড় করে বললেন, 'তা এ আর বেশি কথা কী? ওরে, তোরা সব পান্তাভাতের জোগাড় কর।'

রাজা অবাক হয়ে বললেন, 'পান্তাভাত? পান্তাভাতটা কী জিনিস বলো তো?'

'জলে ভেজানো ভাত মহারাজ, গরিবরা খায়। কিন্তু আপনি নিজেই তো পান্তাভাতের কথা বললেন।'

'বলেছি? তা হবে। কখন কী বলি। মনটা ভালো নেই তো, তাই।'

মন্ত্রীমশাই ফিরে গেলেন। তবে সেই রাত্রেই তিনি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চারজন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, 'ওরে, তোরা আজ থেকে পালা করে রাজমশাইয়ের ওপর নজর রাখবি। চব্বিশ ঘণ্টা।'

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, 'রাজামশাই ভোররাত্রে বিছানা থেকে নেমে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।'

আর একজন বলল, 'রাজামশাই একা একাই লাল জামা নেব, লাল জামা নেব, বলে খুঁতখুঁত করে কাঁদছেন।'

আর একজন এসে খবর দিল, 'রাজামশাই এক দাসীর বাচ্চা ছেলের হাত থেকে একটা মণ্ডা কেড়ে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন। এইমাত্র।'

চতুর্থজন বলল, 'আমি অতশত জানি না, শুধু শুনলাম রাজামশাই খুব ঘন ঘন ঢেকুর তুলছেন আর বলছেন, সবই তো হল, আর কেন?'

মন্ত্রীর মাথা আরও গরম হল। তবু বললেন, 'ঠিক আছে, নজর রেখে যা।'

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, 'আজ্ঞে রাজামশাই আমাকে ধরে ফেলেছেন। রাত্রে শোওয়ার ঘরে জানলা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, 'নজর রাখছিস। রাখ।' বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।'

দ্বিতীয়জন এসে বলে, 'আজ্ঞে আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাকে বললেন, 'কানে কেন্নো ঢুকবে, বেরিয়ে আয়।'

তৃতীয়জন কান চুলকে লাজুক লাজুক ভাব করে বলল, 'আজ্ঞে আমি বিকেলে রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভুঁইমালি সেজে গাছ ছাঁটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, 'ওরে, ভালো গুপ্তচর হতে গেলে সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই।' বলে রাজা নিজেই গাছ ছেঁটে দেখিয়ে দিলেন।'

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর, সেই রাখহরি এখনও এসে পৌঁছোয়নি। মন্ত্রী একটু চিন্তায় পড়লেন। ওদিকে রাখহরি কিন্তু বেশি কলাকৌশল করতে যায়নি। সকালবেলা রাজার শোওয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি, আপনার উপর নজর রাখছি।'

রাজা অবাক হলেন, স্মিত হাসলেন। হাই তুলে বললেন, 'বেশ বেশ। মন দিয়ে কাজ করো।'

তারপর রাজা যেখানে যান, পেছনে রাখহরি ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, 'চিমটি দে। রাম চিমটি দে।'

সঙ্গে সঙ্গে রাখহরি রাজার পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁক করে উঠে বললেন, 'করিস কী, করিস কী, ওরে বাবা!' রাখহরি বলল, 'বললেন যে।'

পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন।

আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ল্যাঙ মেরে ফেলে দে।'

বলতে না বলতেই রাখহরি ল্যাঙ মারল। রাজা চিতপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। রাখহরি রাজার গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাজার পায়ের ধুলো নিল।

রাজা শ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ।'

রাত পর্যন্ত আর কোনও ঝামেলা করলেন না। রাখহরি রাজার পিছু-পিছু শোওয়ার ঘরে ঢুকল এবং রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা আড়চোখে দেখে একটু হাসলেন। আপত্তি করলেন না। তবে শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ খুঁতখুঁত করে বলে উঠলেন, 'ঠান্ডা জলে চান করব, ঠান্ডা জলে।'

রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের সোনার কলসের কেওড়া আর গোলাপের সুগন্ধ মেশানো জলটা সবটুকু রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে-কেশে উঠে বসলেন, 'আচ্ছা, শুগে যা।'

রাখহরি অবশ্য শুতে গেল না। পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দে বুকে ছোরা বসিয়ে দে'—রাখহরি কোমরের ছোরাখানা খুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে রাজা বললেন, 'থাক থাক। ওতেই হবে। তোর কথা আমার মনে ছিল না।'

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোকজন ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দু'হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, 'ওরে আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। ভীষণ হাসি পাচ্ছে।'

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাক বাবা! মন খারাপটা গেছে তা হলে।'

হাসতে হাসতে রাজা বিষম খেয়ে বললেন, 'ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!'

তারপর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল আবার। কারণ নেই কিছু নেই, রাজা সব সময়ে কেবল ফিক্ ফিক্ করে হেসে ফেলছেন। খুব দুঃসংবাদ দিলেও হাসতে থাকেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিক্-ফিক্। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিক্-ফিক্। দক্ষিণের রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে? ফিক্-ফিক্।

রাজার হাসি বন্ধ করার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে।

রামবাবু এবং কানাই কুণ্ডু

রামবাবুর খুব সর্দি হয়েছিল। বন্ধু শ্যাম কবিরাজ তাঁকে এক পুরিয়া কবরেজি নস্যি দিয়ে বললেন, শোয়ার আগে এক টিপ টেনে শুয়ে পোড়ো।

তাই করলেন রামবাবু। ঘুম ভেঙে উঠে সকালে বেশ ঝরঝরে লাগল শরীরটা।

সকালবেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে রামবাবু আয়নায় আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর বাঁ গালে একটা কালো এবং বড় জরুল দেখা দিয়েছে। প্রথমটায় ভেবেছিলেন কালির দাগ। আঙুল দিয়ে ঘষে দেখলেন, তা নয়, জরুলই। তবে আচমকা গালে একটা জরুল দেখে রামবাবুর যতটা বিরক্ত বা বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল ততটা হলেন না। কারণ, জরুলটা তাঁর ফর্সা গালে মানিয়েছে ভাল।

ফর্সা! রামবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে আবার একবার থমকালেন, ফর্সা? তিনি তো কস্মিনকালেও ফর্সা নন। বেশ কালোই তাঁর গায়ের রঙ। তাহলে এরকম ধপধপে ফর্সাই বা তাঁকে লাগছে কেন এখন? রামবাবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ফটফটে আলোয় হাত- আয়না দিয়ে মুখখানা দেখলেন। নাঃ, দারুণ ফর্সাই তো তিনি! লোকে যে এতকাল কেন তাঁকে কালো বলে বদনাম দিয়ে এসেছে!

যাকগে রামবাবু আজ বেশ খোশমেজাজেই দাড়ি কামিয়ে চান সেরে নিলেন। মাথা জোড়া টাক বলে রামবাবুকে চুল আঁচড়ানোর বিশেষ ঝক্কি পোয়াতে হয় না। ঘাড় আর জুলপি আঁচড়ে নিলেই চলে।

কিন্তু আজ রামবাবু চুল সামলাতে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেলেন। মাথা ভর্তি কালো কুচকুচে এবং ঢেউ খেলানো চুল যে কোথা থেকে এল তা রামবাবু হদিস করতে পারলেন না কিন্তু অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যাপার নিয়ে ভাববার মতো ফুরসৎ হাতে নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই রামবাবু একটা হাঁক মারলেন, গিন্নি, খেতে দাও। তারপর চটপট পোশাক পরে ফেললেন।

তাঁর গিন্নি বেশ মোটাসোটা, একটু থপথপে, গম্ভীর প্রকৃতির। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি রামবাবুর দিকে তাঁর গম্ভীর চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আপনি বাইরের ঘরে গিয়ে বসুন। উনি বাথরুমে গেছেন।

এটা কিরকম রসিকতা তা রামবাবু বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁর গিন্নি খুব রসিক প্রকৃতির মানুষও নন।

রামবাবুকে খুব একটা বোকা বলা যায় না, তিনি একটু ভাবলেন এবং ফের বড় আয়নায় ভাল করে নিজেকে দেখলেন। বছর পঁচিশেক বয়সের বেশ কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারাবিশিষ্ট এই লোকটা যে তিনি নন তা টের পেতে আর এক লহমাও দেরি হল না তাঁর।

প্রথমটায় একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও শেষ অবধি খুশিই হলেন রামবাবু। টাকওয়ালা, কালো এবং নাদুস নুদুস চেহারার যে মানুষটি তিনি ছিলেন তাকে তাঁর বিশেষ পছন্দ ছিল না।

রামবাবু এটাও বুঝলেন যে এ বাড়িতে আর অবস্থান করা ঠিক হবে না। তিনি আর যেই হোন রামবাবু নন।

সুতরাং রামবাবু সদর খুলে গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে পড়লেন।

সমস্যা হল তিনি যে রামবাবু নন এটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু তাহলে তিনি কে? এই নতুন চেহারার লোকটার তো একটা কোনও পরিচয় আছে। গোবর্ধন, রাজবল্লভ, বগলাপতি বা যাই হোক একটা নাম এবং পাল, সিংহ, ভট্টাচার্য যা হোক একটা পদবি তো তাঁর থাকা উচিত।

বড় রাস্তায় পড়ার আগে দেখলেন গলির মোড়ে রক-এ বসে ছেলেরা আড্ডা মারছে। তাঁরই ছেলের বন্ধুরা সব।

রামবাবু যখন তাদের পেরিয়ে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ তারা কথাবার্তা বন্ধ করে তাঁর দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ফিসফাস করতে শুরু করল, ওরে, ওই দ্যাখ কানাই কুণ্ডু যাচ্ছে।

কানাই কুণ্ডু! রামবাবু একটু চমকালেন, কানাই কুণ্ডু মানে কি মোহনবাগানের সেই বিখ্যাত খেলোয়াড়টি নাকি? না, তার খেলা রামবাবু কখনো দেখেননি তবে নামটা প্রায়ই শোনেন। দারুণ নাকি ভাল খেলে। রোজই একটা দুটো তিনটে করে গোল দেয় বিপক্ষ দলকে। তাহলে তিনিই কানাই কুণ্ডু?

রক-এর ছেলেরা হঠাৎ দৌড়ে এসে তাঁকে প্রায় ঘিরে ফেলল।

এই যে কানাইদা; এখানে কোথায় এসেছিলেন?

কানাইদা, আপনি তো বাগবাজারে থাকেন। আপনার ঠিকানাও জানি। ওয়ান বাই সি, বাগবাজার লেন।

কানাইদা, আজ ইস্টবেঙ্গলকে ক' গোল দিচ্ছেন?

একটা অটোগ্রাফ দেবেন কানাইদা?

রামবাবু খুব উঁচু দরের হাসি হেসে সবাইকার সঙ্গেই একটু-আধটু কথা বললেন। এই ফাঁকে নিজের একটু পাবলিসিটিও করে নিলেন। বললেন, এই পাড়ায় রামবাবুর কাছে এসেছিলাম। উনি আমার দাদার মতো।

একটা ছেলে বলে উঠল, ধুস, রামবাবু তো কুমড়োপটাশ তার ওপর হাড়কেপ্পন। একটু ছিটও আছে মাথায়।

রামবাবু আমতা আমতা করে বললন, তোমারা ওঁকে ঠিক চেনো না। ও রকম সদাশিব লোক হয় না।

যাই হোক, রামবাবু ছেলেগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় ট্যাকসি ধরলেন।

কোথায় যাবেন তা সঠিক জানেন না। ওয়ান বাই সি বাগবাজার লেন-এ কানাই কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হতে তাঁর ঠিক সাহস হল না। সেখানে আবার কী গুবলেট হয়ে আছে কে জানে!

তবে তিনি এটা জেনে নিয়েছেন যে, ময়দানে আজ মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ আছে। কাজেই ট্যাক্সিটা তিনি ময়দানের কাছে এনে ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়লেন।

আর নেমেই পড়ে গেলেন বিপাকে। কোত্থেকে পিলপিল করে একগাদা লোক ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলল।

এই কানাই, খুব ল্যাং মেরে খেলা শিখেছো! অ্যাঁ, সেদিন যে বড় আমাদের হাফ ব্যাকটাকে জখম করেছিলে! আজ তোমার ঠ্যাং খুলে নেবো।

কানাইয়ের খুব তেল হয়েছে রে কালু। আয় আজ ওর তেল একটু নিংড়ে নেওয়া যাক।

এই যে কানাইবাবু, বল না প্লেয়ার কাকে লাথি মারতে আপনার বেশি ভাল লাগে বলুন তো! চোখে ভাল দেখতে পান তো!

ওহে কানাই মস্তান আজ ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলে কিন্তু কলজে খেঁচে নেবো, বুঝলে?

এই সময়ে কিছু লোক দৌড়ে এসে রামবাবুকে ধরে বলল, এই যে কানাই, আজ এত বড় খেলা, আর তোমার পাত্তাই নেই। চলো টেন্টে চলো।

রামবাবু বুঝলেন এরা সব ক্লাবের কর্মকর্তা। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কর্তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে টেন্টে ঢুকিয়ে দিল।

টেন্টের ভিতরে তখন প্লেয়াররা গম্ভীর মুখে বসে কোচের উপদেশ শুনছে। রামবাবুও শুনতে লাগলেন। তবে কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি জীবনে কখনও ফুটবল খেলেননি। একটু-আধটু হাডু-ডু খেলেছেন, অল্পস্বল্প ডাংগুলি। তার বেশি কিছু নয়।

কোচ রামবাবুকে বললেন, কানাই, তুমি একদম পাংচুয়াল নও। বি সিরিয়াস। সত্যেন তোমাকে বল ঠেললে তুমি ওয়াল পাস খেলবে কালিদাসের সঙ্গে, তারপর ডায়াগোনালি...।

রামবাবু বুঝলেন না। তবে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

দুপুরে বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর বিশ্রাম।

তারপর সবাই উঠে বুটটুট পরতে লাগল। রামবাবুর খুব একটা অসুবিধে হল না। আড়চোখে অন্যেরটা দেখে দেখে তিনিও বুট এবং জার্সি পরে ফেললেন।

মাঠে নামতেই রামবাবুর বুক এবং পা কাঁপতে লাগল। চারদিকে গ্যালারি ভর্তি হাজার হাজার লোক বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে। রামবাবুর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মাঠে নেমে কী করতে হবে তা তিনি বেবাক ভুলে গেলেন।

তবে একটা ব্যাপার তাঁর জানা আছে। মাঠের শেষে ওই যে জাল লাগানো তিনটে কাঠি, ওর মধ্যে বল পাঠানোই হল আসল কাজ।

প্রথম কিছুক্ষণ রামবাবু বেমক্কা ছোটাছুটি করলেন। তারপর পায়ে একবার বল পেয়েই ছুটতে শুরু করলেন। প্রাণপণে। আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে কেউ আটকাতে পারছিল না। রামবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে আরও জোরে ছুটে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে গিয়ে তিন কাঠির সামনে হাজির হলেন এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে বলটা পাঠিয়ে দিলেন গোলের ভিতরে।

সমস্ত মাঠ হর্ষধ্বনি আর চিৎকারে ফেটে পড়ল।

রামবাবু একগাল হাসলেন। একেই বলে খেলা।

কিন্তু চেয়ে দেখলেন তাঁর দলের খেলোয়াড়রা কেমন অদ্ভুত চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। গ্যালারি থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বলছে, ও ব্যাটা ঘুষ খেয়েছে। বের করে দাও মাঠ থেকে।

রামবাবু একটু ভড়কে গেলেন। এবং খানিক বাদে বুঝতে পারলেন, গোল তিনি দিয়েছেন ঠিকই তবে নিজের দলকেই। তাঁর দেওয়া গোলে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে পড়েছে।

কোচ মাঠের মধ্যে ঢুকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, বেরিয়ে এসো।

রামবাবু বেরিয়ে এলেন। আর তারপরই পটাপট কিল, চড়চাপড়-কিল-ঘুঁসি এসে পড়তে লাগল তাঁর ওপর। কে একটা ল্যাংও যেন মারল।

রামবাবু মাটিতে পড়ে চোখ উল্টে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন।

আর তখনই বোঝা গেল, লোকটা রামবাবু। কানাই কুণ্ডু নয়।

আসল কানাই কুণ্ডু মামাবাড়ি গিয়েছিল কাঁঠাল খেতে। সবে ফিরেছে। বুটটুট পরে সে মাঠে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

পরদিন সকালে যখন দাড়ি কামাতে গেলেন রামবাবু তখন তাঁর কালো গালে জরুল ছিল না। মাথা জোড়া টাক, থলথলে শরীর। তবু রামবাবু নিজেকে দেখে বেশ খুশিই হলেন।

বাঘের দুধ

তদানীন্তনবাবুর যে বাঘের সঙ্গে দিব্যি খাতির, তা লোকে জানে। খাতির মাগনা হয়নি। একবার নাকি পাতানাতা খুঁজতে ভুটভুটের জঙ্গলে ঢুকে ভারি ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। কানাওলা নামে একরকম ভূত আছে, তারা এমনিতে ফট করে কারও সামনে আসে না কিংবা শব্দ-সাড়াও করে না। তাদের কাজ হল মানুষের মগজে ঢুকে স্রেফ তার কাপাসটাকে অকেজো করে দেওয়া। ব্যস, সেই লোক আর কিছুতেই চেনা রাস্তাও চিনতে পারবে না, নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে দশবার যাতায়াত করেও বাড়ি ঠাহর করতে পারবে না, একেবারে ভজঘট্টে ব্যাপার বাধিয়ে দেবে। তা ভুটভুটের জঙ্গলে তেমনধারা কানাওয়ালা বিস্তর ছিল। তদানীন্তনবাবু পড়লেন তারই একটার পাল্লায়। জঙ্গল থেকে আর কিছুতেই বেরোতেই পারেন না। ওদিকে অন্ধকারও নেমে এল। আর সেই আমলে ডুয়ার্স ছিল এক উদ্ভুটে জায়গা। ভূতপ্রেত দত্যিদানা তো ছিলই, আর ছিল বিস্তর বাঘ, হাতি, গন্ডার, বুনো শুয়োর, সাপখোপের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। আর কে না জানে, জঙ্গলের মধ্যে সন্ধেবেলার চেয়ে ভয়ের সময় আর নেই।

তদানীন্তনবাবু তখন ছোকরা মানুষ। সবে কবরেজিতে পসার হতে শুরু করেছে। ডাক্তার-কবরেজদের এই শুরুর দিকটাই যা বিপদের। প্রথম দিকেই দু-চারটে ভোজবাজি দেখিয়ে দিতে পারলে রুগির একেবারে গাদি লেগে যায় চেম্বারে। পসার হয়ে যাওয়ার পর রুগি মরলেও আর কেউ কিছু মনে করে না। যে-কটা ভালো হয়, সেগুলোর কথাই লোকে ফলাও করে বলে বেড়ায়। তা তদানীন্তনবাবু গোটা দুয়েক ভোজবাজি ইতিমধ্যে দেখিয়েছেনও। মহাজন রামপ্রসাদের পেটে একটা টিউমার হয়েছিল। ডাক্তার বলেছে, অস্ত্র করতে হবে। রামপ্রসাদ অস্ত্র করার নামে এমন ভয় খেয়ে গেল যে, তার নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হল। সেই টিউমার শেষে কমল তদানীন্তনের দেওয়া ওষুধে। রামপ্রসাদ খুশি হয়ে বলল, 'তোমাকে কত দিতে হবে বলো, যা চাও তা-ই দেব।' কিন্তু লোভ তদানীন্তনের ধাতেই নেই। তার ওপর গুরুর বারণ আছে, চিকিৎসা মানে লোকসেবা, লোভ করতে যেয়ো না বাপু। তদানীন্তন তাই দুটি টাকা আর ওষুধের দামটুকু নিয়েছিলেন। এতে সবাই বেশ বাহবা দিল তাঁকে।

এরপর হেড পণ্ডিতের বউয়ের ভূতে ধরার ঘটনা। সে এক বিদঘুটে ব্যাপার। পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নি রাখালরানি মহা খান্ডার। তাঁর ভয়ে বাড়ির বেড়ালটা অবধি তটস্থ। অমন যে দাপটের পণ্ডিতমশাই, যাঁর ভয়ে ছাত্ররা একেবারে ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকে, সেই পণ্ডিতমশাই রাখালরানির কথায় ওঠেন বসেন। রাখালরানিকে যে ভূতেরাও ধরার সাহস রাখে, এটাই আশ্চর্যের বিষয়। তবু ধরলো, সবাইকে অবাক করে দিয়েই ধরল। আর কী ধরা বাপ। সাঁঝবেলায় পুকুরঘাটে গা ধুতে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন অন্য মানুষ। একগলা ঘোমটা, নববধূর মতো হাবভাব, কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ ফুচফুচ করে কাঁদতে থাকেন। আবার যখন-তখন খিলখিল করে হেসে ওঠেন। অদৃশ্য সব মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। গলা ছেড়ে বিদঘুটে সব গান গাইতে লাগলেন। একদিন দিনে-দুপুরে একটা মোষের পিঠে চেপে খানিকটা ঘুরে এলেন। এইসব কাণ্ড দেখে ডাক্তার-বদ্যি ডাকা হল। তারা ফেল মারলে ডাকা হল ওঝা। রাজ্যের লোক ভেঙে পড়ল কাণ্ডটা দেখতে। ওঝা যখন হার মেনে চলে গেল, তখন তদানীন্তনবাবুর ডাক পড়ল।

তা তদানীন্তনের কপাল ভালোই বলতে হবে। খুঁজেপেতে লাগসই গাছগাছড়া পেয়ে ওষুধ বানিয়ে ফেললেন। আর তা লেগেও গেল। সাতদিনের মধ্যে রাখালরানি আবার সেই আগের মতোই খান্ডারনি হয়ে উঠলেন। তদানীন্তনের বেশ নাম হল। শুধু কে জানে কেন, পণ্ডিতমশাই বিশেষ খুশি হলেন না। কেবল বলতে লাগলেন, 'কবিরাজ না কপিরাজ, হুঁঃ, উনি আবার চিকিৎসা করবেন, লোকচরিত্রই জানে না লোকটা! কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সেই জ্ঞানই হয়নি।'

তৃতীয় যে রুগি হাতে এল, তিনি বলতে গেলে এলাকাটার রাজা। শোনা যায়, নরহরিবাবুর একসময়ে নাম হয়েছিল থরহরি বলে। তা কথাটা মিথ্যেও নয়। নরহরি প্রথম জীবনে ডাকাতি করতেন। তাঁর হাতে মেলা লোক মরেছে, মেলা লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে। যথেষ্ট টাকাপয়সা হাতে এসে যাওয়ার পর নরহরি ডাকাতি ছেড়ে ব্যবসাতে মন দিলেন, জমি-জায়গাও কিনে ফেললেন বিস্তর।

তাতে অবস্থাটা ফুলে-ফেঁপে উঠল, খুব নামডাকও হল। এখন উনি ডাকাতি করেন না বটে, কিন্তু হাতে মাথা কাটেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ।, একদিন তদানীন্তনকে ডেকে পাঠালেন দরবারে। বিশাল ঘর, ঝাড়বাতি, কিংখাব, কী নেই সেই ঘরে! তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তদানীন্তনকে বললেন, 'দ্যাখো হে বাপু, ইদানীং মনে হচ্ছে আমি কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না আমার কাছে। এত টাকাপয়সা, ধনদৌলত, আমি বুড়ো হলে ভোগ করবে কে? অ্যাঁ! বুড়ো হব মানে? এ কী ইয়ার্কি নাকি? এখনও তেমন বয়সই হল না, বুড়ো হলেই হল? তা তোমাকে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে...'

শুনে তদানীন্তন মাথা চুলকোলেন। বুড়ো হওয়াটা কোনো রোগ নয়, তবে অকালবার্ধক্য হলে অন্য কথা। তিনি যতদূর শুনেছেন, নরহরির বয়স সত্তরের ওপর, চুলে এখনও পাক ধরেনি, শরীরটাও টানটান আছে। একখানা ছোটোখাটো পাঁঠা, আস্ত কাঁঠাল বা সেরটাক রাবড়ি হাসতে হাসতে খেয়ে ফেলতে পারেন। কিলিয়ে পাথর ভাঙা নরহরির কাছে এখনও কিছু নয়। কিন্তু তা বলে তো আর জরা-বুড়ি ছাড়বে না। সে একদিন ধরবেই মানুষকে।

তদানীন্তনকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে নরহরি বললেন, 'দ্যাখো হে, রোগটা যদি সারাতে পারো তো তোমাকে আর ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। রাজা করে দেব। আর যদি না পারো তবে কী হবে, সেটা উহ্য থাক...'

তদানীন্তন বুঝলেন।

বুড়ো-হওয়া ঠেকানোর ওষুধ যে নেই, তা নয়। তবে বেশিরভাগ লোকই এটাকে রোগ বলে মনে করে না, চিকিৎসাও করাতে আসে না। আর ওষুধ জোগাড় করাও বেশ শক্ত। বাঘের দুধ, ব্রহ্মকমলের বীজ এবং আরও নানা দুষ্প্রাপ্য জিনিস লাগবে।

তদানীন্তন বললেন, 'দেখি।'

'দ্যাখো, বেশ ভালো করে দ্যাখো। এইটে তোমার অগ্নিপরীক্ষা, এই কথাটা মনে রেখেই কাজ কোরো বাপু।'

'যে আজ্ঞে।'

এটা যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি তা বুঝতে কষ্ট হল না তদানীন্তনের। ভারি চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। তবে তিনি এটাও জানেন যে, নরহরির চিকিৎসা যদি লেগে যায়, তা হলে পসারের জন্য আর ভাবতে হবে না।

ভাবতে ভাবতে তদানীন্তন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। রোজ সকালে নরহরির দুটো যমদূতের মতো পাইক সড়কি হাতে এসে হেঁড়ে গলায় হাঁক মারে, 'কই কবরেজমশাই ওষুধ জোগাড়

হল? বাবু যে হেদিয়ে পড়লেন। রোজ রাতে পনেরোখানা পরোটা খান, কাল রাতে চোদ্দোর বেশি পারেননি। যা করার তাড়াতাড়ি করুন।'

তদানীন্তন কবিরাজ অমায়িকভাবে বলেন, 'হচ্ছে বাবারা, হচ্ছে।'

তা দৌড়ঝাঁপ করে, নানা ফন্দিফিকির খাটিয়ে, কিছু কিছু জিনিস পেয়েও গেলেন তদানীন্তন। এখন বাঘের দুধটা হলেই হয়। কিন্তু সেটা কি হবে? কথাতেই আছে 'বাঘের দুধ'। অভাবে গোরু বা মোষের দুধ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হবে না।

তা সে যা-ই হোক, নানা ভাবনাচিন্তায় পড়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বেঘোরে তো অন্ধকার নেমে এল। চারদিকে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। তদানীন্তন অগত্যা একটা বেশ বড়ো গাছে উঠে পড়লেন। বিশ হাত মতো উঠে তিনটে শাখার সংযোগস্থলে দিব্যি একটা রাত কাটানোর মতো ফাঁদালো জায়গাও জুটে গেল। সেখানে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। পেটে খিদে, শরীরটার ওপর দিয়ে ধকলও গেছে কম নয়। তার ওপর কাঠপিঁপড়ে আর মশার কামড়েও জ্বালাতন হচ্ছেন।

ক্রমে রাত বেশ নিশুতি হয়ে এল। তদানীন্তনের একটু ঢুলুনি এসেছিল। হঠাৎ শুনলেন, গাছের তলায় কীসের যেন শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন কান্নাকাটি করছে বলে মনে হল। তবে মানুষ নয়।

তদানীন্তন অন্ধকারে ভালো দেখতে পাচ্ছিলেন না বলে একটু ঝুঁকলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, কে যেন তাঁর ঘাড়ে একটা ধাক্কা মেরে টালমাটাল করে দিল।

হড়াস করে তদানীন্তন গাছ থেকে পড়লেন। তবে সোজাসুজি নয়। সোজা পড়লে ঘাড় ভেঙে যেত নির্ঘাত। ডালপালায় আটকে এবং গোঁত খেয়ে খেয়ে যখন নীচে এসে পড়লেন, তখন ঘাড় না হোক হাড়পাঁজর কিছু-না-কিছু ভাঙারই কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভাঙা তো দূরের কথা, ব্যথাটুকুও টের পেলেন না তিনি।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে থেকে হঠাৎ বোঁটকা গন্ধটা পেলেন। আঁতকে উঠে দেখলেন—যা দেখলেন, তা প্রত্যয় হল না।

একটা বিশাল বাঘ। বাঘ যে এতবড়ো হয়, তা ধারণাতেই ছিল না তদানীন্তনের। লেজ থেকে মাথা অবধি বোধহয় হাত দশেক হবে। উঁচুও একটা বড়ো মোষের সমান। বাঘটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর একটা অদ্ভুত শব্দ করে গোঙানি ছাড়ছে।

এরকম অবস্থায় তদানীন্তন আর পড়েননি কখনো। শত্রুও যেন না পড়ে।

কিছুক্ষণ বিস্ময়ভরে বাঘটার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর কানে তাঁর বিবেক যেন বলে উঠল, 'তুমি না চিকিৎসক! চিকিৎসক কী রুগি বাছে? জীব কষ্ট পাচ্ছে, তোমার কাজ তুমি করো।'

তদানীন্তনের ভিতরের সুপ্ত কবিরাজটি জেগে উঠল। তিনি যন্ত্রণাকাতর বাঘটার কাছে নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, তদানীন্তন একটু চেষ্টা করতেই বাঘটার সামনের ডান পায়ের থাবার কিছু ওপরে নাড়িটাও টের পেলেন। বেশ চঞ্চল নাড়ি। বুঝতে পারলেন, বাঘটার পিত্ত কুপিত হয়েছে। বাঘটা হা হা করে হাঁফাচ্ছিল, আর জ্যোৎস্নাটাও নিশুতরাতে বেশ জোরালো হয়ে পড়েছে বলে জিভ পরীক্ষা করতেও বেগ পেতে হল না। চোখ টেনে চোখের কোলটাও পরীক্ষা করে নিলেন।

জঙ্গলে গাছগাছড়ার অভাব নেই। মোক্ষম ওষুধটি খুঁজে বের করতে কষ্টও হল না। এনে খাইয়ে দিলেন। বাঘটাও, আশ্চর্যের বিষয়, খেল।

তারপর বাঘটা একটু আরাম বোধ করে শুয়ে পড়ল। তদানীন্তন তার পিঠ চুলকে দিলেন। কানে সুড়সুড়ি দিলেন। বাঘটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

এরপর বাঘের দুধ জোগাড় করতে আর কষ্ট পেতে হয়নি তাঁকে।

লোক দেখেছে, সন্ধেবেলা বাঘটা এসে তদানীন্তনের গোয়াল-ঘরে ঢুকত, আর তদানীন্তন বালতি নিয়ে গিয়ে সের সের দুধ দুইয়ে নিতেন। লোকে বলে, সেই দুধ থেকে ছানা, দই, এমনকী ঘি অবধি তৈরি করতেন তদানীন্তন। নিজে তো খেতেনই, চড়া দামে বিক্রিও করতেন।

কিন্তু যে কথাটা বলার জন্য এই এত কথা, তা হল নরহরিকে নিয়ে।

তদানীন্তনবাবু তো বাঘের দুধ ও আর সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে বার্ধক্য ঠেকানোর ওষুধ তৈরি করলেন। তারপর গিয়ে হাজির হলেন নরহরির দরবারে।

নরহরি ওষুধের শিশিটা খুলে নাকের কাছে ধরে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এঃ বিচ্ছিরি গন্ধ। এতে কাজ হবে তো হে কবরেজ? নইলে কিন্তু...'

কাজ হল কি না, তা ঠিক বোঝা গেল না।

তবে ক-দিন বাদে একদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা। তদানীন্তন তাঁর গাছগাছড়ার খোঁজে যাচ্ছিলেন। আর ঘোড়া দাপিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নরহরি।

একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন।

'এই যে কবরেজ! কী খবর?'

তদানীন্তন তটস্থ হয়ে বললেন, 'যে আজ্ঞে। খবর ভালোই। তা আপনাকে বেশ ছোকরা ছোকরা দেখাচ্ছে কিন্তু।'

এ-কথায় হঠাৎ ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলেন নরহরি। তারপর গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'এ-কথাটা আজকাল আমাকে সবাই বলে কেন বলো তো! এ কি ইয়ার্কি নাকি?'

'আজ্ঞে না, ইয়ার্কি হবে কেন? যথার্থই বলে।'

নরহরি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'ইয়ার্কি পেয়েছ। ছোকরা দেখালেই হল? বয়স কত হয়েছে তা খেয়াল আছে? একাত্তর ছাড়িয়ে বাহাত্তরে পড়লুম, আর ছোকরা দেখাবে মানে? বয়সের গাছপাথর নেই, তা জানো? ওসব কবরেজি একদম করবে না আমার কাছে। বুড়োবয়সে বুড়ো হওয়াটাই ধর্ম, বুঝলে? ছোকরা দেখানোটা কাজের কথা নয়।'

'যে আজ্ঞে।'

'চুলে পাক ধরেছে, দেখেছ? কশের দাঁত পড়েছে, জানো? আজকাল দশখানা পরোটার বেশি খেতে পারি না, খবর রাখো?'

'আজ্ঞে না।'

'খুব কবরেজ হয়েছ! পণ্ডিত ঠিকই বলে, কবিরাজ না কপিরাজ।' এই বলে ফের ঘোড়া ছোটালেন নরহরি।

তদানীন্তন হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

ডবল পশুপতি

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালোমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তাঁর মনটা বড়ো ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা যদি কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তা হলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়। পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময়ে বেশ ভালোই ছিল। তাঁর ঠাকুরদা পুরোনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো-মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহু লোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডনবৈঠক দেন, কল-ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তাঁর বিশেষ টাকাপয়সার দরকার হয় না। তাঁর একটা ছোটো লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবু ভালোই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'এই যে পশুপতিবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন?' তখন পশুপতিবাবুর ভারি সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, 'বোধহয় ভালোই।' কিংবা, 'মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে।' অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় একটা লোক বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, 'পশুপতি আছেন নাকি? পশুবাবু?'

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু ভয়ানক চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুকডন দিতে দিতে, পশুপতিবাবু শুধু 'হুম্ হুম্, হুম্' শব্দ করতে লাগলেন।

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'ব্যায়াম করছেন? খুব ভালো।, ব্যায়ামের মতো জিনিস হয় না। হজম হয়, খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুন্ডা-বদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।'

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সি রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুকডন শেষ করে মুগুর ভাঁজতে লাগলেন। লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, 'লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনো কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না। তার ভালো দিকটাও দেখতে হবে। লোকটা স্বাস্থ্যবান, সাহসী, উদার।'

পশুপতিবাবু রাগবেন কী খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না। তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।

লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, 'তা মহেন্দ্র তবু', বলে বসল, 'ও হে নিতাই, তোমার পুরোনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালোটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না। পশুপতির আবার গুণটা কীসের? বাপ-পিতেমোর অতবড়ো বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না পেয়ে কত কত কষ্টে এখানে-সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।

পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।

লোকটা বলল, 'আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু-কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। 'ওহে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটাই দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই-পানাই করলে তো চলবে না। তিনি অল্প কথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তাঁর কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তা হলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতেই হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতিবাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন'।'

পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভুজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।

লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, 'আমি বলি কী, পশুপতিবাবু কী আর আমার প্রস্তাব ফেলতে পারবেন? তিনি তেমন লোকই নন। লোকে তাঁর বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বইকী। ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র যখন বলে বসল, 'তুমি পারবে না হে নিতাই', তখন আমিও বললুম, 'ওহে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে ভাববার সময় দিতে নেই।' তাই আমি আর দেরি করিনি। একবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা-রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমিও ফিরে যাবার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে-গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পুব-দক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।'

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, আপনাকে ভাবতে হবে না। মালপত্র ঠেলাওয়ালারাই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।'

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালোমানুষ হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। এ-লোকটা তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তাঁর হয়ে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন, বাস্তবিকই তিন-চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড়প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চা বাগানে নিরুদ্‌বেগ হুটোহুটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জলটল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?'

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল, দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন যে, মাথাটা আর ভাবতে পারছে না কিছু।

সন্ধেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলায় বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন-সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দু-জন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু-হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাববার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাঁকে দেখে নিতাই তাসের আসর থেকে একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'পশুপতি, এসে গেছ! বাঃ, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জানো, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা, দুধ-চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই তো রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল ভায়া, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।'

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁ-হাঁ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল। ভারি শান্তিতে ছিলেন এতদিন। এবার না নিজের ভিটে থেকে বাস তুলতে হয়।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড়োমেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তারপর মেজোছেলে এসে দেশলাই ধার নিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।

পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারি অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।

'কাজটা কী ঠিক করলে পশুপতি-ভায়া?'

পশুপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, কোন কাজের কথা হচ্ছে। নিতাই মাথা নেড়ে বলল, 'ভাড়া না হয় আরও দশ টাকা বাড়িয়েই দিচ্ছি। তা কথাটা তো মুখে বললেই পারতে। বাথরুমের দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লাথি মারার কোনো দরকার ছিল কী? কাজটা কী ঠিক হল হে পশুপতি?'

পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, 'আর খুব আস্তেও মারোনি। আমার কাঁকালে বেশ লেগেছে। যা হোক, ওই ষাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।'

পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।

পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

'বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কী বলুন তো। ঢের-ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুড়ছিলেন? তাও ছোটোখাটো ঢিল নয়, অ্যাত বড়ো বড়ো পাথর। তার দু-খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাচের গেলাস ভেঙেছে। একটা ঢেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে? আপনি কী পাগল না পাজি?'

পশুপতি একবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।

নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, 'আমিও দুর্গা-দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফের ঢির মারলে আমিও দেখে নেব।'

পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খেয়ে নেবেন দুপুরবেলাটায়।

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

পশুপতি কাছে যেতেই নিতাই কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'গায়ের জোর থাকলেই কী গুন্ডামি করতে হবে ভাই?'

পশুপতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

নিতাই বলল, 'না হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েই ছিল। তাস নিয়ে বসলে ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোঁটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর চড়াও হওয়াটা কী ঠিক? তাস খেলা তুমি যে পছন্দ করো না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হত।'

পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।

নিতাই ধরা গলায় বলল, 'আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাসুড়েরা সব বসে ছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায়, তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তা ছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজোছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের মতোই ভাইয়ের কানটা শুধু ছিঁড়ে নিতে বাকি রেখেছ, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ করো না তা তো আর বেচারা জানত না।'

একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি আর দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, 'বাবা রে, মেরে ফেললে।' আর একজন বলে উঠল, 'এসব ঠিক কাজ হচ্ছে?' আর একজন, 'ও কী, পড়ে যাব যে খাট থেকে!' আর একজন, 'আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ও মা!' সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, 'ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আর জীবনে এ-মুখো হব না।'

পশুপতি ভাবতে ভাবতেই খেলেন, ঘুমোলেন।

সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে।

পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোনো কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।

আতাপুরের দৈত্য

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আতাপুরের হরি সামন্ত কুটিবাড়ির জঙ্গলে সেদিন যাকে দেখলেন তাকে দেখার কথাই নয়। কারণ, রাক্ষস-খোক্কস বা দৈত্য-দানব দুনিয়াতে আছে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। হরি সামন্তর বয়স একাশি, ডান হাঁটুতে বাত, হার্টেরও একটু গোলমাল আছে। কুটিবাড়ির জঙ্গল ডানহাতে রেখে পালপাড়ার শিবপদ সরখেলের বাড়িমুখো যাচ্ছিলেন। সরখেল মস্ত হোমিয়োপ্যাথ, তাঁর চেম্বারেই বিকেলে একটা আড্ডা বসে। দিব্যি ফুরফুরে শরতের বিকেল, চারদিকে নরম রোদ ঝলমল করছে।

চোখের ভুল নয়, হরি সামন্ত ডান পাশে মুখ ঘোরাতেই দেখেন, একটা শিমুল গাছের ডালে হাত রেখে কে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটার মাথা দোতলার সমান উঁচুতে। হাত, পা, বুক, পেট সমেত অন্তত দশটা দশাসই জোয়ানকে যোগ করলে যা হয় তার মাপ। পরনে একটা লেংটির মতো জিনিস, আদুর গা। হরি সামন্ত হাঁ করে চেয়ে দেখলেন। এদিকে কোথাও ভীম পুজো হয় বলে তিনি জানেন না, তা হলে জঙ্গলে এই ভীমের মূর্তি ফেলে রেখে গেল কে? ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, মূর্তি নয়। প্রকাণ্ড লোকটা হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে কটমট করে তাকাল। তদ্দণ্ডেই হরি সামন্তর নাড়ি ছাড়বার কথা। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা একটা ডিগবাজি খেল, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল, শরীর কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে। দৈত্যটা হঠাৎ মড়াত করে গাছের একটা মস্ত ডাল ভেঙে সেটা মুগুরের মতো বাগিয়ে ধরতেই হরি সামন্ত পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলেন প্রাণের ভয়ে। এই বয়সে পায়ে বাত আর দুর্বল হৃৎপিণ্ড নিয়ে যে তিনি এরকম ছুটতে পারেন তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল।

যখন সরখেলের বাড়িতে এসে দমাস করে পড়লেন তখনই প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বেরোল না। একটু জিরিয়ে নিয়ে দেখলেন, এখনও মরেননি। তবে তাঁর কথা আড্ডার কেউই বিশ্বাস করল না। শিবপদ বলে ফেলল, সেই কবে থেকে তো আপনাকে চোখের ছানিটা কাটিয়ে আনতে বলছি, কথা কানেই তুলছেন না।'

হরি সামন্ত খ্যাঁক করে উঠলেন, 'আমার বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু ডান চোখ কী দোষ করল?'

কেউ বিশ্বাস না করলেও ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা হল। তবে সাব্যস্ত কিছুই হল না। কুটিবাড়ির জঙ্গল মোটেই ভালো জায়গা নয়। জঙ্গলের ওপাশে একটা খাল আছে। সুন্দরবনের বাঘ খাল পেরিয়ে ওই জঙ্গলে এসে ঘাপটি মেরে থাকে। সুযোগ বুঝে গাঁয়ে ঢুকে গোরু, ছাগল, মানুষ নিয়ে যায়। ফেরার সময়ে আজ আর কেউ জঙ্গলের পাশের রাস্তা ধরলেন না। দল বেঁধে বাজারের পথ ধরে ফিরলেন।

দিনতিনেক বাদেই সকালবেলায় তিনজন কাঠকুড়ানি মেয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিল। হঠাৎ আলুথালু হয়ে তারা চেঁচাতে চেঁচাতে গাঁয়ে এসে ঢুকল, 'রাক্ষস! রাক্ষস! মেরে ফেলল গো...।'

দু-দিনের মধ্যেই গাঁয়ের মোড়ল শ্যামকান্ত তার হারানো গোরু খুঁজতে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে দাঁতকপাটি লেগে পড়ে রইল। জ্ঞান হওয়ার পর সেও কবুল করল, জঙ্গলে সে একটা বিকট চেহারার দানবকে দেখেছে।

আতাপুরে হইহই পড়ে গেল।

ঘনঘন মিটিং বসতে লাগল। শ্যামপুকুর থানা থেকে দারোগাবাবু গদাধর মল্লিক খবর পেয়ে নিজে এসে তদন্তে নামলেন। পুলিশ ফোর্স নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে খানিকটা ঘুরেও দেখলেন। দানবের দেখা না পেলেও জঙ্গলের নরম মাটিতে কিছু অতিকায় পায়ের ছাপ দেখা গেল। মানুষের পায়ের ছাপের মতোই দেখতে, কিন্তু বিশাল আকৃতির।

গদাধরবাবুর ভ্রূ কুঁচকে গেল, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। বললেন, 'কোনো লোক যদি রসিকতা করে এ কাণ্ড না করে থাকে তবে বলতেই হবে যে, ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। আমি গ্রামের নিরাপত্তার জন্য দু-জন সেপাই মোতায়েন করে যাচ্ছি। ব্যাপারটা আরও খতিয়ে দেখতে হবে।'

সেই রাত্তিরে দুই সেপাই যদু আর লক্ষ্মণ চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে মশা তাড়াতে তাড়াতে গল্প করছিল। হঠাৎ যদু বলে উঠল, 'আচ্ছা লক্ষ্মণদা, ওই গম্বুজটা হঠাৎ একটু নড়ে উঠল কেন বলো তো। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?'

'গম্বুজ। দূর ব্যাটা এখানে গম্বুজ কোথায়?'

'তা হলে ওটা কী?'

বলা বাহুল্য এর পর দু-জনেরই বাক্য হরে গেল। গম্বুজ নয়, তবে গম্বুজের মতোই বিশাল একটা ছায়ামূর্তি রায়দিঘির ধার দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এল। একটা কুঁড়েঘরের কাছে এসে মূর্তিটা হাঁটু গেড়ে বসে রইল খানিকক্ষণ।

কাঁপা গলায় যদু বলল, 'লক্ষ্মণদা, দেখতে পাচ্ছ!'

'পাচ্ছি।'

'ভুল দেখছি না তো!'

'না রে।'

'কী করবে এখন?'

'কিচ্ছুটি নয়। চুপ মেরে বসে থাকো। ওই কুঁড়েঘরটায় একটা বুড়ি থাকে। বোধহয় বুড়িটাকে খাবে।'

'ও বাবা!'

দৈত্য কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে একটু চেয়ে দেখল। একটা থামের আড়াল থেকে ঘাপটি মেরে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে ভয়ে হিম হয়ে যাচ্ছিল দুই সেপাই। দৈত্যটা অবশ্য দেখতে পেল না। যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে ছিল দু-জন। এবার লক্ষ্মণ বলল, 'চল রে যদু, বুড়ির কী হল একবার দেখে আসি।'

'চলো, যাই।'

দরজায় বেশ কয়েকবার ধাক্কাধাক্কি আর ডাকাডাকির পর বুড়ি উঠে দরজা খুলে বলল, 'কে বাবারা? ডাকাত হও, চোর হও, আগেই বলছি, এ-বাড়িতে কিছু পাবে না। ইচ্ছে হলে ঢুকে তল্লাশি নিতে পারো। আর যদি আমাকে খুনটুন করতে চাও তো বাছা তাতেও কেউ বাধা দেবে না। আমি বড়ো দুঃখী মানুষ, মরতে পারলেই বাঁচি।'

যদু বলল, 'বুড়িমা, আমরা বদ লোক নই। আমরা সেপাই, ওই রাক্ষসটা তোমার ঘরের কাছেই ঘাপটি মেরে ছিল যে একটু আগে।'

বুড়ি বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে বলল, 'তা হবে বাছা। পোড়া কপাল আমার, নইলে আমাকে খেয়ে যেত। তা তোমরা কারা? এ গাঁয়ে তো তোমাদের কখনো দেখিনি।'

'আমরা পুলিশের লোক, রাত জেগে গাঁ পাহারা দিচ্ছি।'

বুড়ি খুবই ভালোমানুষ। যত্ন করে তাদের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসাল। কয়েকটা করে নাড়ু আর জল খেতে দিল। কথায় কথায় জানা গেল, বুড়ির তিন কুলে কেউ নেই। অন্ধের নড়ি একটা ছেলে ছিল, সেও বছর দুই হল নিরুদ্দেশ। লোকে বলে, তাকে বাঘে খেয়েছে। তাই হবে। সে-সময়ে এখানে খুব বাঘের উপদ্রব ছিল বটে!

পরদিন সকালে সারা গাঁয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, দৈত্যটা গাঁয়ে ঢুকেছিল শুনে। গাঁয়ের বিস্তর লোক পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে কেউ মামার বাড়ি, কেউ শ্বশুরবাড়ি, কেউ পিসি বা মাসির বাড়ি, কেউ-বা তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ল। এই বিপদের মধ্যে থাকা ঠিক নয়। দুপুরের মধ্যেই গাঁ বেশ সুনসান হয়ে গেল। যারা রয়ে গেল তারা সব ঘরদোর মজবুত করার কাজে লেগে গেল। লাঠি, বল্লম, ছোরা, কুড়ুল, বন্দুক, যার যা ছিল সব বের করল। ঠিক হল রাতে দল বেঁধে গাঁয়ে টহল দেওয়া হবে। ঘণ্টা, শাঁখ, বাঁশি ইত্যাদিও তৈরি রাখা হল, দৈত্যটাকে যে দেখবে সে-ই বাজিয়ে অন্য সবাইকে জানান দেবে।

এর পর দিনকয়েক আর দানবটার কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। লোকজনের আতঙ্কটাও একটু চাপা পড়তে লাগল। রাতের পাহারাতেও ঢিলেমি দেখা যেতে লাগল। শীত পড়তে লেগেছে, এখন কারই বা রাত জাগতে ভালো লাগে?

বুড়ি এক রাত্তিরে তার ময়লা কাঁথাখানি জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। নিশুত রাতে বুড়ি একটা গলা শুনতে পেল, 'ও মা, মা গো! ঘুমোচ্ছিস নাকি? আমার যে বড়ো খিদে পেয়েছে!'

বুড়ি ধড়মড় করে উঠে বসল। এ যে তার নন্দর গলা। তার ছেলে নন্দ, যাকে কিনা বাঘে খেয়েছে। বুড়ি আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলল। তারপর হাঁ হয়ে রইল। নন্দ নয়, এ সেই দানবটা, যার কথা সবাই বলাবালি করে।

বুড়ি অবশ্য ভয় পেল না, এ দুনিয়ায় তার ভয় পাওয়ার আর কিছুই নেই। বুড়ি নরম গলায় বলল, 'তুমিই বুঝি সেই রাক্ষস! তা ভালো। কী চাও বাছা?'

দানব হাঁটু গেড়ে বসে আছে, তাতেও তার মাথা ঘরের চাল ছুঁয়েছে। দৈত্য বলল, 'মা, আমাকে চিনতে পারছিস না তো! দোষ নেই তোর। আমি নন্দ।'

'নন্দ!' বলে বুড়ি ফের হাঁ, 'তুই যে রোগা প্যাকাটির মতো ছিলি বাবা।'

'আর বলিসনে মা। রোগা থেকে মোটা হতে গিয়েই তো বিপদ হল। কিছু খেতে দিবি মা। সাতদিন ধরে জঙ্গলের ফলপাকড় খেয়ে আছি, ভয়ে গাঁয়ে ঢুকতে পারি না।'

'আয়, বাবা, আয়।' বলতে বলতে বুড়ি আনন্দে কেঁদেই ফেলল। দানব হোক, দৈত্য হোক, শত হলেও এই তো তার হারানো ছেলে। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'বাবা, লোকে দেখতে পেলে তোকে মারবে। তুই ভেতরের উঠোনে চলে যা। উঠোনের পেছনদিকে বড়ো কসাড় ঝোপ আছে। তার আড়ালে বসে থাক। আমি খেতে দিচ্ছি।'

কসাড় ঝোপের আড়ালে নিশুত রাতে মায়েপোয়ে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হল। নন্দ বলল, কুটিবাড়ির জঙ্গলে একজন অদ্ভুত লোক থানা গেড়েছিল। গাছপাতা দিয়ে নানারকম ওষুধ-বিষুধ তৈরি করত। তার কাছে মোটা হওয়ার ওষুধ চাইতে গিয়েছিল নন্দ। লোকটা তাকে কুটিবাড়ির আস্তানায় রেখে দিল আর রোজ ওষুধ খাওয়াতে লাগল। ফলে ধীরে ধীরে

আড়ে দীর্ঘে বাড়তে লাগল নন্দ। বাড় যখন খুব বাড়াবাড়িতে দাঁড়িয়ে গেল, তখনই লোকটা একদিন দুপুরে জঙ্গলে শেকড় খুঁজতে গিয়ে বাঘের খপ্পরে পড়ল। দু-দিন বাদে তার আধখাওয়া শরীরটা খালধারে দেখেছিল নন্দ। যতদিন লোকটা বেঁচে ছিল ততদিন একটা ভরসা ছিল তার। লোকটা কথা দিয়েছিল, চিকিৎসা করে তাকে আবার স্বাভাবিক গঠনে ফিরিয়ে আনবে। চেষ্টাও করেছিল। আর হল না। মাসখানেক আগে লোকটা মারা যাওয়ার পর নন্দ আর জঙ্গলে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না। আজকাল তার মায়ের কথাও খুব মনে হয়।

বুড়ি ঘরে যা ছিল—পান্তা ভাত, নাড়ু, মোয়া, এক হাঁড়ি গুড়, খানিকটা চাল ভাজা—এই সব নিয়ে ছেলেকে খেতে দিল। নন্দ বলল, 'আমার শরীরটা বড়ো বলে যেন ভাবিসনে যে আমি অনেক খাই। আমার পেটটা আগের মতোই আছে। তবে খোরাকটা একটু বেড়েছে।'

বুড়ি ছেলের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। বলল, 'গাঁয়ের লোকেরা তোকে দেখে ভয় পাবে ঠিকই প্রথমটায়, কিন্তু আমি ওদের বুঝিয়ে বলব'খন যে, এ-আমার নন্দ।'

নন্দ মাথা নেড়ে বলল, 'ও কাজ করিসনি। ওরা বিশ্বাস করবে না, তোকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারবে।'

'তা হলে?'

'উপায় একটা করতে হবে। দাঁড়া, ভেবে দেখি। কী কুক্ষণে যে মোটা হওয়ার সাধ হয়েছিল!'

এইসব কথা যখন হচ্ছে তখন হঠাৎ একটা টর্চের আলো এসে নন্দর মুখের ওপর পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার। তার পরই সারা গাঁয়ে কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ, ঢোল, খোল, সব বেজে উঠল। আর লোকজন সব তেড়ে এল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

নন্দ পালাতে গিয়েও পালাল না। মা-র দিকে চেয়ে বলল, 'আমার গায়ে খুব জোর। আমি এদের সবাইকে ছিঁড়ে ফেলতে পারি। জঙ্গলে আমি চার-পাঁচবার বাঘের মুখে পড়ি। আমার কিল খেয়েই বাঘ পালিয়ে গেছে। তিনবার সাপে কামড়েছে। এত বড়ো শরীর বলে বিষে কাজ হয়নি তেমন। আমার ক্ষমতা অনেক, কিন্তু এরা যদি তোর কোনো অনিষ্ট না করে, তাহলে আমিও এদের ক্ষতি করতে চাই না মা।'

ও দিকে চারদিক থেকে মশাল, টর্চ নিয়ে মেলা লোক আসছে। বিরাট হইহই কাণ্ড। বুড়ির বাড়ির চারিদিকে যখন সবাই জড়ো হল তখন বুড়ি বেরিয়ে এসে মোড়লমশাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, 'খুব তো তেজ দেখছি, দৈত্য যদি তাড়া করে, তা হলে পালাতে পথ পাবে?'

মোড়লমশাই একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা সে দৈত্যটা কোথায়! এখানেই নাকি দেখা গেছে।'

বুড়ি বলল, 'এখানেই আছে বাছা। তবে বেশি হইচই করলে সে কিন্তু তোমাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।'

মোড়লমশাই ভয় খেয়ে বলল, 'ওরে বাবা, তা সে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে? রেগেটেগে যাচ্ছে না তো!'

বুড়ি মাথা নেড়ে বলে, 'চিন্তা নেই গো। আমি মায়ের কাছে মন্ত্র শিখেছিলুম ছেলেবেলায়। সেই মন্ত্রে নাকি রাক্ষসও বশ থাকে। এতকাল বিশ্বাস করিনি। তা হঠাৎ এই দানবটা এসে হাজির হওয়ায় মন্ত্রটা জপ করতেই বশ মেনেছে। তবে আগেই বলে রাখছি বাছা, তোমরা যদি তার ক্ষতি করতে চাও তা হলে কিন্তু মন্ত্র তুলে নেব।'

সবাই ভয় পেয়ে সমস্বরে বলে উঠল, 'না না, আমরা কোনো ক্ষতি করব না।'

মোড়ল গলাটা একটু খাটো করে বলল, 'দূর থেকে একঝলক একটু দেখতে পাব কি?'

বুড়ি বলল, 'তা পাবে। তবে লাঠিসোঁটা অস্ত্রশস্ত্র সব ফেলে দিয়ে এসো।'

মশাল আর টর্চের আলোয় কসাড় বনের মধ্যে একটু আবছায়ায় দানবকে দেখে গাঁ-সুদ্ধ লোক একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভয়ে সকলের হাত-পা ঠান্ডা। বুড়ি অভয় দিয়ে বলল, 'গোলমাল করো না কেউ। ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যাও। এটি এখন আমার কাছেই থাকবে।'

সবাই ফিরে গেল। কিন্তু কয়েক দিন সাংঘাতিক উত্তেজনা রইল গ্রামে। চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। ফলে দৈত্য দেখতে ভিড়ও হতে লাগল খুব।

নন্দ এক রাতে মাকে বলল, 'মা, এ তো বড়ো মুশকিল হল। এত লোক আমাকে দেখতে আসে, আমার যে লজ্জা করে বড়ো।'

বুড়ি বলল, 'লোকে দেখে বলে লজ্জা কীসের? যারা বড়োমানুষ হয় তাদের দিকে সকলের নজর থাকে।'

নন্দ কাহিল গলায় বলল, 'কিন্তু আমি তো বড়োমানুষ নই রে মা। আমি হলাম অদ্ভুত মানুষ। মানুষ বলে লোকে মনেই করছে না।'

বুড়ি বলে, 'অত ভাবিসনে, সময় একটু বয়ে যাক। লোকে সয়ে নেবে।'

সয়ে অবশ্য লোকে নিল না। তবে মহালক্ষ্মী সার্কাসে ভালো চাকরি পেয়ে গেল নন্দ। দু-হাতে পয়সা রোজগার করে দোতলা বাড়ি বানিয়ে ফেলল গাঁয়ে। মাকে বিছেহার গড়িয়ে দিল। খাট-পালঙ্ক কিনল। জমি-জিরেত কিনল, তার চেয়ে বড়ো কথা, নন্দর নামটাও খুব ছড়িয়ে পড়ল চারধারে।

গঙ্গারামের রাগ

গঙ্গারামের সবই ভাল, শুধু রেগে গেলে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আর না রাগলে গঙ্গারামের মতো মানুষ দুটো খুঁজে পাওয়া ভার। নিজের রাগকে ভালই জানে গঙ্গারাম, তাই সবাইকে সাবধানও করে দেয়, 'যা করো, তা করো ভাই, আমাকে রাগিয়ে দিয়ো না। তা হলেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে ভাই।'

সবাই তাই একটু সাবধানেই থাকে। গঙ্গারামকে কেউ পারতপক্ষে রাগিয়ে দেয় না।

গঙ্গারাম টের পায়, তার রাগটা প্রথমে শুরু হয় হাঁটুর কাছ থেকে। কেমন যেন টনটনিয়ে ওঠে প্রথমে, তারপর সেটা এক লাফে উঠে আসে কোমরে। যেখানে কিছুক্ষণ ঘাপটি মেরে থেকে ঝাঁ করে শিরদাঁড়া ধরে একেবারে বানরের মতো লাফিয়ে আসে ঘাড়ে। সেখানে একটু জিরোয়। তারপর এক লম্ফে মাথায় উঠে যায়। আর তখনই সর্বনাশ।

প্রতিবেশী রমেশবাবু লোক সুবিধের নয়। ঝগড়া-কাজিয়ায় খুব পারদর্শী। মামলা-মোকদ্দমায় খুব ঝোঁক। তা তিনি গেল বছর বাগানের বেড়া নতুন করে বাঁধতে গঙ্গারামের জমির মধ্যে দু'হাত পরিমাণ ঢুকিয়ে বেড়া দিলেন, বললেন, 'জমিটা আসলে আমারই ছিল, দলিলেও আছে।'

গঙ্গারাম একথা শুনেই টের পেল তার হাঁটু টনটন করছে। সে বলল, 'রমেশবাবু, আপনি বয়সে বড়, আপনার সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া চাইছি না। মাপ করুন, আমাকে রাগিয়ে দেবেন না কিন্তু।'

রমেশবাবু খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'তোমার রাগের তোয়াক্কা করিনা হ্যা।'

গঙ্গারামের রাগ তখন হাঁটু ছেড়ে কোমরে উঠল। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'রমেশবাবু, আমার কিন্তু রাগ কোমর অবধি এসে গেছে।'

রমেশবাবু গঙ্গারামের রাগের কথা মোটেই জানেন বলে মনে হল না। তিনি একটু মাথা উঁচু করে বললেন, 'যাও যাও, রাগ দেখাতে এসেছ!'

গঙ্গারমের রাগ তখন কোমর ছেড়ে শিরদাঁড়া ধরে ফেলেছে এবং দিব্যি বাঁই বাঁই করে ওপরে উঠছে। ভাগ্য ভাল ঠিক এই সময়ে রমেশবাবুর বাড়ির কাজের মেয়েটা একটা প্লেট ভেঙে ফেলায় সেখানে তুমুল চেঁচামেচি লেগে গেল এবং রমেশবাবু তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

গঙ্গারামের রাগ ঘাড়ে বসে কিছুক্ষণ ল্যাজ দুলিয়ে ফের গুটি গুটি নেমে গেল। গঙ্গারাম হাঁফ ছেড়ে বলল, 'যাক অল্পের জন্য রমেশবাবুর ফাঁড়াটা কেটে গেল দেখছি।'

সেদিন বাজারে এক মাছওয়ালা গঙ্গারামের পছন্দ করা আটখানা কই মাছ তার নাকের ডগা দিয়েই আর একজন শাঁসালো খদ্দেরকে দু'টাকা বেশি দরে বেচে দিল। গঙ্গারামকে গ্রাহ্যই করল না। গঙ্গারাম মাছওলাকে খুব শান্তভাবে বলল, 'এটা কি ভাল হল যতীন?'

যতীন বেশ ডাঁটের সঙ্গে বলল, 'উনি কে জানেন? সাবজজ, সাবজজকে না দিয়ে আপনাকে দেব নাকি?'

গঙ্গারাম তখনই টের পেল, হাঁটু ছেড়ে তার রাগ কোমরে উঠে পড়েছে। সে বলল, 'কিন্তু এটা কি অভদ্রতা নয়? না হয় দু'টাকা আমি বেশিই দিতুম।'

'আপনি।' বলে হাঃ হাঃ করে বাজারসুদ্ধু লোককে শুনিয়ে যতীন হেসে উঠল। বলল, 'আপনি দেবেন বেশি? দরদার না করে একদিনও মাছ কিনেছেন জীবনে? বড় মানুষেরা দরাদরির ধারই ধারে না।'

গঙ্গারমের রাগ তখন ঘাড়ে উঠে মাথার দিকে লাফ দেবে কিনা ভাবছে। গঙ্গারাম ঘাড় চেপে ধরে যতীনকে বলল, 'ঠিক আছে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমাকে রাগিয়ে দিয়ো না। রাগলেই কিন্তু সর্বনাশ।'

যতীন ফের উচ্চকণ্ঠে বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে উঠল। গঙ্গারামের রাগ তখন আর সামলাতে না পেরে, হনুমানের মতো লঙ্কার দিকে লাফ দিয়ে ফেলেছে, লঙ্কাকাণ্ড বাঁধতে বাকি নেই। গঙ্গারাম আর তিলেক না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি চলে এল আলুওয়ালার কাছে। মনে মনে বলল, খুব বেঁচে গেল যতীন।

দুর্গাপুজোর চাঁদা চাইতে এসে কয়েকটা ছেলে বেশ চোখ রাঙিয়েই বলল, 'আপনার নামে পাঁচশো টাকা চাঁদা ধরা হয়েছে। কম করেই ধরেছি।'

গঙ্গারাম যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গেই বলল, 'আমি পাঁচশো টাকা দিতে পারব না।'

ছেলেগুলো বেশ গরম খেয়ে বলল, 'দেবেন না মানে? এ পাড়ায় বাস করতে হবে না আপনাকে?'

গঙ্গারামের রাগ তখন হাঁটু কামড়ে ধরল, গঙ্গারাম অত্যন্ত ভদ্র গলায় বলল, 'দেখো ভাই, আর যাই করো আমাকে রাগিয়ে দিয়ো না। রাগলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র ঘটে যাবে।'

ছেলেগুলো পেছপা না হয়ে আরও যেন বুক চিতিয়ে বলল, 'ওসব রাগফাগ অন্য জায়গায় দেখাবেন। ভাল চান তো পাঁচশো টাকা ফেলে দিন, চলে যাচ্ছি। এখন অসুবিধে থাকলে পরে আসতে পারি। কিন্তু কনসেশন হবে না, আগেই বলে দিচ্ছি।'

ছেলেগুলো চলে গেল। না গেলে খুবই বিপদ ছিল। নিজের রাগকে ভাল করে চেনেন বলেই গঙ্গারাম আর বেগড়বাই না করে ওই পাঁচশো টাকাই চাঁদা দিয়ে দিল। টাকাটা গেল যাক, রক্তারক্তিটা তো হল না।

সেদিন অফিসে বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়ে তার কাজে একটা ভুল দেখিয়ে বললেন, 'এরকম ইডিয়টের মতো কাজ করলে কী করে চলবে বলুন তো?'

গঙ্গারামের রাগ ওই 'ইডিয়ট' শুনেই হাঁটুটা কুকুরের মতো কামড়ে ধরল। বলল, 'স্যার, আর এগোবেন না। খারাপ হয়ে যাবে।'

বড় সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনি একটা আস্ত স্টুপিড।'

গঙ্গারাম গম্ভীর হয়ে বলে, 'স্টুপিড অবধি ঠিক আছে। কিন্তু আর এগোলে ভয়ানক বিপদ হয়ে যাবে।'

বড় সাহেব উঠে দরজা দেখিয়ে বললেন, 'গেট আউট। গেট আউট। আপনার মুখ দেখলে পাপ হয়।'

গঙ্গারাম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বড় সাহেবকে বাঁচানোর জন্যই। রাগটা একটু হলেই মাথায় চড়ে বসেছিল আর কী।

সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটা ঘটল এক রাতে। চারজন ডাকাত গঙ্গারামের সদর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে লন্ডভন্ড কাণ্ড শুরু করল। বাড়ির লোকের চেঁচামেচিতে উত্তেজিত গঙ্গারাম। ডাকাত দেখে গম্ভীর হয়ে বলল, 'লাশ পড়ে যাবে কিন্তু। খুব সাবধান।

ডাকাতরা তাকে একটা রদ্দা মেরে বলল, 'একদম কথা নয়। কথা বললে—— ফেলব।'

গঙ্গারামের রাগটা তখন কোমর থেকে ঘাড়ে উঠছে। গঙ্গারাম অত্যন্ত রাগী গলায় বলল, 'নিজের কবর নিজেরাই খুঁড়ছ! আমার রাগ কিন্তু ঘাড়ে চড়ে এল বলে। রাগলে আমি মানুষ থাকি না তা জানো?'

ডাকাতরা গঙ্গারামকে বিড়বিড় করতে দেখে গ্রাহ্যই করল না। ট্রাংক, বাক্স, আলমারি সব ভাঙচুর করতে লাগল।

গঙ্গারামের রাগ তখন ঘাড়ে উঠে জিরিয়ে নিচ্ছে। হাঁটু থেকে ঘাড় অবধি আসা কম ধকল নয়। এবার লাফ দেওয়ার জন্য ইতিউতি চাইছে।

গঙ্গারাম গলাখাঁকারি দিয়ে ডাকাতদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা তো দেখছি খুবই বিপদে পড়বে। আমার রাগ যে মাথায় উঠে গেছে প্রায়।'

ডাকাতরা রে রে করে তেড়ে এসে গঙ্গারামকে আরও গোটা দুই রদ্দা কষিয়ে বলল, 'আহম্মক! মরতে চাস?'

গঙ্গারামের রাগ তখন ঘাড় ছেড়ে মাথায় উঠে গেছে। তারপর মাথা জুড়ে রঙিন ফুলঝুরি ছড়িয়ে পড়ল। গঙ্গারাম মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে বলল, 'কাজটা কি ভাল করলে তোমরা?'

ডাকাতরা ফের গঙ্গারামকে রদ্দা মারতে এসেছিল, কিন্তু যা ঘটল তা নিরীহ ভিতু রোগা-ভোগা গঙ্গারামের কাছ থেকে তারা আশাই করেনি। চারটে ডাকাত কিছু বুঝে ওঠার আগেই কে কোথায় ছিটকে পড়ল, ঠিক যেন ঘূর্ণিঝড় এসে তাদের উড়িয়ে দিল। চারটে ডাকাত ঘাড় লটকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল ঘরের মেঝেয়।

গঙ্গারামের বাড়ির লোকেরা ঘটনাটা চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। গঙ্গারাম তার রাগের কথা বলে বটে, কিন্তু কোনওদিন রাগটা দেখেনি তারা!

তারা গঙ্গারামকে ঘিরে ধরল, পাড়া-প্রতিবেশীরা এল, ক্লাবের সেই চাঁদাওলা ছোকরারাও এল, সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল গঙ্গারামের দিকে। এ যে সাংঘাতিক লোক।

এরপর থেকে গঙ্গারামের রাগ উঠলেই লোকে সাবধান হয়ে যায়। অনেকে আবার জিজ্ঞেসও করে, 'রাগটা কতদূর উঠল গঙ্গাবাবু? হাঁটুতে না মাথায়, না ঘাড়ে?'

গঙ্গারামের খাতির বেড়ে গেছে।

বাজি ও কুকুর

বাজির শব্দে কুকুরটা ভয় পেয়ে খাটের তলায় ঢুকেছে। আর সেখান থেকেই পরিত্রাহি আর্তনাদ করে যাচ্ছে। একটানা একঘেয়ে, স্নায়ুবিদারক। ডিউক খুবই ভাল জাতের অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কখনও কাঁদে না বা ডাক ছেড়ে চেঁচায় না। ধমক শোনে, আদর সোহাগ বোঝে। কিন্তু কালীপুজোর দিন তার সব শিক্ষাদীক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে সে রাস্তার কুকুরের মতোই চেঁচায়।

রণেন অনেকবার চেষ্টা করেছেন ডিউককে ঠান্ডা করতে, অন্তত চুপ করিয়ে রাখতে। পারেননি। এখন কুকুরের চিৎকারে তাঁর স্নায়ু বিকল হওয়ার যোগাড়।

ডিউকের সঙ্গে রণেনের তেমন মাখামাখি নেই। গৃহপালিত পশুপাখি তাঁর পছন্দ নয়। ছেলেবেলায় আদরের কুকুর, বেড়াল ও পাখির মৃত্যু কয়েকবার দেখেছেন, পোষা খরগোশ তাঁর কোলেই মরে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি আর পশুপাখি পোষেননি।

ডিউককে কোন এক কুকুর-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এনেছিল তাঁর ছেলে লুকু। এনেছিল তাঁর জন্যই। বছর দেড়েক আগে রণেনের স্ত্রী রত্নাবতী আকস্মিকভাবে মারা যান। রণেন যে খুব ভেঙে পড়েছিলেন তা নয়। তবে একটু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। লুকু ধরে নিয়েছিল, তিনি পত্নীশোকে ভেঙে পড়েছেন। নানাভাবে রত্নাবতীর শূন্যস্থান পূরণের একটা অক্ষম চেষ্টা লুকু করেছে। কাজটা সে ছেলে বলেই করেছে। কিন্তু ফলটা ভাল হয়নি। রত্নাবতী মারা যাওয়ার পর তাঁকে পুরী এবং ভুবনেশ্বর ঘুরিয়ে এনেছিল লুকু এবং তার জন্য নিজের বউ সুমিতার কাছে যথেষ্ট কটু কথা শুনেছে। আদিখ্যেতা আজকালকার মেয়েরা পছন্দ করে না। তার ওপর এই কুকুর। লুকুর ধারণা, কুকুরটা সঙ্গী হিসেবে থাকলে রণেনের মনটা একটু ভাল থাকবে। তবু লুকু পাছে দুঃখ পায় সেই ভেবে তিনি প্রথম প্রথম জোর করে কুকুরটাকে একটু একটু লাই দিতেন। তারপর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। আসলে বুড়ো বয়সে একটাই অভাব থাকে। কথা বলার লোক থাকে না। আর বুকে বুকে একগাদা কথা জমে থাকে কাউকে বলবার জন্য। যেমন ছিল তার নাতি জয়। কিছু বুঝত না, কিন্তু শুনত। বলতও অজস্র। ঠিক যেমন বন্ধুরা হয় আর কি!

একদিন লুকুকে তিনি বলে ফেলেছিলেন, জয়টা যদি কাছে থাকত তবে বেশ হত।

লুকু অবাক হয়ে বলল, সেটা কী করে সম্ভব?

রণেন জানেন, সম্ভব নয়। তাঁর একমাত্র নাতি জয়কে বছরখানেক হল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে যে ভর্তি করা হয়েছে। ওরকম নামী স্কুলে ভর্তি করা গেছে সেইটাই লোকে সৌভাগ্য বলে মানবে। সুতরাং তাকে আর কাছে পাওয়ার আশা করা বৃথা। তবে স্কুল বন্ধ থাকলে আসে। এখন যেমন এসেছে। তবে সেই আগের জয় আর নেই। এক বছরের মধ্যেই কেমন একটু সাবালক এবং ভারিক্কি হয়েছে। দাদু-দাদু এখনও করে বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু কেজো মানুষ হয়ে গেছে, সেই আঁকড়ে আবদেরে ভাবটা আর নেই।

ঘাড়ে দীর্ঘদিনের স্পন্ডেলাইটিসের ব্যথা। তবু নিচু হয়ে চৌকির তলায় কুকুরটাকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন রণেন। গলা তুলে কেঁ-উ কেঁ-উ করে ডাকছে। সন্ধে থেকে ডাকছে বলে গলাটা কি একটু ভাঙা ভাঙা?

বাড়িতে রণেন আর রান্নাবান্নার লোকটি ছাড়া কেউ নেই। শমিতাদের বাড়ি বাগবাজারে বিরাট কালীপুজো হয়। অনেক টাকার বাজি পোড়ে, গোটাকয়েক পাঁঠাবলি হয়। ওরা আজ ওখানেই থাকবে। তবে লুকু ফিরে আসতে পারে। সেইরকম বলে গেছে।

শিবু। শিবু। আবার ডাকলেন রণেন। এ পর্যন্ত বহুবার ডেকেছেন। শিবু ফ্ল্যাটে বা আশেপাশে নেই। রান্নাঘর খোলা পড়ে আছে, বাতি জ্বলছে। পনেরো-ষোলো বছরের ছেলেকে আজকের রাতের অন্যমনস্কতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। দশতলার ছাদে বাজি পোড়ানো হচ্ছে, একতলায় পুজো। তারই কোথাও গিয়ে সেঁটে আছে। ডাল ভাত তরকারি ঝোল সব ওবেলাই রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাতে শুধু গরম করে দেবে। রণেন রাত দশটা সাড়ে-দশটার আগে খান না। সুতরাং শিবু নিশ্চিন্ত।

রণেনের ফ্ল্যাটটা বেশ বড়ই। দেড়হাজার স্কোয়ার ফুট। সস্তাগণ্ডার সময়েও সোয়া লাখ দাম পড়েছিল। এখন হেসে খেলে ছ-সাত লাখ টাকা। রত্নাবতীর নামেই আছে। এই ফ্ল্যাটে রণেনের নিজস্ব একখানা ঘর আছে। সবচেয়ে ছোটো ঘরখানাই তিনি বেছে নিয়েছেন। সেই ঘরে জিনিসপত্র বলতে গেলে কিছুই নেই। খরচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনকেও সঙ্কুচিত করে ফেলেছেন তিনি। জামাকাপড়ের ওয়ার্ডরোব এক সময়ে উপচে পড়ত। আজকাল একজোড়া হাওয়াই আর একজোড়া বেরোনোর চপ্পল! বারোটা লাইটার ছিল। সিগারেট ছেড়েছেন তিন বছর আগে। এখন একটাও লাইটার নেই। বক্স খাটটা ছেলেকে দিয়ে একখানা সাধারণ চৌকি পেতে নিয়েছেন ঘরে। আর একখানা ইজিচেয়ার। ছোট্ট একটা টেবিল। রণেনের বিষয়-সম্পত্তি বলতে এইটুকুই। তবে বইপত্র কিছু আছে, কিছু সাময়িক পত্রিকা। এগুলোই তার অবসরের সঙ্গী।

কাচের শার্সি সবই বন্ধ। তবু বীভৎস লাগাতার বাজির শব্দ ঠেকানো যাচ্ছে না। এরকম ছেদহীনভাবে বাজি পোড়াতে হলে কত টাকা খরচ হতে পারে তা রণেন ভেবে পান না। তার ওপর এই শব্দ সহ্য করার জন্য শক্ত নার্ভও চাই। বাজির শব্দের সঙ্গে ডিউকের চিৎকার রণেনকে যেন খান খান করে ভেঙে ফেলেছে।

অন্য সব ঘরের দরজা বন্ধ এবং চাবি দেওয়া। কেন কে জানে, ওরা কোথাও বেরোলে ঘরগুলো সব বন্ধ করে রেখে যায়। শুধু বসার ঘর আর রান্নাঘর খোলা থাকে। রণেনের জন্য কোনও ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই, বসার ঘর ছাড়া। কিন্তু বসার ঘরটা গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রিল দেওয়া বারান্দায়। সেখানে কোনও কাচের শার্সি নেই। এই সাংঘাতিক, প্রাণঘাতী বাজির শব্দ সেখানে আটকানো যাবে না। আর তিনি গেলে ডিউকও তাঁকে অনুসরণ করবেই।

অসহায়ভাবে রণেন ইজিচেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিন খুলে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিতরটা এমন কাঁপছে, এত অস্থির লাগছে যে, উঠে পড়তে হল।

ঘাড়ের ব্যথা নিয়েই আবার নিচু হলেন। ডিউক। ডিউক!

ডিউক ফিরে তাকাল এবং বলল, কী বলছ?

রণেন ছিটকে পড়লেন মেঝেয়। মাথাটা ঝিমঝিম করল। আজকাল বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরল! না কি স্বপ্ন দেখছেন?

বাঁ কনুইতে একটু চোট পেলেন। তবে তেমন কিছু নয়। ফের উঠলেন রণেন। সভয়ে নিচু হয়ে ডিউকের দিকে চাইলেন। ডিউক দু' থাবার মধ্যে মাথা রেখে কেঁউ কেঁউ করে

ডিউক!

তখন থেকে কেন যে ডাকছো! আমি বেরোবো না যাও।

বুকটা ধক করে উঠেই যেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেল। তবে ফের চলল। ধড়াস ধড়াস করে। একটু শ্বাসকষ্টও হতে লাগল রণেনের।

সাবধানে আবার ডাকলেন, ডিউক।

তখন থেকে কেন যে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ! কী চাও বলো তো!

অবিশ্বাস্য। সম্পূর্ণ ভৌতিক! অলৌকিক! তবু রণেন এবার নিজেকে শক্ত রাখলেন। কাঁপা গলায় বললেন, তুই কি কথা বলতে পারিস!

পারি। তবে এখন কাঁদছি। কাঁদতে দাও।

কাঁদছিস কেন?

আমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়েছে।

পূর্বজন্ম? ওরকম কিছু সত্যিই আছে নাকি?

আছে। না থাকলে মনে পড়বে কেন?

পূর্বজন্মে তুই কি ছিলি? কুকুরই তো!

না। তবে কুকুরের অধম। বারোটা ছেলেপুলে ছিল। না খেয়ে খেয়ে, রোগে ভুগে চোখের সামনে মরেছে। দুটোকে চোর বলে পিটিয়ে মারে। একজন জেল খাটত। সে বেঁচে আছে কিনা জানি না। রাস্তার কুকুরের মতো এঁটোকাঁটা খুঁটে খেতুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, কুকুরের মতোই যদি বেঁচে আছি তবে কুকুরই করলে না কেন? সেই প্রার্থনা ভগবান বোধহয় শুনেছেন। বাজির শব্দে মাথাটা কেমন টলমল করছিল, হঠাৎ সব মনে পড়ল।

এ জন্মে তোর কেমন লাগছে?

সুখে আছি, বেশ সুখে। আগের জন্মের চেয়ে ঢের ভাল। মাংসের সুরুয়া খাই, গমের খিচুড়ি, সাত তলায় বাস, সুখের বাকি কী? শুনলাম তোমার ছেলে আমাকে সাত'শ টাকায় কিনেছে। শুনে ভারী আনন্দ হল। আমার এত দাম হবে ভাবিনি কখনো।

চুপ, চুপ। অত টাকায় তোকে কেনা হয়েছে তা খবরদার বলিসনি। তাহলে লুকুকে তার বউ বকবে।

জানি লুকু কমিয়ে বলেছে। সত্তর টাকা। তাইতেও বাপান্ত হচ্ছে। কিন্তু কার জন্য কেনা হল সে তো পাত্তা দিচ্ছে না।

তুই মাদী নাকী?

তাও জানো না! আচ্ছা লোক বাপু!

তোর নাম যে ডিউক।

সে যদি তোমরা নাম দাও তাতে আমার কী করার আছে?

আগের জন্মে মদ্দা ছিলি?

না, মাদীই। বললুম না রাস্তার কুকুরের মতো জীবন ছিল।

খুব কষ্ট ছিল তোর!

এখনও আছে। বড় কষ্ট। এখন যাও ইজিচেয়ারে বসে থাকো গে, আমি একটু কাঁদি। কাঁদ ডিউক।

রণেন ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। একাই একটু হাসলেন তিনি। খুশিই লাগছে মনটা। কথা বলার মতো একজনকে পাওয়া গেল এতদিনে। সময়টা কেটে যাবে।

শক্তি পরীক্ষা

রামরিখ পালোয়ান রাজবাড়ি চলেছে। সেখানে আজ বিরাট শক্তি পরীক্ষা। নানা দেশ থেকে বহু পালোয়ান জড়ো হবে। তারপর কার কত শক্তি তার পরীক্ষা দিতে হবে। কুস্তিটুস্তি নয়, শুধু যে যতটা পারে নিজের শক্তি দেখাবে, তা যে যেভাবে পারে।

রামরিখ ভেবেচিন্তে একটা পাঁচ মন ওজনের লোহার গদা নিয়েছে। এইটে সে বাঁইবাঁই করে ঘুরিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। গদাটা একটা গরুর গাড়িতে করে পিছনে আসছে।

রামরিখ আজ ধুতি পরেছে। গায়ে রঙিন জামা, মাথায় পাগড়ি। মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিতে দিতে নাগরা জুতোর শব্দ তুলে হাঁটছে। মনে একটু স্ফূর্তি। তার ধারণা, আজকের পরীক্ষায় সে-ই আসর মাত করে আসবে। ওস্তাদকে একশো মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজবাড়ি আর বেশি দূরে নয়। দুখানা গ্রাম পেরোলেই শহর। শহরের মাঝখানে মস্ত রাজবাড়ি। চারদিকে বিশাল অঙ্গন। আজ হাজার হাজার মানুষ পালোয়ানদের দেখতে আসবে।

সামনেই একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। গরুর গাড়িতে একটা বড়সড় চেহারার লোক বসে বসে ঢুলছে। রামরিখ দেখতে পেল, গরুর গাড়িটা রাস্তায় একটা খাদে পড়ে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আটকে গেছে। বলদ দুটো টেনে তুলতে পারছে না। যে-লোকটা ঢুলছিল সে একটু বিরক্ত হয়ে নেমে পড়ল। মালকোঁচা মারছে।

রামরিখ কাঁধ দিয়ে একটা চাড় মেরে গরুর গাড়িটা খাদ থেকে তুলে দিয়ে বলল, সামান্য কাজ।

মোটাসোটা লোকটা তার দিকে চেয়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে বলল, পালোয়ান নাকি তুমি?

ওই সামান্য কিছু চর্চা করি আর কি।

বেশ বেশ। বলে লোকটা একটু হাসল, তা তোমার জিনিসপত্র কই।

ওই যে, গরুর গাড়িতে। পাঁচ মন ওজনের গদা।

লোকটা অবাক হয়ে বলে, পাঁচ মন? যাঃ।

কথা কইতে কইতে পিছনের গরুর গাড়িটা কাছে চলে এল। রামরিখ গদাটা দেখিয়ে বলল, ওই যে।

লোকটা গদাটা দেখে বলল, এটা ফাঁপা জিনিস নয় তো!

রামরিখ হেসে বলল, আরে না, নিরেট লোহার গদা।

হতেই পারে না। বলে লোকটা গদাটা তুলে নিয়ে হাতে নাচিয়ে একটু দেখে নিয়ে হঠাৎ নিজের হাঁটু তুলে গদাটা তার ওপর রেখে দু-হাতের চাড় দিয়ে মচাৎ করে গদাটা দু-আধখানা করে ভেঙে ফেলল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, নাঃ, নিরেট জিনিসই বটে হে।

রামরিখ হাঁ করে চেয়ে রইল। লোহার গদা কেউ ভাঙতে পারে, এ তার জানা ছিল না।

লোকটা মুখে একটু দুঃখ প্রকাশ করে বলল, সামনের গাঁয়েই কামারশালা আছে, জুড়ে নিয়ো ভাই। অসাবধানে তোমার খেলনাটা ভেঙে ফেলেছি। বলে লোকটা চলে গেল।

রামরিখ গদাটা কামারশালায় জুড়ে নিতে গাঁয়ে ঢুকল। একটু চিন্তিত। মনে আর তত স্ফূর্তি নেই।

কামার ভীষণ ব্যস্ত। বলল, আমার যে গদা জোড়া দেওয়ার সময় নেই।

রামরিখ করুণ গলায় বলল, ভাই, আমি যে রাজবাড়ির শক্তি পরীক্ষায় যাচ্ছি। সময় নেই, একটু করে দাও ভাই।

কামার খুবই বিরক্ত হয়ে বলল, কোথায় তোমার গদা?

এই যে। বলে গদার টুকরো দুটো দু-হাতে তুলে বলল, এইটুকু গদা। বলে কামারশালার আর এক কোণে অন্তত একশো হাত দূরে যেখানে তার ছোট ছেলেটি কাজ করছিল সেদিকে ছুড়ে দিতে দিতে বলল, ওরে বিশে, এ দুটো টুকরো জুড়ে দে তো।

বিশে একটা টুকরো বাঁ-হাতে, অন্যটা ডান হাতে লুফে নিয়ে বলল, দিই বাবা।

রামরিখ অধোবদন হয়ে বসে রইল। গদা জুড়ে নিয়ে রামরিখ ফের যখন রওনা হল, তখন তার পা চলছে না। মনটা বড়ই খারাপ।

আর একটা গাঁ পেরোলেই শহর। রাস্তার পাশে কতকগুলো ছেলে ডাংগুলি খেলছিল। কী কারণে তাদের মধ্যে একটু বিবাদ হয়েছে। হঠাৎ একটা ছেলে ছুটে এসে বলল, মশাই, আপনার ডাণ্ডাটা একটু ধার দেবেন? আমরা এই পার্টিটা খেলেই দিয়ে দেব। আমাদের ডাণ্ডাটা ভেঙে গেল কিনা এইমাত্র।

বলেই ছেলেটা গদাটা গরুর গাড়ির ওপর থেকে তুলে নিয়েই ছুট। রামরিখ দাঁড়িয়ে দেখল, ছেলেটা তার গদা দিয়ে গুটি তুলল, তারপর সেই গুটি সত্তর হাত দূরে পাঠাল। গদা দিয়ে এক হাতে দূরত্বটা মাপল। তারপর দৌড়ে এসে ফের গরুর গাড়িতে গদাটা রেখে ছুটে চলে গেল।

রামরিক আর এগোল না। গরুর গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফেরত যেতে লাগল।

ঘুড়ি ও দৈববাণী

অঘোরবাবু নিরীহ মানুষ। বড়ই রোগা-ভোগা। তাঁর হার্ট খারাপ, মাজায় সায়াটিকার ব্যথা, পেটে এগারো রকমের অসুখ। অফিসে তাঁর উন্নতি হয় না। কেউ পাত্তা দেয় না তাঁকে।

অঘোরবাবু ঘুড়ি ওড়াতে খুবই ভালোবাসেন। তাঁর শখ-শৌখিনতা বলতে ওই একটাই। ঘুড়ি তিনি নিজেই তৈরি করেন। মস্ত মস্ত ঘুড়ি। মোটা সুতো আর মস্ত লাটাই দিয়ে অনেক ওপরে ঘুড়ি ভাসিয়ে দেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাটাই ধরে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকেন।

সেদিন একটা কাণ্ড হল। বিকেলবেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘুড়ি ওড়ানোর পর অন্ধকার হয়ে আসায় লাটাই গুটিয়ে যখন ঘুড়িটা ছাদ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন তখন মনে হল, ঘুড়ির গায়ে একটা কিছু যেন লেখা আছে। ঘরে এসে আলো জ্বেলে দেখলেন, সাদা ঘুড়িতে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা, আগামী সতেরো তারিখে আপনার মৃত্যু হবে, যদি না একখানা আস্ত গায়ে-মাখা সাবান খেয়ে ফেলেন।

অঘোরবাবু ঘোরতর অবাক। প্রায় আধ কিলোমিটার ওপরে উড়ন্ত ঘুড়ির গায়ে এই বিদকুটে কথাটা লিখল কে? ভৌতিক কাণ্ড নাকি? মহা ভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। পাশের বাড়িতেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পরঞ্জয় প্রামাণিক থাকেন। অঘোরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ডেকে ঘুড়ির গায়ে লেখাটা দেখিয়ে বললেন, এটা কি করে সম্ভব হল?

পরঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে সাবানটা খেও না, সাবান খেলে পেট খারাপ হয়। মনে হচ্ছে কেউ রসিকতা করেছে।

অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু আকাশের অত ওপরে কোনও রসিকের তো থাকার কথা নয়। রসিকদের কি আজকাল ডানা গজাচ্ছে?

পরঞ্জয় এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অঘোরবাবু হিসেব করে দেখলেন সতেরো তারিখের আর মোটে সাত দিন বাকি। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাথরুমে গিয়ে একখানা গায়ে-মাখা সাবান অত্যন্ত কষ্ট করে খেয়ে ফেললেন। সাবান যে খেতে এত বিচ্ছিরি তা তাঁর জানা ছিল না।

পরঞ্জয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরদিন অঘোরবাবু পেটের গোলমালে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। দু'দিন লাগল বিছানা ছেড়ে উঠতে। বিকেলে তিনি আবার ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে উঠলেন। এবং যথারীতি লাটাই গোটানোর পর দেখলেন ঘুড়ির গায়ে লেখা রয়েছে, আগামী সতেরো তারিখে আপনি মারা যাবেন, যদি না কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলে দেন।

কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, সে হল এ পাড়ার কুখ্যাত গুন্ডা। তার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। গায়ে যেমন জোর তেমনি বদমেজাজ। অঘোরবাবু ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এই অনৈসর্গিক আদেশ অমান্য করতেও তাঁর সাহস হচ্ছে না। সতেরো তারিখের আর দেরিও নেই। আজ চোদ্দ তারিখ।

সন্ধের পর তিনি সোজা গিয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হলেন। কৃষ্ণ কুণ্ডু তখন একটা মস্ত বড় ছোরা ধার দিচ্ছিল। তাঁকে দেখে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, কী চাই?

অঘোরবাবু কাঁপতে কাঁপতে সামনে গিয়ে আচমকা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাঁ কানটা মলে দিয়েই দৌড় লাগালেন।

কিন্তু দৌড়ে পারবেন কেন? কৃষ্ণ কুণ্ডু ছুটে এসে ক্যাঁক করে তাঁর ঘাড়টা ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে উঠোনে এনে ফেলল। তারপর মুগুরের মতো দু'খানা হাতে গদাম গদাম করে ঘুঁসি মারতে লাগল। তিনি ঘুঁসি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ায় পিঠের ওপর একেবারে তবলা লহরার মতো কিল-চড়-ঘুঁসি পড়তে লাগল। জীবনে এরকম সাঙ্ঘাতিক মার কখনও খাননি অঘোরবাবু। যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীরের একটি হাড়ও আস্ত নেই। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন। কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

ফের দু'দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হল। তারপর অঘোরবাবু ফের একদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ালেন। আজও ঘুড়ি নামিয়ে দেখলেন তাতে লেখা, সতেরো তারিখে মৃত্যু অবধারিত, যদি না বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালতে পারেন।

বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার আদেশের চেয়ে মৃত্যুদণ্ডই বোধহয় ভাল। কারণ, অঘোরবাবুর অফিসের বড় সাহেব খোদ আমেরিকার রাঙামুখো সাহেব। যেমন রাশভারী, তেমনি শৃংখলাপরায়ণ। পান থেকে চুন খসতে দেন না। তাছাড়া বড় সাহেবের নাগাল পাওয়াও কঠিন। আলাদা ঘরে বসেন, বাইরে আর্দালিরা পাহারা থাকে।

কিন্তু ঘুড়ির আদেশ অমান্য করতে সাহস হল না তাঁর। দোকান থেকে দৈ আনিয়ে গেলাসভর্তি ঘোল তৈরি করে একটা ফ্লাস্কে ভরে অফিসে গেলেন অঘোরবাবু। খুবই অন্যমনস্ক, বুকটা দুরদুর করছে। বড়বাবুকে গিয়ে একবার বললেন, বড় সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, ব্যবস্থা করে দেবেন?

বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিচ্ছো কেন? বড় সাহেব কি হেঁজিপেঁজির সঙ্গে দেখা করেন? আর করেই লাভ কী? সাহেবের আমেরিকান ইংরিজি কি তুমি বুঝবে? বুকনি শুনলে ভড়কে যাবে যে!

বেজার মুখে ফিরে এলেন বটে অঘোরবাবু, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। টিফিনের সময় ফাঁক বুঝে বেরিয়ে করিডোর ঘুরে সোজা বড় খাস সাহেবের কামরার সামনে হাজির হলেন। দেখলেন বড় সাহেবের ঘর থেকে কয়েকটা লালমুখো সাহেব বেরিয়ে আসছে। আর্দালি দুটো তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

অঘোরবাবু সুট করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। বিশাল চেহারার বড় সাহেব মন দিয়ে একটা কাজ করছিলেন। মাথায় মস্ত গোলাপী রঙের টাক। অঘোরবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বাবু?

অঘোরবাবু ফ্লাস্কটা খুলে সাহেবের মাথায় হড়হড় করে ঘোলটা ঢেলে দিলেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায় নেমে একটা বাসে উঠে পড়লেন।

চাকরি তো যাবেই, পুলিশেও ধরতে পারে। তা হোক, তবু অনৈসর্গিক ওই আদেশ লঙ্ঘন করেনই বা কি করে?

সতেরো তারিখ এগিয়ে আসছে। আগামী কালই সতেরো তারিখ। বিকেলে অঘোরবাবু ফের ঘুড়ি ওড়ালেন। অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে নানা কথা ভাবছিলেন। বুকটাও দুরদুর করছে। তারপর ধীরে ধীরে লাটাই গোটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুড়িটা নেমে এল। ঘুড়িটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা, আগামী সতেরো তারিখে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি না এক্ষুনি তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন।

অঘোরবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। তিনতলা থেকে লাফ দিলে যে মৃত্যুর জন্য আর সতেরো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু করেনই বা কী? ঘুড়ি মারফৎ দৈববাণীই হচ্ছে বলে তাঁর স্থির প্রত্যয় হয়েছে, দৈববাণীর আদেশ না মানলে যদি ভগবান চটে যান?

অঘোরবাবু চোখ বুজে ভগবানকে স্মরণ করলেন। শেষবারের মতো চারদিকটা জল-ভরা চোখে একবার দেখে নিলেন। এইসব কাজে বেশি দেরি করতে নেই। দেরি করলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দ্বিধা আসে। অঘোরবাবু ধুতির কোঁচা এঁটে ছাদের রেলিঙের ওপর উঠে দুর্গা বলে নীচে লাফিয়ে পড়লেন।

পড়ে মাজার ব্যথায়, ঘাড়ের ঝনঝনিতে, কনুইয়ে খটাং-এর, মাথার কটাং-এ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে মূর্ছা গেলেন। পাড়ার লোক, বাড়ির লোক সব দৌড়ে এল, কান্নাকাটি পড়ে গেল। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। প্রায় পনেরো দিন সেখানে পড়ে থাকতে হল। তারপর বাড়িতে এনে ফের কিছুদিন চিকিৎসা চলল তাঁর। পারিবারিক ডাক্তার অভয়বাবু তাঁর বন্ধুও বটে। অভয়বাবু কয়েকদিন ধরে নানারকম পরীক্ষা করার পর একদিন বললেন, বুঝলে অঘোর, একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।

অঘোরবাবু ভয় খেয়ে বললেন, কী ঘটেছে ভাই?

তোমার হার্ট একদম ভাল হয়ে গেছে।

সে কী! কী করে হল?

ওই যে কেষ্ট গুন্ডার কাছে মার খেয়েছিলে, মনে হচ্ছে সেই শক থেরাপিতেই হার্টটা ঠিকঠাক চলতে শুরু করেছে। হার্টের একটা ভালভ্ কাজই করছিল না। এখন করছে। আরও একটা ব্যাপার!

আবার কী?

তোমার পেটে এগারো রকমের অসুখ ছিল। এখন একটাও নেই।

বলো কি হে!

হ্যাঁ। ওই যে সাবান খেয়েছিলে, ওর ঠেলাতেই পেটের সব রোগ-জীবাণু বেরিয়ে গেছে। এখন লোহা খেলেও তোমার হজম হবে। আরও একটা ব্যাপার।

অঘোরবাবু অবাকের পর আরও অবাক হয়ে বললেন, আরও?

হ্যাঁ। তোমার সায়াটিকা সেরে গেছে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, ওই যে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিলে তারই চোটে সায়াটিকা উধাও হয়ে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার। হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

কিন্তু সব হলেও চাকরিটা তো আর থাকছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অঘোরবাবুর খুব দুঃখ হয়। দিব্যি বাঁধা চাকরি ছিল। বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার পর আর কোনও আশা নেই।

অঘোরবাবু যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, একটু পায়চারি-টায়চারি করতে পারছেন তখন একদিন সকালবেলা তাঁর বাড়ির সামনে মস্ত একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে লালমুখো বিশাল সাহেব নেমে এল। অঘোরবাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু অল্পবয়সী সাহেবটা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমন আনন্দ করতে লাগল যে সেই ভীম আলিঙ্গনে অঘোবাবুর প্রাণ যায় আর কি।

তারপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে সাহেব বলল, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না। যাকগে, আপাতত তোমাকে তিনগুণ প্রমোশন দিয়ে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

করে নিচ্ছি। তোমার দু'হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়িও দেওয়া হবে।

অঘোরবাবু স্বপ্ন দেখছেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখলেন, জেগেই আছেন। তাহলে এসব কী হচ্ছে?

সাহেব নিজে থেকেই বলল, তোমার মতো গুণী মানুষ দেখিনি। টাক নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। টাকের জন্য কত ওষুধ খেয়েছি, কত চিকিৎসা করেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু তুমি সেদিন আমার মাথায় কী একটা ওষুধ ঢেলে দিয়ে এলে, এই দেখ এখন আমার মাথায় সোনালি চুল।

তাই বটে। ইনি তো বড় সাহেবই বটে। মাথাভর্তি চুল হওয়ায় এতক্ষণ চিনতে পারেননি অঘোরবাবু। গদগদ হয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।

হরিমতির বাগান

বিপিনবাবুর বউ হরিমতির খুব শখ ছিল একখানা বাগানওলা বাড়ি করবেন। কিন্তু কলকাতায় জমির যা দাম, তাতে বাগানওলা বাড়ি করার মাটি ছাপোষা বিপিনবাবুর নেই। মফস্‌সলে গেলে হয়তো হয়, কিন্তু হরিমতি আবার শহরতলি পছন্দ করেন না, কলকাতার বাইরে যাওয়ার কথায় তিনি বেঁকে বসলেন, বললেন, 'ও বাবা, কলকাতার বাইরে গেলে গড়িয়াহাটে বাজার করব কী করে?'

যাই হোক, শেষ অবধি একটা আপসরফা হল। নাকতলায় তিনতলার ওপর একখানা মাঝারি মাপের ফ্ল্যাট ধারকর্জ করে কিনে ফেললেন বিপিনবাবু।

হরিমতি ফ্ল্যাট দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এ তো বাক্স গো! গাছপালা না থাকলে আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসে।'

বিপিনবাবু খুবই নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ। বললেন, 'আপাতত ফ্ল্যাটেই থাকো, কোনোদিন অবস্থার উন্নতি হলে বাগানওলা বাড়ি করা যাবে।'

হরিমতি বললেন, 'আচ্ছা, আজকাল তো ঘরের মধ্যেই কিছু কিছু গাছপালা করা যায় বলে শুনেছি, কী করে করা যায় তার বইও আছে, এনে দেবে একখানা?'

বিপিনবাবু খুঁজেপেতে 'ঘরের মধ্যে চাষ' বলে একখানা বই পেয়ে কিনে আনলেন।

কয়েকদিন কিছু বোঝা গেল না, দিনসাতেক পরে একদিন অফিস থেকে ফিরে বিপিনবাবু দেখলেন, তাঁর স্ত্রী হরিমতি আর দশ বছরের ছেলে রাহুল আর আট বছরের মেয়ে পুঁচকি বাইরের ঘরের একধারে মেঝের ওপর স্তূপাকার মাটি বিছিয়ে মাটির ওপর ঘাসের চাপড়া বসাচ্ছে।

বিপিনবাবু আঁতকে উঠে বললেন, 'এ কী? বৈঠকখানা যে নোংরা হয়ে গেল?'

হরিমতি হেসে বললেন, 'নোংরা হবে কেন? ঘাসের চাপড়া ঠিকমতো বসাই, তারপর দেখো, ঘরটাকে লন বলে মনে হবে।'

বিপিনবাবু নিরীহ মানুষ, অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী।'

বাস্তবিকই দিন দুই পরে বৈঠকখানাটা একেবারে লন বলেই মনে হতে লাগল, সোফাসেট বিদেয় করে দিয়েছেন হরিমতি, অতিথিরা নাকি এসে ঘাসের ওপর বসবেন, সেটা অভিনব একটা ব্যাপারও হবে।

বিপিনবাবুর অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলতে পারেন না, হরিমতি চটলে কুরুক্ষেত্র হবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, লনের চারদিকে নানা বাহারি ফুলগাছের চারা বসে গেছে। দেওয়ালের একধারে একটা টবের ভেতর থেকে একটা লতানে গাছ দেওয়াল বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে।

বিপিনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন বটে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না।

হরিমতি খুব অহংকার করে বললেন, 'জানো তো, আজকাল অনেকেই আমার ঘরের বাগান দেখতে আসছে।'

'তাই নাকি?' বলে বিপিনবাবু খুব আহ্লাদ প্রকাশের চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু হাসিটা যেন মুখ ভ্যাংচানোর মতো হয়ে গেল।

অফিসের কাজে দিনকয়েকের জন্য একটু কলকাতার বাইরে যেতে হল বিপিনবাবুকে। দিন-কুড়ি বাদে এক সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বৈঠকখানাতে ঢুকতে যেতেই মাথায় একটা পেল্লায় গুঁতো খেয়ে 'বাপ রে!' বলে আর্তনাদ করে উঠলেন।

হরিমতি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ইস, আর একটু হলেই চালকুমড়োটা বোঁটা ছিঁড়ে পড়ে যেত।'

'চালকুমড়ো!' বলে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বিপিনবাবুর চোখ বাস্তবিকই ছানাবড়া হল, ঘরের মধ্যে অতি স্তিমিত আলোয় তিনি ঝুলন্ত চালকুমড়োটা দেখতে পেলেন এবং সেটা গাছ থেকেই ঝুলছে। তারপর আরও যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ে বসে পড়ার কথা! দেখলেন, নানা লতাপাতা দেওয়াল বেয়ে উঠে ঘরের লাইট ঢেকে ফেলেছে। ফ্যান থেকেও ঝুলছে লতাপাতা।

না, বিপিনবাবু প্রতিবাদ করলেন না, করে লাভ নেই।

শোওয়ার ঘরে ঢুকেও তাঁর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। সেখানেও বড়ো বড়ো টব এবং মেঝের ওপর মাটি ফেলে গাছপালার চর্চা শুরু হয়েছে। অনাবশ্যক আসবাবপত্র বিদেয় করে দেওয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ, এখনও খাট আর তার ওপর বিছানা আছে।

মাসখানেকের মধ্যেই ব্যালকনি থেকে লাউ-কুমড়ো, শসা আর ঝিঙের গাছ নীচে নামতে এবং ওপরে উঠতে শুরু করল। সন্ধের পর ঘরে রজনীগন্ধা এবং গোলাপের গন্ধ ম' ম' করতে লাগল, জানালাগুলো সম্পূর্ণ ঢেকে গেল নানা গাছপালায়।

সকাল থেকে পাড়াপ্রতিবেশীদের এবং তাদের সূত্রে আরও দর্শনার্থীদের ভিড় জমে যায় ফ্ল্যাটের সামনে। না, তবে বলে তারা হুড়মুড় করে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়তে পারে না। হরিমতি একজন বা দু-জন করে দর্শনার্থীকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে দেন এবং নিজে সব ঘুরিয়ে দেখান। রীতিমতো গাইডেড ট্যুর।

বিপিনবাবুর অস্বস্তি বাড়ছে।

এক রাতে পাশ ফিরে পাশবালিশ বলে যা আঁকড়ে ধরলেন, পরে দেখা গেল, সেটি একটি জাম্বো লাউ।

আজকাল ফ্ল্যাটবাড়ির কেউ কেউ এসে নগদ দামে সবজি কিনে নিয়ে যায়। তাতে হরিমতির হাতে দুটো পয়সা আসতে শুরু করেছে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে ফ্ল্যাটবাড়ির ভেতরে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়াটা বেশ দুর্গম হয়ে উঠল, ঝোপঝাড় ঠেলে উঠছে, কোথাও কোথাও বেশ বুকসমান উঁচু গাছপালা, বাইরে থেকে পাখিটাখি ঢুকে দিব্যি বাসা বানিয়ে ফেলছে গাছপালার মধ্যে। পুঁচকি আর রাহুলের পড়াশোনার বারোটা বাজার জোগাড়, কারণ তাদের পড়ার টেবিলের ওপর কাঁকরোল, করলা ইত্যাদি ফলে আছে। বইয়ের র‍্যাকে পুঁইডগা বাইছে। দিনে-রাতে ঘরের মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। লাইট জ্বাললেও আলো হয় না, কারণ আলো গাছপালায় ঢাকা পড়ে গেছে।

বিপিনবাবু একদিন খুব সাহস সঞ্চয় করে হরিমতিকে বললেন, 'কাজটা কি ঠিক হচ্ছে?'

হরিমতি অতি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, 'ওগো, সরকার থেকে আমাকে প্রাইজ দেবে। কাল সকালেই মন্ত্রী আসছেন আমার বাগান দেখতে।'

তা বাস্তবিকই মন্ত্রী এলেন, সঙ্গে বিশাল আমলা ও পুলিশবাহিনী। ঘরের ভেতর ঢুকে চারদিকে টর্চ মেরে দেখে মন্ত্রী মুগ্ধ। তারপরই টিভির লোকজন এসে ছবি তুলল, হরিমতির

ইন্টারভিউ নিল। সেদিনই বিকেলে রবীন্দ্রসদনে হরিমতিকে 'কাননরানি' উপাধিতে ভূষিত করে একটা রুপোর কাপ দিলেন মন্ত্রী।

বিপিনবাবু খুশি হবেন, না দুঃখিত হবেন বুঝতে না পেরে অবশেষে খুশি হবেন বলেই ঠিক করলেন। পরের 'সেশনে' ছেলে রাহুলকে একটা আশ্রমিক স্কুলের হস্টেলে আর মেয়েকে সারদেশ্বরী আশ্রমে দিয়ে দিলেন।

বিপিনবাবু আর হরিমতি ভালোই আছেন। তাঁদের ফ্ল্যাটবাড়িটাকে লোকে 'হরিমতির সবজি বাজার' বলে অভিহিত করে। ফ্ল্যাটবাড়ির মধ্যে বিপিনবাবুর সঙ্গে হরিমতির মাঝে মাঝে দেখাও হয়ে যায়। কখনো ঝিঙে মাচানের তলায়, কখনো গোলাপঝাড়ের পাশে, কখনো লঙ্কাখেতে। বিপিনবাবুর কিছু একটা বলতে ইচ্ছে যায় হরিমতিকে, বলি বলি করেও বলেন না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাছপালার মধ্যে গা-ঢাকা দেন।

একদিন মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যাওয়ার জন্য খাট থেকে নামতে গিয়ে একটা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনে সাঁত করে পা টেনে নিলেন বিপিনবাবু। সাপ নয় তো! টর্চটা জ্বেলে একটা কালোমতো লেজের অংশ যেন দেখতেও পেলেন ঘাসজঙ্গলে।

তারপর একদিন হঠাৎ রাত বারোটায় পাশের ঘরে একটা হুক্কা হুয়া শব্দ পেয়ে উঠে বসলেন বিপিনবাবু। ব্যাপারটা কী? শেয়াল ডাকছে নাকি?

মাসদুয়েক বাদে নিশুতিরাতে একটা গর্জনের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন বিপিনবাবু। বুকটা ধকধক করছে। কীসের ডাক? জেগে উঠে আবার নির্ভুল ডাকটা শুনতে পেলেন, ঘরের জঙ্গলে বাঘ ডাকছে। বিপিনবাবু বিড়বিড় করে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী!'

পরদিনই হরিমতিকে বললেন, 'ওগো, চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।'

হরিমতি একগাল হেসে বললেন, 'বলো কী! আমার বাগানের এখন কত নাম, আর শুধু কি বাগান! বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যও আমাকে নাকি কেন্দ্রীয় সরকার প্রাইজ আর পদ্মশ্রী দেবে।'

বিপিনবাবু আর কিছু বলার সাহস পেলেন না, বলার আর কীই-বা থাকতে পারে?

বিপিনবাবুর কাণ্ড

নন্দবাবু বাজারে চলেছেন। বাঁ-হাতে ছাতা, ডান হাতে বাজারের থলি, পকেটে টাকা আর ব্রহ্মতালুতে রাগ। তা রাগ হওয়ারই কথা। গতকাল বিকেল থেকে তাঁর প্রিয় দুধেল ছাগল রাইকিশোরীর খোঁজ নেই। ছোটোছেলে মদন গতকাল সিংহিদের ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে ঠ্যাং ভেঙেছে। গিন্নির সোনার বালা চুরি হওয়ায় গিন্নি আজ সন্দেহবশে পুরোনো ঝি হিরামোতিকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন, পরে যদিও বালাটা বালিশের নীচে পাওয়া যায়। তাঁর বড়োশালা ভুল করে তার পুরোনো চটি ছেড়ে রেখে নন্দবাবুর নতুন চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে চলে গেছে। বাইরের ঘরের ঘড়িটা দশ মিনিট লেট চলছে বলে আজও তাঁর বাজারে বেরোতে দেরি হয়ে গেছে। আরও আছে। কিন্তু অতসব বলতে গেলে মহাভারত। রাগের চোটে নন্দবাবু একটু জোরেই হাঁটছেন।

হঠাৎ সামনে পথ আটকে একজন বিগলিত মুখের লোক দাঁত বের করে বলল, 'নন্দবাবু না? কী সৌভাগ্য!'

লোকটা বেজায় বেঁটে, একটু রোগা, কালো এবং মুখে ধূর্তামির ছাপ আছে। নন্দবাবু লোকটাকে কস্মিনকালেও দেখেননি।

নন্দবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনি কে? কী চাই?'

'আজ্ঞে আমি হরিপদ, হরিপদ পাল।'

'ও, তা হরিপদবাবু, আমার খেজুরে আলাপ করার সময় নেই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যা বলার চটপট বলুন।'

'ছি ছি, দেরি করিয়ে দিলাম নাকি? তা চলুন, বাজারের দিকে যেতে যেতেই দুটো কথা বলি।'

'কী কথা?'

'বলছিলাম কী বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'বিপিনবাবু কে?'

'আহা, বিপিনবাবু হলেন যোগেনবাবুর শালা।'

'যোগেনবাবু কে?'

'চিনলেন না! যোগেনবাবু হলেন নরেনবাবুর ভাইপো।'

'নরেনবাবু কে?'

'কী মুশকিল! নরেনবাবু যে সুধাংশুবাবুর নাতজামাই।'

'সুধাংশুবাবু কে?'

'ওই তো বললাম, উনি হলেন নরেনবাবুর দাদাশ্বশুর। আর নরেনবাবু হলেন যোগেনবাবুর জ্যাঠা। আর যোগেনবাবু হলেন বিপিনবাবুর ভগ্নীপতি। এবার বুঝলেন?'

'জলের মতো পরিষ্কার। এদের কাউকেই আমি চিনি না।'

'আহা চেনার দরকারটাই বা কী? কথাটা হল বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'আজ্ঞে না।'

'উঃ সে সাংঘাতিক কাণ্ড। কাউকে না বলে-কয়ে বিপিনবাবু যে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে গেছেন।'

'তাই নাকি? তাহলে তো চিন্তার কথা। কিন্তু আমার যে বিপিনবাবুকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।'

'মাথা ঘামাবেনই বা কেন? শুধু বলছি ভদ্রলোকের কাণ্ডটা দেখলেন? বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ি থেকে জলজ্যান্ত মানুষটা গায়েব।'

'তাহলে পুলিশে খবর দিন।'

'আহা, পুলিশ তো তাঁকে আগে থেকেই খুঁজছিল।'

'তাই নাকি?'

'তা খুঁজবে না? তিনি যে ঢিল ছুঁড়ে নিত্যানন্দবাবুর অ্যালসেশিয়ান কুকুরের ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছেন।'

'ও, তা হলে তো ভীষণ ব্যাপার! কিন্তু এই নিত্যানন্দবাবুটি আবার কে?'

'তিনি হলেন নবকৃষ্ণ দারোগার পিসেমশাই। আর নবকৃষ্ণ দারোগা হল শ্যামাপদর খুড়তুতো ভাই। আর শ্যামাপদ হল তো চারুবাবুর ভাগনে। আর চারুবাবু হলেন...'

'থাক থাক, ওতেই হবে।'

'তাহলে থাক। কথাটা হচ্ছে বিপিনবাবুকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিপিনবাবুর কথাটাই বরং হোক।'

'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'হ্যাঁ, বললেন তো, উনি নিরুদ্দেশ।'

'নিরুদ্দেশ বলতে নিরুদ্দেশ। একেবারে গায়েব। কোথাও তাঁর টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। দিগন্তের চিলের মতো উড়তে উড়তে বিলীন হয়ে গেছেন।'

'বাঃ এ তো কাব্য হয়ে গেল দেখছি।'

লোকটা খুব লজ্জা-টজ্জা পেয়ে হাতটাও কচলে বলল, 'একটু-আধটু আসে আর কী। কবি তমাল রায়ের কাছে তালিম নিয়েছিলাম কিছুদিন।'

'বাঃ বাঃ। কবি তমাল রায়ের নামটা অবশ্য শুনিনি।'

'তিনি হলেন কবি সব্যসাচী কাব্যবিশারদের সাক্ষাৎ ভাইঝি জামাই। সব্যসাচী কাব্যবিশারদ হলেন গিয়ে নটবর বিদ্যাবিনোদের ভায়রাভাই। আর নটবর বিদ্যাবিনোদ হলেন গিয়ে...'

'থাক থাক কথাটা হচ্ছিল বিপিনবাবুকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ, কথাটা বিপিনবাবুকে নিয়েই।'

'সেটাই হোক।'

'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'হ্যাঁ উনি দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছেন।'

'বিলীন বলতে বিলীন। একেবারে কর্পূরের মতো উবে গেছেন। অথচ বাড়িতে ছেলে কাঁদছে, বউ কাঁদছে, মা কাঁদছে, পাওনাদাররা কাঁদছে।'

'তাহলে তো খুবই খারাপ ব্যাপার।'

'খারাপ বলতে খারাপ! শিবু গয়লার দুধ বাবদ একশো বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা পাওনা, পঞ্চানন মুদির পাওনা দু-শো একান্ন টাকা পঁচিশ পয়সা, রহমত দর্জি পাবে একান্ন টাকা পঁচাত্তর

পয়সা, পাড়ার মুচি পায় তেরো টাকা কুড়ি পয়সা, খবরের কাগজওয়ালার কাছে বাকি পড়ে আছে একাশি টাকা একান্ন পয়সা, বাড়িওয়ালার দু-মাসের ভাড়া তিনশো চল্লিশ টাকা, বনবিহারীর কাছে মাসকাবারে ধার নিয়েছিলেন আড়াইশো টাকা, গজপতির কাছে দেড়শো, সরখেলবাবুর কাছে ত্রিশ টাকা...'

'বিপিনবাবু বেশ ধারালো লোক ছিলেন দেখছি।'

'শুধু কী এই? ফুচকাওয়ালা, বাদামওয়ালা, অফিসের পিয়োন—তাদের হিসেব তো এখনও ধরিনি।'

'তাহলে আর ধরবেন না।'

'তাই বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'একটু একটু দেখতে পাচ্ছি।'

'সংসারটা ভেসে যাচ্ছে একেবারে। চাল নেই, ডাল নেই, নুন নেই, তেল নেই।'

'সত্যিই খুব দুঃখের কথা, কিন্তু বিপিনবাবু গেলেন কোথায়? ভালো করে খুঁজে দেখেছেন?'

'গোরু খোঁজা মশাই, গোরু খোঁজা। এই তো সামতাবেড়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ি, পিসির বাড়ি গাইঘাটা, ভাই থাকে কার্মাটারে, দাদা বিষ্ণুপুর, বড়োশালা নবদ্বীপ, ছোটোশালা দুর্গাচক, বড়োশালি গয়েশপুর, মেজোজন হিঙ্গলগঞ্জ, ছোটো শিমুলতলা, বড়োকাকা রানাঘাট, ছোটোকাকা পাঁশকুড়া, খুড়তুতো ভাই একজন কিশোরপুর, অন্যজন কেওনঝড়, বড়োমামা জলপাইগুড়ি...'

'থাক থাক। কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তো!'

'এক্কেবারে না। রবি ঠাকুরের ভাষায় উনি একদম ভোঁ হয়ে গেছেন, না হয়ে গেছেন।'

'আহা খুব দুঃখের কথা।'

'খুব, চোখের জল রাখা যায় না মশাই। তাই আমরা সবাই মিলে নিখিল ভারত বিপিন বাঁচাও কমিটি তৈরি করেছি। বিপিনবাবু ভোঁ ভোঁ হলেও সংসারটা তো আছে। সেটাকে তো আর ভেসে যেতে দেওয়া যায় না।'

'সে তো ঠিকই।'

'কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সতীশ ঘোষ। চিনলেন তো। এই যে সুরেনবাবুর বড়োমেসো, সুরেনবাবুকে নিশ্চয়ই জানেন, হারান বোসের...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কথাটা হচ্ছিল বিপিনবাবুকে নিয়ে।'

'তা তো বটেই। তা বলছিলাম, বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

'দেখছি মশাই, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, সবাই দেখছে। তা সেই বিপিন বাঁচাও কমিটির সেক্রেটারি হলেন গিয়ে গিরিধারী হালদার, যার শালা মাধব রায় গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সাঁতার কেটে বিখ্যাত, সেই মাধব রায় যার তালুইমশাই হল গিয়ে গোবিন্দ বিশ্বাস...'

'থাক থাক, বিপিনবাবুর কথাটাই হোক।'

'তাই হোক। নিখিল ভারত বিপিন বাঁচাও কমিটির আজীবন সদস্যপদ চাঁদা মাত্র দু-হাজার টাকা, দশ বছরের হল দেড় হাজার, পাঁচ বছর হলে হাজার, এক বছরের জন্য মাত্র দু-শো, ছ-মাসের সদস্যপদ...'

'থাক থাক। তা আমাকে কত দিতে হবে?'

লোকটা জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ ছিঃ, আপনার কাছে সেই উদ্দেশ্যে আসা নয়। তবে কিনা সবাই শুনে দুঃখ পায়। দুঃখ পেলে লোকে ভাবতে বসে। ভাবতে বসলে লোকের চোখে জল আসে। চোখে জল এলে লোকের মন গলতে থাকে। আর মন গলতে শুরু করলে হাত গিয়ে পকেটে ঢোকে...'

'থাক, থাক। কত?'

'কী যে বলেন? তা গোটা পাঁচেক যদি হয়, কোনো চাপাচাপি নেই কিন্তু।'

নন্দবাবু টাকাটা দিয়ে বললেন, 'চাপাচাপি নেই বলছেন? ওরে বাবা!'

লোকটা একটু লাজুক হেসে বলল, 'লোকে অবশ্য বিপিন বাঁচাও কমিটিকে খুবই গালমন্দ করছে, মামলামোকদ্দমা করবে বলে শাসাচ্ছে, ঝগড়াঝাঁটিও লেগে যাচ্ছে। তাই বলছিলাম বিপিনবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন?'

গণেশের মূর্তি

মহাদেববাবু মানুষটি বড়ো ভালো। দোষের মধ্যে তিনি গরিব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আর সেইজন্য বাড়িতে তাঁকে যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তাঁর স্ত্রী মনে করেন ভালোমানুষির জন্য মহাদেববাবু কোনো উন্নতি করতে পারলেন না। একটা দোকানে সামান্য কর্মচারীর কাজ করেন তিনি। সামান্য যা পান তা থেকেও গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করেন। কেউ ধার-টার করলে শোধ চাইতে পারেন না। দুষ্টু লোকেরা তাঁকে ঠকানোরও চেষ্টা করে। মহাদেববাবু ভালোই জানেন, এ জীবনে তিনি আর উন্নতি করতে পারবেনও না। তাঁর সেইজন্য তেমন দুঃখও নেই। তবে ছেলেপুলেরা খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট পেলে তাঁর খুব দুঃখ হয়। বেশি পয়সার লোভ তাঁর নেই। তবে আর সামান্য কিছু বেশি টাকা যদি রোজগার করতে পারতেন তাহলেই হত।

একদিন কাজকর্ম সেরে রাত্রিবেলা মহাদেববাবু বাড়ি ফিরছেন। পথে একটা মস্ত বটগাছ পড়ে। এই বটতলায় মাঝে মাঝে এক-আধজন সাধু এসে কয়েকদিন ধুনি জ্বালিয়ে থানা গেড়ে বসে। ধর্মভীরু মহাদেববাবু সাধু-সজ্জন দেখলেই সিকিটা-আধুলিটা যাই হোক প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে যান।

আজ দেখলেন বটতলায় বিরাট চেহারার এক প্রাচীন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিশাল জটা আর দাড়ি-গোঁফ। মহাদেববাবু চটি ছেড়ে ভক্তিভরে একখানা সিকি প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলেন।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, কী চাস তুই?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না বাবা।

সাধুরা সর্বত্যাগী, তাঁদের কাছে কিছু চাইতে মহাদেববাবুর লজ্জা করে।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, কিছুই চাস না?

না বাবা, আপনার কাছে কেন চাইব? আপনি নিজেই তো সবকিছু ত্যাগ করে এসেছেন।

সাধুর মুখভাব দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। দুই জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ মহাদেববাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ পাশে রাখা একটা ঝোলা থেকে একটা ছোটো গনেশমূর্তি বের করে বললেন, এটা নিয়ে যা।

মহাদেব মূর্তিটা ভক্তিভরে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। পেতলের তৈরি ছোটো সুন্দর একখানা মূর্তি।

সাধু বললেন, মাথার কাছে রেখে রাতে শুবি।

যে আজ্ঞে। কিন্তু বাবা, আমার তো আর পয়সা নেই, এর দাম দেব কী করে?

কে কার দাম দিতে পারে রে ব্যাটা! দাম দেওয়া কী সোজা! যা, বাড়ি যা।

ভারি যত্ন করে মূর্তটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মহাদেব। তাঁর বিছানার কাছে শিয়রে একটা কুলুঙ্গিতে মূর্তিটা রেখে রাতে শুলেন।

ঘুমিয়ে আছেন, হঠাৎ মাঝরাতে টুক করে কী যেন একটা তাঁর পেটের ওপর পড়ল। তিনি চমকে জেগে উঠে জিনিসটা হাতড়ে নিয়ে আলো জ্বেলে দেখলেন, একটা কাঁচা টাকা।

তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন। টাকাটা কোত্থেকে এল তা আকাশ-পাতাল ভেবেও বুঝতে পারলেন না।

পরদিন কাজে যাওয়ার সময় তিনি বটতলার সাধুটিকে আর দেখতে পেলেন না। শুধু ধুনির ছাই পড়ে আছে। সাধুজী চলে গেছেন। ইচ্ছে ছিল, আজ একটা টাকা প্রণামী দিয়ে যাবেন, তা আর হল না।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রিবেলা ফিরে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোলেন মহাদেববাবু। আর কী আশ্চর্য! আজও মধ্যরাতে তাঁর পেটের ওপর আগের রাতের মতোই একটা কাঁচা টাকা কোথা থেকে যেন এসে পড়ল। ঘুম ভেঙে মহাদেববাবু অবাক হয়ে বসে রইলেন। এটা কী হচ্ছে? এ কী গণেশঠাকুরের মহিমা? তিনি গণেশমূর্তিকে একটা প্রণাম করে বললেন, ঠাকুর, তোমার কত দয়া।

তা রোজই এইভাবে একটা করে টাকা পেতে লাগলেন মহাদেববাবু।

মাসান্তে তাঁর ত্রিশটি টাকা অতিরিক্ত আয় হল। তাতে সংসারেরও সামান্য উন্নতি হল। মহাদেববাবু ত্রিশ টাকা থেকে পাঁচটি টাকা জমিয়ে ফেললেন। টানাটানির সংসারে এতকাল একটি পয়সাও সঞ্চয় হত না।

গণেশবাবার পয়েই যে এ কাণ্ড ঘটছে তাতে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। সাধুবাবা তাঁকে কী আশ্চর্য জিনিসই না দিয়ে গেলেন। কৃতজ্ঞতায় রোজ তাঁর চোখে জল আসে।

বছর ঘুরল। ক্রমে ক্রমে মহাদেববাবুর অভাবের সংসারে একটু করে লক্ষ্মীশ্রীও ফিরছে। অল্প অল্প করে টাকাও জমছে। মহাদেববাবু তাতেই খুশি। তাঁর বেশি লোভ নেই।

মহাদেবের এই সামান্য বৈষয়িক উন্নতিও দু-একজনের চোখে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন হলেন, উলটোদিকের বাড়ির মদন চৌধুরী। মদন পয়সাওলা লোক, তবে খুব হিসেবী। সবাই জানে তিনি হাড়কেপ্পন।

একদিন মদনবাবু এসে মহাদেবের সঙ্গে আলাপ জমালেন। নানা কথায় ধীরে ধীরে মহাদেবের বৈষয়িক উন্নতির প্রসঙ্গও এল।

মদন জিজ্ঞেস করলেন, তা মহাদেব, তোমার মহাজন কি তোমার বেতন-টেতন বাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

আজ্ঞে না মদনদা।

তাহলে তোমার মুখখানায় যে আজকাল হাসিখুশি ভাব দেখছি! বউমাও তো তেমন গঞ্জনা দিচ্ছেন না তোমাকে? বলি ব্যাপারখানা কী?

মহাদেব অতি সরল সোজা মানুষ। তিনি অকপটে সরলভাবে গণেশমূর্তির ইতিবৃত্তান্ত সব মদন চৌধুরীকে বলে ফেললেন।

মদন চৌধুরীর চোখ লোভে চকচক করতে লাগল। বললেন, বাপু হে, তুমি তো মস্ত আহাম্মক দেখছি। গণেশবাবার কাছে বেশি করে চেয়ে নাও না কেন? মোটে একখানা করে টাকা—ওতে কী হয়?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, না দাদা, উনি খুশি হয়ে দিচ্ছেন, এই ঢের! তার বেশি আমার দরকার নেই।

মদন চৌধুরী খুব চিন্তিত মুখে উঠে চলে গেলেন।

তিন-চার দিন পরে মহাদেববাবু একদিন কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে ফুল-জল দিতে গিয়ে দেখেন, কুলুঙ্গিতে গণেশমূর্তিটি নেই। মহাদেববাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন

করে খুঁজেও গণেশমূর্তি পাওয়া গেল না। মহাদেববাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন, তাঁর দু-চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাদেববাবু মনে মনে বললেন, এত সুখ তো আমার কপালে সওয়ার কথা নয়।

ওদিকে মদন চৌধুরীর আহ্লাদ আর ধরে না। মাথার কাছে তাকের ওপর গণেশমূর্তি নিয়ে শুয়ে প্রথম রাত্রেই তিনিও একখানি কাঁচা টাকা পেয়ে গেলেন।

সকালবেলা তিনি গণেশমূর্তিকে প্রণাম করে বললেন, মহাদেবটা আহাম্মক বাবা। ও তোমার মহিমা কী বুঝবে? ও রোজ একটা করে বাতাসা ভোগ দিত, সেইজন্যই তো দুপুরবেলা চুপি চুপি আমি তোমাকে চুরি করে এনেছি। ও বাড়িতে তোমার যত্ন হচ্ছিল না। তোমাকে রোজ আমি সন্দেশ ভোগ দেব। টাকাটা দয়া করে পাঁচগুণ করে দাও।

তাই হল। পরের রাতে পর পর পাঁচটি কাঁচা টাকা এসে পড়ল মদন চৌধুরীর পেটের ওপর। তিনি আহ্লাদে ডগোমগো। গণেশ তাঁর কথা শুনেছেন। সকালবেলায় তিনি গণেশকে প্রণাম করে বললেন, তোমার হাত খুলে গেছে বাবা। তাহলে টাকাটা এবার পঞ্চাশ গুণ হোক।

তাই হল। মাঝরাতে বৃষ্টির মতো তাঁর পেটের ওপর মোট আড়াইশোটা কাঁচা টাকা পড়ল। তাতে মদন চৌধুরীর পেটে বেশ ব্যথাও লাগল। কিন্তু টাকা পেয়ে আহ্লাদে তাঁর ব্যথার কথা মনেই রইল না। সকালে তিনি গণেশবাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, দয়াই যদি করলে তাহলে টাকাটা এবার হাজার গুণ করে দাও।

রাত্রিবেলা যা ঘটল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না মদন চৌধুরী। মধ্যরাতে হঠাৎ যখন তাঁর পেটের ওপর টাকা পড়তে শুরু করলে তখন তিনি আহ্লাদে উঠে বসলেন। ওপর থেকে টং টং টং টং করে টাকা পড়তে লাগল মাথায়, গায়ে, হাতে, পায়ে। আড়াই লাখ টাকার বৃষ্টি যখন শেষ হল তখন মদন চৌধুরীর মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে, শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। টাকার স্তূপে সম্পূর্ণ ঢাকা।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন শরীরে একশো ফোড়ার ব্যথা। নড়তে পারছেন না। কিন্তু লোভ বলে কথা। ফের গণেশের মূর্তির দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, প্রাণ যায় যাক, টাকাটা দু-হাজার গুণ করে দাও।

তারপর দুরু দুরু বক্ষে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ যেন বজ্রনির্ঘোষের একটা শব্দ হল। তারপর বিশাল জলপ্রপাতের মতো টাকা নেমে আসতে লাগল। আহ্লাদে দু-হাত তুলে চেঁচালেন মদন চৌধুরী। কিন্তু আহ্লাদটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। পঞ্চাশ কোটি টাকার বিপুল ভারে তিনি চাপা পড়ে গেলেন। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার মতো অবস্থা। ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

জ্ঞান ফেরার পর যখন হামাগুড়ি দিয়ে টাকার স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর শরীরে আর শক্তি বলে কিছু নেই। মাথা ঘুরছে, জিব বেরিয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। গণেশবাবার মূর্তির দিকে চেয়ে তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আর চাই না বাবা, আমার প্রাণটা রক্ষে কর।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। মাঝরাতে ফের টাকার প্রপাত নেমে আসতেই আতঙ্কিত মদন চৌধুরী বিছানা থেকে নেমে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু কাঁচা টাকাগুলো তাঁর

মাথায় আর গায়েই এসে পড়তে লাগল। ঘরখানা টাকায় ভরে গেল। আর এই বিপুল টাকার নীচে আবার চাপা পড়লেন মদন চৌধুরী।

পরদিন সকালে কাজে বেরোনোর আগে মহাদেব চাট্টি মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে মদন চৌধুরী এসে তাঁর সামনে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই মহাদেব, আমাকে ক্ষমা করো। এই নাও তোমার গণেশ। আমিই চুরি করেছিলুম লোভে পড়ে। তার শাস্তি ভালোমতোই পেয়েছি।

গণেশমূর্তি ফিরে পেয়ে মহাদেবেরও চোখে জল এল।

মদন চৌধুরী চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, বহু টাকা দিয়েছিলেন গণেশবাবা। আজ সকালে কেঁদে-কেটে বললাম, বাবা তোমার টাকা ফেরত নাও। ও আমার চাই না। এ ধর্মের টাকা লোভী লোকের জন্য নয়। তা দয়া করে গণেশ সব টাকা ফেরত নিয়েছেন। আমার ঘরে আর একটিও টাকা নেই। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

মহাদেব গণেশমূর্তিকে আবার কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলেন। গণেশ যেন হাসতে লাগলেন।

দীপুর অঙ্ক

অঙ্কে দীপুর মাথা খুব ভাল বটে, কিন্তু অন্য বিষয়ে সে একেবারে ন্যাদোস। এবার বার্ষিক পরীক্ষায় সে ইংরিজিতে পেয়েছে বারো, বাংলায় আঠেরো, ইতিহাসে পনেরো এইরকম সব আর কি। মোট পাঁচ বিষয়ে ফেল। তবে অঙ্কে একশোতে একশো। সেই ক্লাস ওয়ান থেকে এই ক্লাস টেন অবধি অঙ্কের নম্বরে কোনও নড়চড় নেই, সেই একশোতে একশো। অনেক চেষ্টা করেও অঙ্কের স্যার কোনওদিন তার এক নম্বরও কাটতে পারেননি।

কথা হল পাঁচ বিষয়ে ফেল করে সে নতুন ক্লাসে ফি বছর ওঠে কি করে? আসলে স্কুলের হেডস্যার বলেন, দীপুর অঙ্কের মাথা যখন এত ভাল তখন সে তো আর গবেট নয়। অন্য বিষয়ে মন দিলে পাশ নম্বর পাবে। মন দেয় না এই যা।

তাই প্রতি বছর স্পেশাল কনসিডারেশনে তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়। কিন্তু ক্লাস টেন-এ ওঠার পর সমস্যা দেখা দিল।

হেডস্যার তাকে ডেকে বললেন, দ্যাখ দীপু, এতদিন তোকে স্পেশাল কনসিডারেশন প্রমোশন দিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু এরপর তো তোকে বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে হবে। তখন তোকে কেউ খাতির করবে না। কাজেই মন দিয়ে অন্য বিষয়গুলো পড়। টেস্টে এক বিষয়ে ফেল হলেও কিন্তু অ্যালাউ করা যাবে না। মনে থাকে যেন।

দীপু পড়ল অগাধ জলে। দুনিয়াতে অঙ্ক ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না। অন্য কিছু তার ভালও লাগে না। তবে অঙ্কে তার মাথা এমনই খোলতাই যে স্কুলের অঙ্ক তো দূরস্থান বি এসসি এম এসসি ক্লাসের অঙ্ক বইও তার কাছে জলভাতের মতো লাগে। যে কোনও অঙ্ক—তা সে যত শক্তই হোক—দীপু দেখলেই অঙ্কটা কী চাইছে, কোন পদ্ধতিতে এগোবে এবং শেষে কোথায় পৌঁছোবে তা পরিষ্কার বুঝতে পারে। অঙ্কেরা যেন দীপুর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যই বসে আছে। কিন্তু অন্য বিষয়ের বইপত্র খুলে বসলেই যেন দীপুর গায়ে জ্বর আসে। ইংরিজি, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস বড়ই বিস্বাদ লাগে তার। বাংলা বই খুললেই যেন শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ঢাল-তরোয়াল নিয়ে তার দিকে তেড়ে আসে। ইংরিজি বই খুললেই যেন বইয়ের পাতা থেকে গোলাগুলি ছুটে আসতে থাকে। ইতিহাস খুললেই যেন একদল ডাকাত 'রে রে' করে ওঠে। ভূগোল বই খুললেই মনে হয় ম্যাপ আর অক্ষরগুলো তাকে নিয়ে হাসাহাসি আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে আর দুয়ো দিচ্ছে।

অথচ পাশ না করলেই নয়। তার গরিব বাপ সাত মাইল দূরের গঞ্জে একটা গুদামে সামান্য হিসেব রাখার চাকরি করে। বড়ই টানাটানির সংসার। দীপুর আরও দুটো বোন আর দুটো ভাই আছে। দীপু পাশ-টাশ করে চাকরি পাবে এই আশায় তার পরিবারটা বসে আছে। তার ওপর সকলের ভরসার একটাই কারণ যে সে অঙ্কের ভাল ছাত্র।

কিন্তু শুধু অঙ্ক জানলেই যে হবে না তা দীপুর মতো হাড়ে হাড়ে আর কে জানে? মাস্টার রাখার সাধ্য তার নেই, তাই সে মাস্টারমশাইদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইংরিজি, বাংলা ইত্যাদিতে তালিম নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কাজ বিশেষ এগোলো না। বাংলার স্যার বঙ্কুবাবু একদিন

তাকে বললেন, ওরে দীপু, তোর মাথা হল অঙ্কময়। অঙ্ক ছাড়া তোর যে আর কিছুই সয় না। রবীন্দ্রনাথের অত ভাল কবিতাটা মুখস্থ করতে দিলুম, আর তাতে কিনা তোর সর্দি ধরে গেল!

ইংরিজির স্যার নরেনবাবু বললেন, তোর মাথার ভিতরটায় অঙ্কের একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে। ওই জঙ্গলে কি আর ইংরিজি সেঁধোতে পারে রে? খানিকটা অঙ্ক মুড়িয়ে কেটে তবে ঢোকার রাস্তা করতে হবে। কিন্তু সে তো হওয়ার নয়।

ইতিহাসের স্যার নন্দবাবু বা ভূগোলের স্যার পাঁচুবাবুও বিশেষ আশা দিতে পারলেন না। শুধু বলে দিলেন, মাথায় অঙ্কের ভাবটা না কমালে অন্য সব বিষয়ের সেখানে জায়গা হচ্ছে না।

দীপু ভারী দমে গেল। এতকাল অঙ্কই ছিল তার বন্ধু। কিন্তু এখন মনে হতে লাগল অঙ্কের মতো এমন শত্রু তার আর কেউ নেই। রাগ করে দিন দশেক সে অঙ্কের বই ছুঁল না, একটাও অঙ্ক করল না। তাতে তার মাথা ধরল, আইঢাই হতে লাগল, খিদে কমে গেল, অনিদ্রা হতে লাগল। তবু সে দশ দিন অঙ্কহীন কাটিয়ে দিল। কিন্তু অঙ্ক ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে বিশেষ লাভ হল না, দশদিন বাদে যখন ফের অঙ্ক কষতে বসল তখন তার মাথা থেকে অবরুদ্ধ অঙ্কের স্রোত বাঁধাভাঙা বন্যার মতো বেরিয়ে এল। ভারী আনন্দ হল তার, ভারী ভাল লাগতে লাগল। নাঃ, অঙ্ক ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। সে মাথায় অঙ্ক নিয়েই জন্মেছে, একে মাথা থেকে তাড়াবে কি করে?

কিন্তু কথা হল, মাথার মধ্যে অঙ্ক গিজগিজ করছে বলে অন্য বিষয়গুলো ঢুকতেও চাইছে না। ইতিহাসের স্যার মৃগাঙ্কবাবুও বলছিলেন, বুঝলি দীপু, অঙ্ক হল একটা গুন্ডা সাবজেক্ট, যেমন ষণ্ডা তেমনি রাগী জিনিস। ইতিহাস হল দুর্বল, ভীতু জিনিস। তোর মাথায় অঙ্কের দাপাদাপি দেখে ভয়ে ভীতু ইতিহাস ঢুকতেই চাইছে না।

ভূগোলের অন্য স্যার রমেশবাবু তাকে ভূগোল শেখানোর চেষ্টা করে অবশেষে একদিন ক্ষ্যামা দিয়ে বললেন, তোকে কথাটা বলি-বলি করেও এতদিন বলিনি। বুঝলি দীপু, অঙ্ক হল আসলে এক ধরনের ভূত। ও যার ঘাড়ে চাপে তার আর নিস্তার নেই। ওঝা-বদ্যি ডেকেও লাভ হয় না। আমার সেজো মামার কথাই ধর না, দিব্যি খেয়ে-দেয়ে ফুর্তি করে দিন কাটাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদিন অঙ্কের বাই চাপল। চাপল তো চাপলই। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন, কাছাকোছার ঠিক নেই, ধান শুনতে কান শোনেন। শেষে পাগলা-গারদে দেওয়ার যোগাড়। শেষে অঙ্ক কষে কষেই জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

ভূত হোক, গুন্ডা হোক, অঙ্কের জন্যই যে তার বেশ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারছে দীপু, কিন্তু অঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণই বা কোথায়? ভেবে ভেবে সে রোগা হয়ে যেতে লাগল।

কপালটাই খারাপ। টেস্ট পরীক্ষায় পাঁচ বিষয়ে ডাব্বা মারল সে, শুধু অঙ্কে কোনও নড়চড় হল না, সেই একশোতে একশো।

হেডস্যার ডেকে দুঃখ করে বললেন, এবারটা আর মাধ্যমিক দেওয়া হল না তোর। এক বছর ভাল করে পড়, এর পরের বার দিস।

চোখ ফেটে জল এল দীপুর। বাবা বলে রেখেছে টেস্টে অ্যালাউ হতে না পারলে জোত-জমির কাজে লাগিয়ে দেবে। সেই ভাল, চাষবাস করতে করতে মাথা মোটা হয়ে যাবে তার। অঙ্কেও ভাটা পড়বে।

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে দীপু নীলকুঠির নির্জন পোড়ো জমিতে একটা গাছতলায় এসে চুপচাপ বসে রইল। মনটা বড়ই খারাপ। তার লেখাপড়া তাহলে এখানেই শেষ।

শীতের বেলা পড়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। দীপুর তবু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না, বসে বসে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় কাছেপিঠে মানুষের গলা শুনতে পেল দীপু। চাষি-বাসি বা রাখাল ছেলেরাই হবে। প্রথমটায় অত খেয়াল করেনি। একটু বাদেই মনে হল কথাগুলো খুব কাছেই কারা যেন বলাবলি করছে। কিন্তু ভাষাটা যেন কেমনতরো, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দীপু চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। চারদিকে ঘন ঝোপঝাড়, তার ওপর শীতের বেলা ফুরিয়ে অন্ধকারও হয়ে এসেছে অনেকটা।

দীপু একটু অবাক হয়ে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, কে ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল। দীপু জানে নীলকুঠিতে পুরোনো সব সাহেব ভূত আছে। সেই ভয়ে রাতবিরেতে এদিকে কেউ আসে না। তারও একটু ভয়-ভয় করছিল। তবে মন খারাপ বলে ভয়টা তেমন বেশি হল না। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও দীপু থমকে গেল।

তার সামনে পথ আটকে তিনজন লোক দাঁড়ানো। তিনজনের চেহারাই একরকম এবং অদ্ভুত। বেঁটে, পেটমোটা, মাথায় টাক। তিনজনেরই পরনে হেঁটো ধুতি আর ফতুয়ার মতো জামা, দেখলে মনে হয় সার্কাসের বামনবীর জোকার।

দীপু ভারী অবাক হয়ে তিনজনকে দেখছিল।

তিনজনের মাঝখানের জন একটু এগিয়ে এসে নিজের টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ওহে বাপু, আমরা একটু বিপাকে পড়েছি, সাহায্য করতে পারো?

দীপু ঢোঁক গিলে বলল, কিরকম সাহায্য?

লোকটা ফস করে একটা কাগজ আর পেনসিল বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, দেখ তো বাপু, অঙ্কটা কষতে পারো কিনা।

দীপু অঙ্ক দেখলেই পাগল হয়। সে আর দ্বিরুক্তি না করে কাগজটা নিয়ে খসখস করে অঙ্কটা কষতে লাগল। মিনিট পাঁচেক বাদে কাগজটা ফেরত দিয়ে বলল, এই নিন, হয়ে গেছে।

লোকটা বাঁ হাতে কাগজটা নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার চেয়ে সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, না হে বীজদত্ত, সাংখ্যদত্ত, ছোকরার এলেম আছে।

বাকি দুজন একটু মুখ তাকাতাকি করল।

মাঝখানের জন দীপুর দিকে চেয়ে বলল, বুঝলে ছোকরা, জগতে অঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নেই। অঙ্কময়ং জগৎ, দুনিয়াটা চলছেই তো অঙ্কের জোরে। গান বলো, কবিতা বলো, সাহিত্য বলো সবকিছুর পিছনেই দেখবে অঙ্ক ঠিক ঘাপটি মেরে আছে। এই যে ফুল ফোটে, জ্যোৎস্না ওঠে, মলয় পবন বয়ে যায়, একটু চেপে যদি ভেবে দেখ তাহলে দেখবে তার পিছনেও ওই অঙ্কেরই খেলা। তা শুনলুম তোমার নাকি অঙ্ক নিয়ে কিসব সমস্যা হচ্ছে। সত্যি নাকি?

দীপুর চোখে জল এল, সে ধরা গলায় বলল, আপনারা কি অন্তর্যামী?

লোকটা শশব্যস্তে বলে ওঠে, আহা, চোখের জল ফেলার কী হল হে ছোকরা? তা বাপু, অন্তর্যামী আমরা বটে। আমার নাম হল ঘণক। আমি হলুম গে জ্যামিতি, ত্রিকোণোমিতি আর ঘণকের দেবতা। আমার নাম ঘণকদত্ত। আর ওই যে বাঁদিকেরটি উনি হচ্ছেন বীজগণিত আর কল্প অঙ্কের দেবতা। বীজদত্ত। আর ডানদিকেরটি সংখ্যাবিদ সাংখ্যদত্ত।

দীপু চোখ বড় বড় করে বলল, আপনারা দেবতা নাকি? কই, এরকম নাম তো শুনিনি!

লোকটা টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বিজ্ঞের মতো হেসে বলে, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে ক'জনের নাম জানো হে ছোকরা? যদি চেপে ধরি তাহলে তেত্রিশ জনের নামও কি বলতে পারবে?

দীপু ভয় খেয়ে বলল, আজ্ঞে না।

তাহলে!

দীপু আমতা আমতা করে বলে, আমি শুনেছিলুম লেখাপড়ার দেবতা হলেন মা সরস্বতী।

তা তো বটেই। কিন্তু লেখাপড়া তো আর চাট্টিখানি জিনিস নয়। বিশাল সমুদ্দুর। মা সরস্বতীর অধীনে এই আমরাই নানা শাখা-প্রশাখা আগলাই। তা ধরো কয়েক হাজার তো হবেই। কেউ ছন্দ সামলায় তো কেউ অলঙ্কার, কেউ কাব্য সামলায় তো কেউ গদ্য। গদ্যেরও আবার কত ভাগ, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস। তারপর ধরো ইতিহাস, ভূগোলের পিছনেও মেলা দেবতাকে মেহনত দিতে হচ্ছে। বিশাল কর্মযজ্ঞ হে, বিশাল কর্মযজ্ঞ। তা ওসব কথা থাক, তোমার সমস্যাটা কী হচ্ছে বলো তো!

দীপু ম্লানমুখে বলল, অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়েই যে আমি বছর বছর ফেল করি!

লোকটা সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, ওহে সাংখ্যদত্ত, বীজদত্ত, কী বুঝছো?

সঙ্গী দুজন মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে প্রায় একসঙ্গেই বলল, অসম্ভব!

ঘণক দীপুর দিকে ফিরে একগাল হেসে বলল, শুনলে তো! জগৎটাই অঙ্কময়। যে অঙ্ক জানে সে তো কেল্লা মেরেই দিয়েছে!

তাহলে আমি ফেল করি কেন?

ঘণক মাথা চুলকে বলে, কেন ফেল করো তার কারণটা খুব জটিল, বললেও তুমি বুঝবে না। শুধু এটুকু বলি, তোমার মাথাটা একটা ঘর। তুমি সেই ঘরের মধ্যে দরজা-জানালা এঁটে অঙ্ককে কয়েদ করে রেখেছো। কুনকে হাতি কাকে বলে জানো?

আজ্ঞে না।

কুনকে হাতি হল এক ধরনের পোষা হাতি, যারা জঙ্গলের বুনো হাতিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসে, তারপর হাতি মানুষের ফাঁদে ধরা পড়ে।

আজ্ঞে বুঝলাম।

কিছুই বোঝোনি। অঙ্ক হল তোমার কুনকে হাতি, তাকে আটক রাখলে তো চলবে না। তাকে ছেড়ে দাও। অঙ্কই গিয়ে ইংরিজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোলকে ধরে আনবে।

দীপু অবাক হয়ে বলে, কি করে?

ওই যে বললুম, অঙ্কময়ং জগৎ, সব কিছুর মধ্যে যে চোরা অঙ্ক রয়েছে সেটাই তুমি ধরতে পারনি। ওই অঙ্ক দিয়েই সব কিছু বোঝার চেষ্টা করো। তাহলেই দেখবে কেল্লা ফতে।

দীপু হাঁ করে রইল।

ঘণক বলল, আমরা তোমাকে বর দিতে এসেছি। বর মানে জানো?

একটু একটু জানি।

ছাই জানো। বর মানে বরণ করা। যা পেতে হবে, যা পেতে চাও তার জন্য সব কষ্টকে বরণ করে নেওয়াই হচ্ছে বর লাভ। বুঝলে?

দীপু ভয় খেয়ে বলল, যে আজ্ঞে।

তা কষ্টটা কি করবে?

যে আজ্ঞে।

তথাস্তু। বলে তিন বেঁটে দেবতা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপু চমকে উঠে বুঝতে পারল, সে গাছতলায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু স্বপ্নটাকে খুব একটা অবিশ্বাস্য মনে হল না তার। অন্ধকার হয়ে এসেছে। দীপু উঠে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের বছর টেস্ট পরীক্ষায় দীপুর নম্বর হল বাংলায় আশি, ইংরিজিতে বিরাশি, ভূগোলে নব্বই, ইতিহাসে পঁচাত্তর, অঙ্কে সেই একশোতে একশো।

না, দীপুর আর অঙ্কের ওপর অভিমান নেই।

দুই সেরি বাবা

ভুবন মানুষটা ভালো, কিন্তু তার কপাল ভালো নয়। কপালের ফেরে তার মা বসন্তকুমারী অতিশয় রগচটা মহিলা। মায়ের দাপটে আর গলাবাজির চোটে পাড়া-প্রতিবেশীরা কেউ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। আবার কপালের দোষে ভুবনের বউ নয়নতারাও হল সাংঘাতিক দজ্জাল।

নয়নতারাকে পছন্দ করে ভুবনের বউ করে এনেছিলেন মা বসন্তকুমারী। এখন শাশুড়ি-বউয়ে সকাল থেকে রাত ইস্তক রোজ এমন কুরুক্ষেত্র হয় যে, কহতব্য নয়। ঝগড়ার চোটে বাড়ির পোষা বেড়ালটা বিদায় নিল। পোষা নেড়ি কুকুরটাও মনের দুঃখে করালীবাবুর বাড়িতে গিয়ে জুটেছে। ডাকলেও আসে না। কাকপক্ষীরাও আনাগোনা বন্ধ করেছে। কাঙাল ভিখিরিরা অবধি এ-বাড়ির ছায়া মাড়ায় না।

ভুবনেরও মাঝে-মাঝে সন্নিসি হওয়ার ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু ঠিক সাহস পায় না। সন্নিসি হলে লেংটি পরে থাকতে হবে, ভিক্ষে করে খেতে হবে। সাধন-ভজনের হ্যাপাও তো কম নয়। মা আর বউয়ের ঝগড়ার চোটে অনেকদিন বাড়িতে রান্নাই হয় না। ভুবন না খেয়েই দোকানে গিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে। দোকান তার ভালোই চলে, আয়ও কম হয় না। তবে মনে সুখ নেই।

আজ ভোররাত থেকেই বসন্তকুমারী আর নয়নতারায় ঝগড়া লেগেছে। ভুবন বাড়িতে টিকতে না পেরে সাতসকালেই এসে দোকান খুলে বসেছে। সন্নিসি হবে না গলায় দড়ি দেবে সে কথাই বসে বসে ভাবছে। এত সকালে কর্মচারীরা আসে না, খদ্দেরও জোটে না। তাই নিরিবিলিতে বসে সুখরামের দোকান থেকে আনানো ভাঁড়ের গরম চা খেতে খেতে নিবিষ্ট মনে ভুবন ভাবছিল, সন্নিসি না গলায় দড়ি?

এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'ব্রাহ্মণভোজন।'

ভুবন অবাক হয়ে দেখল, একজন আধবুড়ো, দাড়ি-গোঁফওয়ালা লোক সামনে দাঁড়িয়ে। পরনে গেরুয়া রঙের একটা জোব্বামতো। মাথায় ঝুঁটি। সাধু-বৈরাগী হতে পারে। ফকির-দরবেশ কি আউল-বাউল হওয়াও বিচিত্র নয়।

ভুবন বলল, 'আপনি কে?'

লোকটা গম্ভীর মুখে বলল, 'সন্নিসি হওয়া বা গলায় দড়ি দেওয়ার চাইতে ব্রাহ্মণভোজন করানো অনেক ভালো।'

ভুবন তাড়াতাড়ি উঠে লোকটার পায়ের ধুলো নিয়ে গদগদ হয়ে বলল, 'আপনি কি অন্তর্যামী?'

লোকটা খ্যাঁক করে উঠে বলল, 'অন্তর্যামী হওয়াটা কি খুব সুখের ব্যাপার বলে ভেবেছ নাকি হে বাপু? দিনরাত মানুষের মনের মধ্যে যত আ-কথা-কু-কথা বুড়বুড়ি কাটছে সেগুলো কান দিয়ে ভেতরে এসে সেঁধোচ্ছে, সেটা কি ভালো হচ্ছে রে বাপু? দুটো কান অপবিত্র হচ্ছে রোজ। গঙ্গাজল দিয়ে রোজ পরিষ্কার করতে হয়। নাঙ্গাবাবা যে কী বিভূতিই দিলেন, এখন হয়েছে জ্বালা।'

ভুবন হেঁঃ হেঁঃ করে বলল, 'আজ্ঞে, পাপী-তাপীদের জন্য না হয় একটু কষ্ট করলেনই মহারাজ।'

'থাক, থাক, আর দাঁত বের করে বিনয় দেখাতে হবে না। বলি, খাঁটি সর্ষের তেল আছে?'

ভুবন হাতজোড় করে বলল, 'আছে বাবা, আছে।'

'তাই এক পলা বের করো তো বাপু। গায়ে খড়ি উঠছে। তা খড়ি ওঠারই বা দোষ কী? কৈলাস থেকে হেঁটে আসছি, চারদিন স্নান নেই।'

বলেই জোব্বাটা খুলে ফেলল লোকটা। আদুর গা হয়ে একটা টুল টেনে বসে বলল, 'বেশ ডলাইমলাই করে তেলটা মেখে দাও তো হে বাপু।'

ভুবন যেন বর্তে গেল। খুব যত্ন করে তেল মাখাতে মাখাতে বলল, 'তা বাবা, আপনার শ্রীনামটি কি শুনতে পাই না?'

'তা পাবে না কেন? নাম তো পাঁচজনকে বলার জন্যই। তবে এ হল সাধনমার্গের নাম। আমাকে সবাই আদর করে 'দু'সেরি বাবা' বলে ডাকে। সকাল-বিকেল দু'সের করে খাঁটি গোরুর দুধ খাওয়ার অভ্যাস কিনা।'

চোখ বড়-বড় করে ভুবন বলল, 'এক-এক বারে?'

'ওরে বাপু, দুধ কি আর আমি খাই? সাধন-ভজনে আত্মার যে মেহনত হয়, তাতে দু'সের দুধ তো নস্যি। ওটা আত্মাই টেনে নেয়।

ওরে বাপু, নতুন গামছা আছে?'

'এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।'

'ওই সঙ্গে একজোড়া নতুন ধুতি আর দু'খানা ভালো গেঞ্জিও আনিয়ে রাখ। আর আমি পুকুরে ডুব দিয়ে আসতে-আসতে যেন দু'সের দুধ তৈরি থাকে। দুপুরে ব্রাহ্মণভোজনে কী-কী লাগবে তা এসে বলছি।'

ভুবন খুব কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, ব্রাহ্মণসেবা করা তো ভাগ্যের ব্যাপার বাবা, কিন্তু আমার যে বাড়িতে বড় অশান্তি।'

হাঃ হাঃ করে হেসে দু'সেরি বাবা বলে, 'সে কি আর জানি না রে মূর্খ! তোর জন্যই তো কৈলাস থেকে এত দূর কষ্ট করে আসতে হল। তোর দুঃখে স্বয়ং শিবের সিংহাসন নড়ে গেছে। বাবা শিবই তো আমাকে ডেকে বললেন, 'যা তো দু'সেরি, গিয়ে একটু দেখে আয়, ছেলেটা এত কষ্ট পাচ্ছে কেন?'

ভুবন গদগদ হয়ে বলল, 'বটে বাবা! স্বয়ং শিব পাঠিয়েছেন আপনাকে?'

'তবে আর বলছি কী রে ব্যাটা! যা দুধের জোগাড় দেখ রে।'

দু'সেরি বাবা স্নান করে এসে কাঁচি ধুতি পরে দু'সের দুধ শেষ করে বললেন, 'এবার চল ব্যাটা, তোর বাড়িতে ব্রাহ্মণসেবার ব্যবস্থা দেখি গে।'

ভুবনের বাড়ি কাছেই। খুব ভয়ে-ভয়ে দু'সেরি বাবাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির উঠোনে ঢুকতেই দেখতে পেল ভেতরের বারান্দায় বসন্তকুমারী আর নয়নতারার হাতে খুন্তি।

বসন্তকুমারী বলছে, 'মুখপুড়ি, শাঁকচুন্নি...'

নয়নতারা বলছে, 'ডাইনিবুড়ি, শনের নুড়ি...'

হঠাৎ দু'সেরি বাবা বাজখাঁই গলায় হাঁক মারল, 'বসন্তকুমারী! নয়নতারা! তোমাদের এত অধঃপতন হয়েছে?'

অচেনা একটা লোককে হঠাৎ এরকম বজ্রগম্ভীর গলায় তাদের নাম ধরে ডাকতে দেখে দু'জনেই থেমে গেল।

তারপরই বসন্তকুমারী তেড়ে এল, 'কে রে তুই ড্যাকরা?'

খুন্তি উঁচিয়ে নয়নতারাও বলল, 'কে এলেন রে গুরুঠাকুর।'

দু'সেরি বাবা অত্যন্ত ব্যথিত গলায় বলে উঠল, 'ওরে ঝগড়া করবি তো বাপের বেটির মতো কর। ও কীরকম ধারা মিনমিনে ঝগড়া তোদের? তোদের ঝগড়ার ছিরি দেখে কৈলাসে যে মা-দুর্গা হেসে কুটুপাটি। আমাকে ডেকে বললেন, 'ওরে, এই দু'জনের তো এখনও ঝগড়ার দুধের দাঁতই গজায়নি, তবু কেমন মিউমিউ করছে দ্যাখ। যা বাবা, ওদের একটু ঝগড়ার পাঠ দিয়ে আয়।'

শাশুড়ি-বউ দু'জনেই দু'জনের দিকে একটু চেয়ে ঝগড়া ভুলে দু'সেরি বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'জোচ্চুরি করার আর জায়গা পাওনি! মা দুগ্গা পাঠিয়েছে তোমাকে! দেব ভূত ঝেড়ে।'

হাসি হাসি মুখে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে দু'সেরি বাবা বলল, 'ওরে, তোদের হবে, প্রতিভা আছে, সাধনা নেই। তাই তো আমার আসা।'

বসন্তকুমারী ফোঁস করে উঠল, 'এঃ কোথাকার কে আমাকে ঝগড়া শেখাতে এলেন রে!'

নয়নতারাও ঝেঁঝেঁ উঠল, 'দেব মুখে নুড়ো জ্বেলে।'

দু'সেরি বাবা মাথা নেড়ে বলল, 'হচ্ছে না, হচ্ছে না। গলায় তোদের কোনো হুল নেই, বিষ নেই, ঝাঁজ নেই, ধক নেই। কলজের জোর কম, দমেরও বালাই নেই। তাছাড়া কোথায় সম পড়বে, কোথায় ফাঁক তারও তো ঠিক-ঠিকানা পাচ্ছি না। তোদের যে একেবারে গোড়া থেকে শেখাতে হবে। ওরে ভুবন, বাড়িতে তানপুরা নেই?'

'আজ্ঞে না, মহারাজ।'

'হারমোনিয়াম আছে?'

'তা আছে একটা।'

'শিগগির নামা। আর পারলে ওবেলা একজন খোলদার ধরে আনিস। ঝগড়ার সঙ্গে খোলটা জমে ভালো।'

ভুবন হারমোনিয়ামটা নামিয়ে দিয়ে টুক করে সরে পড়ে সটান দোকানে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল। বাড়িতে কী হচ্ছে ভেবে বুকটা বড় দুরুদুরু করল সারাক্ষণ।

দুপুরবেলা বাড়িতে এসে তাজ্জব। ভেতরের বারান্দায় দু'সেরি বাবা খেতে বসেছে। কাঁসার থালায় ভাত, থালা ঘিরে পঞ্চব্যঞ্জন। মাছের মুড়ো, তিনরকম মাছ, ধোঁকার ডালনা, বাটিচচ্চড়ি, পায়েস, এলাহি আয়োজন। নয়নতারা ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করছে, বসন্তকুমারী কাছে বসে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছে, দু'সেরি বাবাকে।

ভুবনকে দেখে দু'সেরি বাবা উদার গলায় বলে, 'আয় বেটা, আয়। তোর ঘরে যে সাক্ষাৎ মা-মনসা আর চামুণ্ডার বাস। তুই তো ভাগ্যবান রে। এ বলে আমাকে দ্যাখ ও বলে আমাকে। তালিম দিতে গিয়ে দেখি দু'জনেই ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নিয়ে এসেছে। সাধনা করলে অনেক ওপরে উঠতে পারবে। তবে একটু সংযম, ধৈর্য আর পরিশ্রমের দরকার।'

'যে আজ্ঞে, বাবা।'

দুপুরে দু'সেরি বাবা একটু টেনে দিবানিদ্রা দিল। ভুবন খেয়ে উঠে দেখল, তার মা আর বউ রান্নাঘরে মুখোমুখি বসে খাচ্ছে আর খুব ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন কথা কইছে।

দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে উঠে ভুবন দেখল, দু'সেরি বাবা মাদুর পেতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে, তার একধারে বসন্তকুমারী, অন্যধারে নয়নতারা।

দু'সেরি বাবা বসন্তকুমারীর দিকে চেয়ে বলল, 'এবার শুরু করো মা। মুখপুড়ি বলার সময় একটু শুদ্ধ নি লাগাতে হবে, মনে থাকে যেন।'

বসন্তকুমারী ভারি কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'আমার কি আর বুড়োবয়সে ওসব হবে বাবা!'

'আরে, হবে, হবে। আর নয়নতারা-মা তুমি যখন ডাইনিবুড়ি বলবে তখন কড়ি মধ্যম...'

নয়নতারা লাজুক মুখে বলল, 'বড্ড লজ্জা করছে যে বাবা...'

দৃশ্যটা দেখে ভুবনের চোখে জল এল। তার জীবনে যে এমন সুদিন আসবে তা সে কখনও কল্পনাও করেনি।

না, লোকটা যদি ঠক-জোচ্চরও হয় তো হোক। ভুবন দু'সেরি বাবাকে ছাড়বে না।

কথা ভার্সাস কথা

বরদাবাবু সকালে জলখাবার খেয়ে বাজারে বেরোতে যাবেন, এমন সময়ে যোগেনবাবু এসে হাজির। মুখখানা ভারী চিন্তিত। চিন্তার তীব্রতায় চশমা নাকের ডগায় এসে নেমেছে, গোঁফ ঝুলে পড়েছে এবং গায়ে উলটো জামা পরে এসেছেন।

'এই যে বরদাবাবু, বড্ড মুশকিলে পড়ে সকালেই আসতে হল।'

যোগেনবাবু এই গঞ্জে নতুন এসেছেন। না, ঠিক নতুন নয়, যোগেনবাবু আসলে এখানকারই লোক, তবে মাঝখানে ত্রিশ বছর বিহারে ছিলেন। সম্প্রতি ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বরদাবাবু প্রতিবেশী। বেশ সজ্জল লোক।

বরদাবাবু হলেন এ গঞ্জের বিচক্ষণ লোক। সবাই তাঁর বুদ্ধি-পরামর্শ নেয়। মানুষের মুখ দেখেই তিনি মনের কথা আন্দাজ করে নেন বলে কথিত আছে। যোগেনবাবুর মুশকিলের কথা শুনেই তিনি তাই মিটিমিটি হেসে বললেন, 'বুঝেছি, গয়লা আজ দুধ দেয়নি তো?'

'না, দুধ তো দিয়ে গেছে।'

'তবে কি ঠিকে কাজের লোক কামাই করেছে?'

'না, সে তো কামাই করেনি।'

'তা হলে কি শীতলা কমিটির ছেলেগুলো একশো টাকা চাঁদা চাইছে?'

'আজ্ঞে না, তাদের আমি পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছি।'

'তা হলে কি গিন্নির দাঁত কনকন করছে?'

'আজ্ঞে, তাঁকে তো একটু আগে চালভাজা খেতে দেখে এলাম। না না, সেসব নয়। আসলে আমি জানতে চাইছিলাম, ওই যে কথায় বলে, 'দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।' সেই কথাটা কি ঠিক? নাকি শূন্য গোয়ালের চেয়ে দুষ্টু গরুই ভালো?'

'আহা, এতে আবার মুশকিলের কী হল? দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই তো ভালো মশাই। দুষ্টু গরুর অনেক হ্যাপা। গুঁতোয়, দড়ি ছিঁড়ে পালায়, অন্যের বাগানের বেড়া ভাঙে, দুধ দিতে চায় না। কিন্তু আপনার তো গরুই নেই, অত ভাবছেন কেন?'

'গরুকে নিয়ে ভাবছি না, কথাটা নিয়ে ভাবছি। এই তো ক'দিন আগে শুনলুম, নেই মামার চেয়ে নাকি কানা মামাও ভালো। তা, এই কথাটাও কি ঠিক? নাকি কথাটা হবে কানা মামার চেয়ে নেই মামাও ভালো?'

'কেন, এও তো সোজা কথা। মামা না থাকার চেয়ে কানা হোক, খোঁড়া হোক, বিটকেল বা পাগল হোক, একটা মামা থাকাই ভালো। মামা থাকা মানে মামাবাড়িও রইল, মামা বলে ডাকার একটা লোকও হল। মামা থাকার আরও অনেক উপকারিতা আছে। পরে ভেবে বলব'খন।'

'কিন্তু কথাটা উলটো হয়ে যাচ্ছে না কি বরদাবাবু? একবার বলছি দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো, আবার বলছি নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। একটু ভেবে দেখুন দিকি, দুটোর দু'রকম অর্থ হয়ে যাচ্ছে না?'

বরদাবাবু বললেন, 'হুম, কথাটা এতদিন ভেবে দেখা হয়নি বটে।'

'আজ্ঞে, সেইজন্যই সাতসকালে ছুটে আসা।'

'কেন যোগেনবাবু, এই সকালবেলাটায় আপনার মামা আর গরু নিয়ে সমস্যা হচ্ছে কেন?'

'আমার কানাইমামা সকালেই একটা গরু নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। বলছেন, 'তোর গোয়ালটা খালি পড়ে আছে দেখে ভারী খারাপ লাগল, তাই তোর জন্য একটা গরু নিয়ে এলাম। দাম পাঁচ হাজার টাকা, তা তুই না হয় পঞ্চাশ টাকা কমই দিস। গরু খুব উপকারী জিনিস। গেরস্তঘরে গরু না-থাকা ঠিক নয়।' তাই মনে হল কথাটা আপনাকে জিগ্যেস করে যাই। কথাটা কি কানা মামার চেয়ে নেই মামা ভালো? নাকি শূন্য গোয়ালের চেয়ে দুষ্টু গরুই ভালো?'

বরদাবাবু একটু কাহিল গলায় বললেন, 'গরু এবং মামা দুটোই দেখছি বেশ জটিল ব্যাপার মশাই, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে।'

যোগেনবাবু ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'মানুষের দোষ কী জানেন? ভালো করে আগাগোড়া না ভেবেই ফস করে এক-একটা কথা বলে বসে। একবার বলছে মামা না থাকার চেয়ে কানা মামা ভালো, ফের বলছে দুষ্টু গরু বিদেয় করো, গোয়াল শূন্য থাক। একবার বলা হচ্ছে থাকাই ভালো, আবার বলছে না-থাকাই ভালো। কোনটা ধরব বলুন তো?'

বরদাবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'কথাটা কিন্তু কানা মামাকে নিয়ে। প্রবাদে স্বাভাবিক মামাদের উল্লেখ নেই, কিন্তু কানা মামার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ অন্য মামা না থাকলেও চলবে, কিন্তু কানা মামা থাকাই চাই। তা আপনার মামা কানা নন তো?'

'কানা না হলেও তিনি আমার কানাইমামা, খুব জবরদস্ত লোক। একসময় দারোগা ছিলেন। যখন যে এলাকায় যেতেন, চোর-ডাকাতদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যেত। তারা সব অরন্ধন পালন করত। কত চোর-ডাকাত শোকমিছিল বের করত, ধিক্কার দিবস পালন করত। চুরি-ডাকাতি করতে না পেরে আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে, কতক সমাজসেবী হয়ে গেছে, কতক আবার রক্তদান শিবির বা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অর্গানাইজ করে সময় কাটাতে লেগেছে। আজ অবধি তার চোখের দিকে চেয়ে কেউ কথা বলতে পারেনি, যা হুকুম করবেন তাই তামিল হওয়া চাই। লোক আদর করে তাঁর নাম দিয়েছে, 'বিশ্বত্রাস কানাই দারোগা'।'

'বলেন কী! এ তো বেশ বিপজ্জনক মামা!'

'হ্যাঁ, আর সেইজন্যই তো আমি জানতে চাইছি, নেই মামার চেয়ে কানাইমামা ভালো কিনা?'

'খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। তবে আমার মনে হচ্ছে দুষ্টু মামার চেয়ে বরং নেই মামা ভালো। নেই মামার অনেক সুবিধে, নেই মামা হলে কোনও ল্যাঠা থাকে না।'

'আরও একটা অসুবিধে দেখা দিয়েছে।'

'সেটা আবার কী?'

'রামখেলাওন গয়লা দুধ দিতে এসে গরুটা দেখে আমার কানে কানে কী বলে গেল জানেন? বলে গেল, 'বাবু, গাই গরু কিনতে হলে হুঁশিয়ারিসে কিনবেন। আপনার মামাবাবু যে গরুটা আনিয়েসেন উ তো কানা আছে। দোনো আঁখো মে ছানি পড়িয়েসে, এ গাই লিয়ে আপনার বহুত ঝামেলা হোবে।'

'বলেন কী? কানা গরু?'

'হ্যাঁ, আর সেই জন্যই আমি জানতে চাইছি শূন্য গোয়ালের চেয়ে কানা গরু ভালো কিনা। এ বিষয়ে কোনও প্রবাদ-ট্রবাদ নেই?'

'দুষ্টু গরুর কথাই প্রবাদে আছে, কানা গরুর কথা নেই। কিন্তু দুষ্টু মামা আর কানা গরু নিয়ে এই সকালবেলাতে আপনি যে বিরাট জট পাকিয়ে ফেললেন মশাই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনাদের প্রবাদেই বলা আছে, 'মামা-ভাগ্নে যেখানে, বিপদ নেই সেখানে।' আছে কিনা?'

'তা আছে।'

'তা হলে?'

'প্রবাদগুলো তো মশাই মিথ্যে নয়। আমারও একাধিক মামা আছে। শিবুমামা, চিত্তমামা, রঘুমামা, নিরুমামা, জিষ্ণুমামা, জ্যোতিমামা। কই, তাঁরা তো কেউ সাতসকালে কানা গরু গছাতে আমার বাড়িতে হাজির হননি। তাঁরা কেউ দারোগাও নন, রাগীও নন। কিন্তু এই আপনাকেই দেখছি, সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশ জট পাকিয়ে ফেলেন।'

'আহা, চটছেন কেন বরদাবাবু? জট আমি পাকালাম কোথায়?'

'পাকাননি? জট পাকানোই তো আপনার স্বভাব। দুষ্টু গরু আর কানা মামার কথাই আমাদের জানা ছিল। এখন আপনি কানা গরু, দুষ্টু মামা আমদানি করে যে ভজঘট্ট পাকিয়ে তুললেন তাতে আমার মাথাটাই গুলিয়ে যাচ্ছে। বাজার থেকে কী কী আনতে হবে তা বেবাক ভুলে বসে আছি। আমার আবার মাথা গরম হলে খিদে হয় না, ঘুম আসতে চায় না। এই তো পরশুদিন সকালে এসে আপনি আচমকা জিগ্যেস করে বসলেন, তিলক কামোদের সঙ্গে পিলু রাগের তফাতটা কোথায়? এসব প্রশ্নে মানুষের পিলে চমকে যায় না। পরশুদিনের রাগ এখনও কাটেনি, তার উপর এনে হাজির করলেন দুষ্টু মামা আর কানা গরু।'

'আহা আপনি ঠিক লোক বলেই তো পাঁচজন জানতে আসে। পরশু তো আপনি আমার প্রশ্নটাকে জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন, পিলুর সঙ্গে তিলক কামোদের তফাত হল—ঝিঙের সঙ্গে ট্যাঁড়সের যা তফাত, বোয়ালের সঙ্গে চিতলের যা তফাত, ভালুকের সঙ্গে গোরিলার যা তফাত, বলেছিলেন তো?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'আরও বলেছিলেন, পিলুতেই যদি কাজ হত তা হলে আর তিলক কামোদের দরকারই হত না। এবং তার মানে হচ্ছে মানুষের তিলক কামোদ হলেই চলবে না, মাঝে-মাঝে তার পিলুও চাই, বলেছিলেন তো?'

'তা বলেছিলাম বোধ হয়।'

'আরও বলেছিলেন, পিলু যদি তিলক কামোদ হত তা হলে পিলুর পিলুত্ব থাকত না এবং তিলক কামোদ যদি পিলু হত তা হলে তার তিলক কামোদত্ব উবে যেত। বলেছিলেন কিনা?'

'বলে থাকতে পারি।'

'আপনার ব্যাখ্যা শুনে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে ভারী পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই সারাদিন মনটা খুব ফুরফুরে লাগছিল। তিলক কামোদ আর পিলু যে-যার বাড়িতে ফিরে গেছে। তাদের মধ্যে আর কোনও ঝগড়া-কাজিয়া নেই। আর সেইজন্যই তো আপনার কাছে আসা। আমার বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে আপনার কী মনে হয়, 'মামা-ভাগনে যেখানে, বিপদ নেই সেখানে', কথাটা ঠিক? তা ছাড়া লোকে তো উলটো কথাও বলে।'

'লোকে কী বলে?'

'বলে, 'যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা।' বলে কিনা বলুন।'

'তা বলে বটে।'

'এসব উলটোপালটা কথাটা কি ঠিক হচ্ছে লোকের? এইভাবেই কি যুগেযুগে মামা-ভাগনের সম্পর্ক বিষিয়ে যাচ্ছে না? আর মামা-ভাগনের সম্পর্ক বিষিয়ে যাওয়ার ফলেই কি দেশের এই অধঃপতন নয়? চারদিকে এই যে এত দুর্নীতি, চুরি-জোচ্চুরি, মিথ্যাচার, এর পিছনে কি এইসব উলটোপালটা প্রবাদের প্রচ্ছন্ন হাত নেই? আবহমান কাল ধরে কি ওই কানা মামা ও দুষ্টু গরুরাই আমাদের দিগ্‌ভ্রান্ত করছে না?'

'যোগেনবাবু, আমার মাথাটা যে ঘুরছে! আমি যে চোখে অন্ধকার দেখছি।'

'আজ্ঞে, আমারও একটু আগে ওরকম হচ্ছিল। কানাইমামা এখন দুধ-চিঁড়ে দিয়ে ফলার করছেন। ফলার সেরেই গরুর দামটি নিয়ে রওনা হবেন। তাই আপনার কাছে ছুটে আসা। যদি পাঁচটি হাজার টাকা ধার দেন তা হলে সারা জীবন ঋণী থাকব।'

গোপেনবাবু

গোপেনবাবু অতি নিরীহ এবং সজ্জন মানুষ। ধার্মিক বলেও তাঁর বেশ খ্যাতি আছে। তবে গোপেনবাবু নিতান্তই একজন গরিব লোক। একজন বদমেজাজি, হাড়কেপ্পন, সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত মহাজনের গুদামে তিনি হিসেব-রাখা কেরানির কাজ করেন। বেতন খুবই যৎসামান্য। তাতে গোপেনবাবু, তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং ছেলের পেট চলে না। ইদানীং খরচ বাঁচানোর জন্য গোপেনবাবু খাওয়া এতই কমিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর মাথা আজকাল প্রায়ই ভোঁ-ভোঁ করে, চোখে অন্ধকার দেখেন। নিজের খাওয়া কাটছাঁট করে তিনি তাঁর বৃদ্ধা মা আর ছেলেকে দুটো বেশি ভাত খাওয়ার সুযোগ করে দেন। আর কেউ টের না পেলেও তাঁর স্ত্রী ব্যাপারটা ঠিকই টের পান। বলেন, এত কম খেলে শরীর টিকবে কী করে? গোপেনবাবু ভারী মধুর হেসে বলেন,—আজকাল একটু বয়স হয়েছে তো, তাই আর আগের মতো খেতে পারি না। বড় আইঢাই হয়। এই বলে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে উঠে পড়েন।

অফিসে তাঁর খাটনি প্রচুর। মালপত্র আসছে, যাচ্ছে, সেসব হিসেব রাখা, টাকাপয়সা গোনা এবং খাতায় হিসেব মেলানো। এইসব করতে করতে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায় অনেক। ধুঁকতে-ধুঁকতে ফিরে পুজোপাঠ সেরে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যান। এর ওপর আছে মালিকের ধমক-চমক, শাসানি, কথায়-কথায় মাইনে কেটে নেওয়া বা তাড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো।

মালগুদামের কাজে উপরি পয়সা আছে। যেসব মহাজন মাল সরবরাহ করে তারা তাঁর সঙ্গে 'বন্দোবস্ত' করতে চেয়েছিল। বস্তায় কম মাল দিয়ে বেশি মাল দেখানোর জন্য। কিন্তু গোপেনবাবু হাতজোড় করে বলেছেন, বেশি খেয়ে মরার চেয়ে না খেয়ে মরাটাই আমার বেশি পছন্দ। ওই পাপের পয়সা আমি নিতে পারব না।

গোপেনবাবু যে ভালো লোক তা তাঁর মালিক বদ্রীপ্রসাদ-ও জানে। বদ্রীপ্রসাদের নিয়ম হল কর্মচারীরা দু-তিন বছরের পুরোনো হলেই কোনও ছুতোয় তাকে বিদেয় করে দেওয়া। তার ধারণা পুরোনো হলেই কর্মচারীরা চুরি করতে শুরু করে। একমাত্র গোপেনবাবুকেই বদ্রীপ্রসাদ বকাঝকা করলেও তাড়ায়নি। টানা এগারো বছর গোপেন এখানে চাকরি করছেন।

কিন্তু শেষ অবধি গোপেনবাবুরও শিয়রে শমন এল। বর্ষাকালে একদিন অনেক রাত অবধি বসে গুদামের হিসেব মেলাচ্ছিলেন গোপেনবাবু। হঠাৎ বদ্রীপ্রসাদ তাঁকে ডেকে বলল,—দেখো গোপেন, তুমি ভালো লোক আমি জানি। কিন্তু ভালো লোকদের নিয়ে বিপদ কী জানো? তাদের ভালোমানুষির সুযোগে অন্যেরা গুছিয়ে নিতে পারে। আমি ভাবছি, ক'দিনের জন্য আমার দেশ রাজস্থানে যাব। তোমার ওপর গুদামের ভার দিয়ে যেতে আমার ভরসা হয় না। ভালো হলেও তুমি শক্তপোক্ত লোক নও। তাই ঠিক করেছি আমার ভাতিজা এখন মাস দুই কাজকর্ম সামলাবে। দু-মাস বাদে ফিরে এসে আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব। তবে এ দুই মাসের মাইনে তুমি পাবে না।

গোপেনবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু কী আর করেন। ঘাড় কাত করে বললেন—তাই হবে।

বদ্রীপ্রসাদ বলল,—কাল থেকেই আমার ভাতিজা চার্জ নেবে। কাল থেকে তোমারও ছুটি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপেনবাবু হিসেবের খাতা জমা দিয়ে নীরবে বেরিয়ে পড়লেন। প্রতিবাদ বা হাতে-পায়ে ধরা তাঁর স্বভাব নয়। বাইরে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে তাঁর মনে হল, দু-মাস অনেক লম্বা সময়। এতদিন তিনি বাঁচবেন না, কারণ তাঁর আর বাড়তি সম্বল নেই। তাঁর একমাত্র সম্বল হলেন ভগবান। তা ভগবানের যদি ইচ্ছে হয় তবে তিনি সপরিবারে মরবেন।

মনটা খারাপ বলে তিনি সরাসরি বাড়ি গেলেন না। ভাবলেন, নদীর ধারটায় গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাথাটা একটু ঠান্ডা করেন।

তা ওখানকার নদীটা তেমন চওড়া নয়, তবে জলে খুব স্রোত। নদীর ধারটা এই বর্ষার রাতে যেমন অন্ধকার, তেমনি নির্জন। নদীর ধারে একটা গাছের তলায় বসে গোপেনবাবু চুপচাপ অন্ধকারে স্রোতের দিকে চেয়ে রইলেন। বাড়ি গিয়ে সত্যি কথাটা যখন বলবেন তখন কী হবে সেটাই ভেবে তিনি চিন্তিত হচ্ছিলেন। না, ভাগ্যের ওপর তাঁর রাগ নেই, ভগবানের ওপর তাঁর অভিমান নেই, কারও ওপর তাঁর হিংসে নেই, কাউকে তিনি শত্রু বলেও মনে করেন না। যা ঘটে, যা ঘটছে সবই তিনি মেনে নেন।

হঠাৎ দেখলেন, সামনেই নদীর ধার থেকে একটা লোক উঠে আসছে। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি বলেই মনে হল। কিন্তু এত রাতে তো খেয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। লোকটা নদী দিয়ে এল কী করে?

ভদ্রলোক সোজা তাঁর দিকে আসছেন দেখে গোপেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক কাছে এসে বললেন,—আচ্ছা বিদ্যেধরপুর কী করে যাওয়া যায় বলুন তো, আমার বিশেষ দরকার। আমার ছেলের আজ বিয়ে। বরযাত্রীরা বর নিয়ে এগিয়ে গেছে। আমার নৌকোটাই পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু না গেলেই নয়।

গোপেনবাবু অবাক হয়ে বললেন,—কিন্তু বিদ্যেধরপুর যে অনেক দূর। মাইল দশেক তো হবেই। বাস তো কখন বন্ধ হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বললেন, সর্বনাশ! আমি না গেলে যে বিয়ে ভেস্তে যাবে। কোনও উপায় হয় না?

গোপেনবাবু একটু ভেবে বললেন,—আমি একটা গুদামে কাজ করি। ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে ম্যাটাডরওলাদের জানাশুনা আছে। যদি তাতে যেতে চান তবে ব্যবস্থা হতে পারে।

বাঁচালেন মশাই। এখন ম্যাটাডরই আমার পুষ্পক রথ।

গোপেনবাবুকে সবাই ভারী ভালোবাসে। বাজারের একজন ম্যাটাডরওলাকে গোপেনবাবু গিয়ে বলতেই রাজি হয়ে গেল। ভদ্রলোক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। গোপেনবাবু বাড়ি ফিরে এলেন।

পরদিন দুর্বল শরীরে ঘুম থেকে উঠে পুজোপাঠ সেরে একটু চা খেয়ে এক চিলতে বারান্দায় গিয়ে বসে রোদ পোয়াতে লাগলেন। আজ আর কাজে যেতে হবে না। বদ্রীনাথ এ মাসের মাইনেটাও দিয়ে যায়নি। সুতরাং হাঁড়ি চড়বে কি না কে জানে, বসে-বসে তিনি কালকের লোকটার কথা ভাবতে লাগলেন। লোকটা কি ছেলের বিয়েতে গিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হতে পেরেছিল?

বসে বসে একটু ঢুলুনি এসেছিল গোপেনবাবুর।

হঠাৎ গোপেনবাবু, ও গোপেনবাবু, ডাক শুনে চোখ চাইলেন। সামনে কাল রাতের সেই ভদ্রলোক। দিনের আলোয় দেখা গেল, মানুষটির বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা, সুপুরুষ এবং অমায়িক।

গোপেনবাবু শশব্যস্তে উঠে বললেন,—আপনার ছেলের বিয়ে ঠিকমতো হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, সব ভালোয়-ভালোয় মিটে গেছে। কিন্তু ম্যাটাডরওলা বলছিল, আপনার নাকি চাকরি গেছে?

আজ্ঞে, ওরকম ঘটনা তো ঘটেই। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

শুনুন মশাই, সম্প্রতি আমার দিদিমা মারা গেছেন। মরার সময় তিনি আমাকে নগদ দশ লাখ টাকা আর বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। টাকাটা পড়ে আছে সিন্দুকে। ভাবছি এই তায়েরগঞ্জে একটা ব্যবসা করব। আপনার মালিক যা করে তাই। পাইকারি মাল বেচাকেনা। ব্যবসা দেখার সময় আমার নেই। তাহেরপুরে আমার নিজের আরও কয়েকটা বড় কারবার আছে। ব্যবসাটা দেখবেন আপনি। শুনেছি আপনি বড় সৎ লোক। আপনি আমার কর্মচারী হবেন না কিন্তু, হবেন ওয়ার্কিং পার্টনার। ব্যবসার সব দায়িত্ব আপনার। শুধু লাভের অর্ধেকটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। টাকা ফেলে রেখে লাভ কী বলুন, কাজে লাগুক। টাকা যত নড়ে, তত বাড়ে।

গোপেনবাবু ভারী লজ্জায় পড়ে আপত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়লেন না। বললেন,—আমি লোক চিনি মশাই, আমাকে ফেরাতে পারবেন না।

গোপেনবাবু রাজি হলেন, ভদ্রলোক একটা দশ লাখ টাকার চেক কেটে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন,—আজই বড় একটা গোডাউন ভাড়া নিন।

গোপেনবাবু বদ্রীপ্রসাদের ব্যবসার সব মারপ্যাঁচ জানেন। কর্মচারীদেরও চেনেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যবসা জাঁকিয়ে উঠল। বদ্রীপ্রসাদের খদ্দেররা এসে ভিড় করতে লাগল গোপেনবাবুর গুদামে।

মাসখানেকের মধ্যে টাকার বান ডেকে গেল। কিন্তু গোপেনবাবুর মাথা গরম হল না। শান্তভাবে খুব বিচক্ষণতা আর দক্ষতার সঙ্গে তিনি হাল ধরে রইলেন। ভোগ-বিলাসিতার দিকে গেলেন না। অমিতব্যয়ের পথে হাঁটলেন না। সঞ্চয়ে মন দিলেন। ব্যবসা আরও বাড়িয়ে ফেললেন। লাভের অর্ধেক নিয়মিত কৃষ্ণকিশোরবাবুর কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন। সবাই খুশি।

দু-মাস বাদে বদ্রীপ্রসাদ ফিরে নিজের ব্যবসার হাল দেখে মাথা চাপড়াতে লাগল। তার অপদার্থ ভাতিজা ব্যবসা ডুবিয়ে বসে আছে। লোকমুখে গোপেনবাবুর নামডাকও শুনল সে।

একদিন নিজের চোখে গোপেনের ব্যবসা দেখতে এসে বলল,—গোপেন, তুমি আমাকে পিছন থেকে ছুরি মারলে তাহলে?

গোপেনবাবু দুঃখিতভাবে বললেন, না শেঠজি, ছুরি আপনি যে নিজেই নিজেকে মেরে বসে আছেন।

শিবেনবাবু

আচ্ছা মশাই, শিবেন সমাদ্দারের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন, গত দু'ঘণ্টা ধরে খুঁজছি।

শিবেন সমাদ্দার! নাঃ মশাই, এ পাড়ায় শিবেন সমাদ্দার বলে তো কেউ নেই! তা শিবেনবাবু লোকটি কে?

এই তো মুশকিলে ফেলে দিলেন! আমি একটু ভুলো মনের মানুষ কিনা। তা যতদূর মনে পড়ছে শিবেনবাবু হলেন গিয়ে ইনসিওরেন্সের দালাল, কিংবা ডাকঘরের পিওন, নইলে মুদির দোকানদার, আবার হয়তো প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারও হতে পারেন, তবে বলা যায় না, এসব ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে।

দূর মশাই, ওরকম অনুমানের ওপর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় নাকি? তা তার চেহারাটা কেমন?

লম্বাই হবেন বোধহয়। যদি লম্বা হন তাহলে তাঁর দাঁত উঁচু, রোগা কালো আর গোঁফ থাকবে, আর যদি বেঁটে হন তাহলে বেশ আহ্লাদী চেহারা, মোটা-সোটা, রং ফর্সার দিকে, দাড়ি-গোঁফ কামানো।

তাহলে বলতেই হবে যে, আপনি শিবেনবাবুকে চেনেন না।

সেটা বলা ঠিক হবে না। কারণ শিবেনবাবুকে আমার চেনারই কথা, এই মাস ছয়েক আগে তিনি আমার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন, টাকার ঠিক অঙ্কটা একটু কম বা বেশিও হতে পারে। হয়তো আড়াই বা দেড় হাজার হওয়াটা বিচিত্র নয়, পুরো এক হাজারও হতে পারে।

ভাল করে ভেবে বলুন।

আজ্ঞে, খুব ভেবেই নানা সংখ্যা মনে আসছে। যত ভাবছি ততই মনে আরও নতুন নতুন সংখ্যা আসছে। এই তো, এই এখন যেমন হঠাৎ মনে হচ্ছে, টাকাটা হয়তো বা পাঁচ হাজারই হবে।

তো সে যাই হোক মশাই, হুট বলতে একজন অচেনা লোককে অত টাকা ধার দেওয়া আপনার উচিত হয়নি।

না, না, অচেনা হবেন কি করে? শিবেন সমাদ্দারকে যে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে কি আর আজকের চেনা মশাই! বিশ বছর ধরে চিনে আসছি যে!

বিশ বছর!

অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না, দু'চার বছর এদিক-ওদিকও হতে পারে। পনেরো বছর তো নিদেন হবেই। তবে সাবধানের মার নেই মশাই, হিসেবে অনেক সময়ে গড়বড় হয়। তা পাঁচ বছরই বরং ধরে রাখুন। পাঁচ বছরের চেনাই কি কিছু কম হল?

না, পাঁচ বছরও চলবে। তবে কিনা পাঁচ বছরে আর লোককে কতটা চেনা যাবে সেটাই কথা। তাহলে কথাটা হচ্ছে ছয় মাস আগে আপনি শিবেন সমাদ্দার নামে একজন লোককে দুই বা পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন, এই তো।

ঠিক ধরেছেন, তবে ছয় মাস বললুম নাকি?

তাই তো বলেছেন!

তাই হবে বোধহয়। তবে কিনা কেমন যেন মনে হচ্ছে, ওটা এক বছরও হতে পারে। নইলে তিন মাস।

বলি ধারের কোনও লেখাপড়া হয়েছিল কি!

হওয়ারই কথা। শিবেনবাবু খুব বুদ্ধিমান মানুষ কিনা।

তা কাগজখানা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছেন! যা ভুলো মনের মানুষ আপনি!

না না হারাবে কেন? বেরোবার আগে আমার বউ কাগজটা আমার বুকপকেটে গুঁজে দিল যে! এই যে দেখুন না!

দেখি দেখি! দূর মশাই, এ তো বাজারের ফর্দ দেখছি। তেল এক কিলো, তেজপাতা দু'টাকার, মটর ডাল আড়াই কিলো, নটে শাক দু'আঁটি....

তাহলে বোধহয় এইটে, এই যে!

না মশাই, এটাও সে জিনিস নয়। এ তো একটা চিঠি। এক হরিহর বাবাজীবনকে লিখেছে এক নিবারণ সরকার। হরিহরের শাশুড়ি খুব হাঁপানিতে ভুগছে, হরিহরের শালার রক্ত আমাশা, নিবারণ সরকার বাতব্যাধিতে কাবু, হরিহরের ছোটো শালি পরীক্ষায় ফেল হয়েছে, গাছের সব সুপুরি চুরি হয়ে গেছে, এবার আমের ফলন ভাল নয়.....

অ্যাঁ! বলেন কি? এসব তো খুবই দুঃসংবাদ! এ চিঠিতে এসব লেখা আছে বুঝি?

আছেই তো! নিজের চোখেই দেখুন না!

ইস, এ তো খুব চিন্তার বিষয় হল মশাই।

তা নিবারণ সরকার কি আপনারই শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাই?

না না, নিবারণ সরকার আমার শ্বশুর হবেন কি করে? আমি যে ও নামে কাউকে চিনিই না!

বটে! তাহলে নিবারণ সরকারের চিঠি আপনার পকেটে কি করে এল মশাই!

তাও তো বটে!

তাছাড়া নিবারণের খবরে আপনার উদ্বেগেরই বা কারণ কী!

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, আমার একটা খটকা লাগছে, কী নাম বললেন যেন! নিবারণ সরকার, না? হ্যাঁ, তা ভেবে দেখলুম ইনিই বোধহয় আমার শ্বশুর। এরকমই যেন কি নাম! ইস, শ্বশুরমশাই ভারী ঝামেলার মধ্যে আছেন তো!

তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু শিবেন সমাদ্দারের কাগজটা কোথায়?

এই যে! ঐ দেখুন, আরও একটা কাগজ, এটাই হবে। দেখুন তো!

উঁহু, এটাকেও শিবেন সমাদ্দারের কাগজ হিসেবে চালানো যাবে না। এটা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট।

পঞ্চাশ টাকার নোট! বলেন কী?

এই তো দেখুন না!

তাই তো! কাগজটা যে কোথায় গেল! তা মশাই, শিবেন সমাদ্দারের বাড়ি কি এখানে নয়? কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, শিবেনবাবু এই বিষ্ণুপুর গাঁয়ের কথাই আমাকে বলেছিলেন!

বিষ্ণুপুর! এটা বিষ্ণুপুর হতে যাবে কেন? এ তো রাধাপুর।

আহা, না হয় তাই হল। বিষ্ণুপুর বলে কি আর সত্যিই বিষ্ণুপুর! রাধাপুর হওয়াও বিচিত্র নয় কিনা। তবে শিবেন সমাদ্দারের বাড়ি এখানেই হওয়ার কথা।

তাই বা কী করে বলছেন! এটা যে রাধাপুর এটাও আপনি জানতেন না। শিবেন যদি বলে থাকে যে সে বিষ্ণুপুরে থাকে তাহলে তো তাকে রাধাপুরে খুঁজে কোনও লাভ নেই মশাই।

তা অতি সত্যি কথা। তবে শিবেন সমাদ্দার যে বিষ্ণুপুরেই থাকে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। সে হয়তো রাধাপুরই বলেছিল, আচ্ছা এখানে পাইকপাড়া নামে কোনও পাড়া আছে?

না। তবে খাতকপাড়া বলে একটা জায়গা আছে।

ব্যস, তাহলেই তো মিলে গেল, শিবেন সমাদ্দার তাহলে এখানেই ঘাপটি মেরে আছে।

না মশাই, মিলল না। পাইকপাড়া আর খাতকপাড়া এক নয়। বিষ্ণুপুর আর রাধাপুর এক নয়। আর এখানে শিবেন সমাদ্দার নামেও কেউ থাকে না।

তাহলে কি তার নাম শিবেন সমাদ্দার নয়? তাহলে কি ধরে নিতে হবে শিবেন আমাকে ভুল নাম বলে এসেছিল! কিন্তু তাই বা কি করে হবে। তোকে বিশ বছর ধরে চিনি যে! ভুল হওয়ার তো জো নেই। আচ্ছা, শিবেন না হয়ে তার নাম যদি পরেশ হয়—এমনটা তো হতেও পারে!

তা পারবে না কেন? একটা ওকালতনামা দাখিল করলেই কত শিবেন পরেশ হয়ে যেতে পারে! কিন্তু মশাই যদি শিবেনকেই খুঁজতে বেরিয়ে থাকেন তাহলে পরেশকে দিয়ে আপনার কোন কাজ হবে? শিবেন যদি শিবেনই থাকে আর পরেশ যদি পরেশ, তাহলে শিবেনের ধার তো আর পরেশ শোধ করবে না।

না, সে তো ঠিক কথাই, শিবেনের ধার পরেশ শোধ করবেই বা কেন? করাটা উচিতও নয়। কিন্তু কাজটা শিবেন অন্যায় করেছে কিনা বলুন! দশ দশটি হাজার টাকা আজ ক'বছর ধরে আটকে রাখাটা কি তার উচিত হচ্ছে?

টাকার অঙ্কটা বড্ড বাড়িয়ে দিয়েছেন মশাই। অত টাকা কি শিবেন শোধ করতে পারবে?

সেটাও অবশ্য ঠিক। শিবেনের দিকটাও দেখতে হবে।

আচ্ছা আপনি আজ টাকার তাগাদাতেই বেরিয়েছেন?

না মশাই না, টাকার তাগাদায় বেরোবো কেন? আমি তো বেরিয়েছিলুম বাজার করতে। তা হঠাৎ শিবেনের কথা মনে পড়ল। সেই সঙ্গে টাকার কথাটাও।

ওঃ তাই বলুন। টাকার তাগাদা নয় তাহলে?

না, না, টাকার জন্য তাগাদা দেওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

কেন বলুন তো?

সেটা বোধহয় খুব অন্যায় হবে।

কেন মশাই? ন্যায্য টাকা আদায়ে লজ্জাটা কিসের?

হঠাৎ মনে হচ্ছে, শিবেন বোধহয় আমার কাছে ধারটা নেয়নি।

অ্যাঁ!

ব্যাপারটা কি জানেন, আসলে আমিই শিবেনের কাছে ধার দিয়েছিলুম, নাকি শিবেন আমার কাছে নিয়েছিল সেটাই ঠিক মনে পড়ছে না।

অনুসরণকারী

এই যে অবনীবাবু?

অ্যাঁ! কিছু বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলতেই হচ্ছে মশাই, আপনাকে যত দেখছি ততই হতাশ হচ্ছি।

তাই নাকি? তা আপনি কে বলুন তো! আপনাকে তো চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না!

চেনা-চেনা মনে হওয়ার কারণও নেই কিনা। আপনি আমাকে কস্মিনকালেও দেখেননি। এই যে গত দু-ঘণ্টা ধরে আপনার পিছু নিয়েছি সেটা কি আপনি টের পেয়েছেন?

পিছু নিয়েছেন? কী সর্বনাশ! পিছু নিয়েছেন কেন?

সেটা তো ভেঙে বলা যাবে না। বলায় বারণ আছে। শুধু বলছি, আমাকে আপনার পিছু নিতে বলা হয়েছে।

ওরে বাবা! কে বা কারা আপনাকে আমার পিছু নিতে বলল?

সেটাও বলা যাবে না। অনেক প্যাঁচালো ব্যাপার আছে। তবে ব্যাপারটা যে কী তা আমিও ভালো জানি না। পিছু নিতে বলা হয়েছে, আমিও হুকুম তামিল করছি। সঠিক সব খবর জায়গামতো পৌঁছে দিলে কিছু টাকা পাব।

এ তো খুব দুশ্চিন্তার কথা হল মশাই। কেউ টাকা খরচ করে পিছনে স্পাই লাগিয়েছে, এটা তো উদ্‌বেগেরই ব্যাপার!

তা হতে পারে। আপনি হয়তো একজন বিপজ্জনক লোক। হয়তো বিদেশি রাষ্ট্রের চর বা উগ্রপন্থী বা চোরাই চালানদার বা খুনি বা জোচ্চোর কিংবা...

মুখ সামলে! মুখ সামলে! এসব কী বলছেন বলুন তো? আপনার নামে তো মানহানির মামলা করা যায়।

আহা, প্রথমেই মামলা-মোকদ্দমা এনে ফেললেন কেন? আপনার সম্পর্কে এখনও তো কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তাহলে ওসব বললেন যে!

বলিনি। সম্ভাবনার কথা বলছিলাম। কিন্তু মশাই, দু-ঘণ্টা ধরে আপনি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, একবারটিও একটু বেচাল চললেন না। তাহলে পিছু নিয়ে কী লাভ হল বলুন তো?

আচ্ছা মুশকিল! পিছু নিয়ে আপনি কী আশা করেছিলেন বলুন তো?

আশা-ভরসা যাই হোক, সে কথা বলে আর লাভ কী? কিন্তু আপনার ভাবগতিক আমার মোটেই ভালো লাগেনি অবনীবাবু।

কেন, কী এমন খারাপ ভাবগতিক দেখলেন?

ধরুন, অফিস থেকে আপনি পাঁচটা নাগাদ বেরোলেন, আর তক্ষুনি আমি আপনার পিছু নিলাম। ঠিক তো?

তা তো ঠিকই। আমার অফিস পাঁচটাতেই ছুটি হয়।

তারপর আপনি অত্যন্ত গদাইলশকরী চালে হাঁটতে-হাঁটতে গিয়ে হেমন্ত কেবিনে ঢুকলেন।

তাও ঠিক।

হেমন্ত কেবিনে ঢুকে আপনি বাঁদিকে একেবারে কোণের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

বহুৎ আচ্ছা। তারপর?

তারপর আপনি দুটো টোস্ট আর এক কাপ কফির অর্ডার দিলেন। ঠিক কিনা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ঠিক।

দেখলাম, আপনি মরিচ টোস্ট খান, চিনি দেওয়া টোস্ট খান না।

ঠিকই দেখেছেন।

এবং টোস্ট আর কফি খেতে খেতে আপনি টেবিলে পড়ে থাকা সকালের খবরের কাগজখানা বেশ অনেকক্ষণ ধরে পড়লেন।

বটেই তো। আপনি বেশ ভালো গোয়েন্দা দেখছি।

তবু তো মশাই, ওপরওয়ালার গাল ওঠে না। সর্বদাই কাজের ভুল ধরেন।

খুব অন্যায়, খুব অন্যায়। হ্যাঁ, তারপর বলুন।

প্রায় আধঘণ্টা পর টোস্ট আর কফি খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে আপনি উঠলেন। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে হেদো। আচ্ছা মশাই, হেদোর জলে ছেলে-ছোকরাদের দাপাদাপি অত মন দিয়ে দেখার কী আছে বলুন তো! দেখলাম, আপনি খামোখা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন। বলছি, হেদোতে কি কারও সঙ্গে আপনার গোপন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল?

তা ছিল বই কী! বিকেলের দিকে আমার বেয়াইমশাইও ওখানে রোজ আসেন কিনা।

বেয়াইমশাই! হাসালেন মশাই। বেয়াইয়ের সঙ্গে কারও অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে বলে শুনিনি। তবে যাই হোক, লোকটা শেষ পর্যন্ত আসেনি। হয়তো কিছু টের পেয়ে সাবধান হয়েছে।

বাঃ, আপনার অনুমান তো দিব্যি ভালো।

আপনি বললে তো হবে না। ওপরওয়ালা যে খুশি হয় না। যাকগে, তারপর মিনিট কুড়ি বাদে আপনি হেদো থেকে বেরিয়ে ফের হাঁটা ধরলেন। বিডন স্ট্রিটের একটা মনোহারি দোকানে ঢুকে নানারকম জিনিসপত্র দেখতে লাগলেন। স্যান্ডউইচ, ব্রেড, টমেটো সস, ধূপকাঠি, কাসুন্দির শিশি, ফিনাইল, যত সব আলতু-ফালতু জিনিস।

ওরে বাপ! আপনার চোখ তো সাংঘাতিক!

তবে? ফলো করা কী চাট্টিখানি কথা। চারদিকে চোখ রাখতে হয়। কিন্তু সেই দোকান থেকে আপনি পাঁউরুটি ছাড়া আর কিছুই কিনলেন না। বিবেকানন্দ বেকারির এক পাউন্ডের একটা রুটি, তাই না?

খুব ঠিক।

বিবেকানন্দ বেকারির মিল্ক ব্রেড আমারও বেশ প্রিয়।

তাই নাকি? তাহলে তো আপনার সঙ্গে আমার বেশ মিল।

না মশাই, না। আপনি টার্গেট, আমি আপনার শ্যাডো। সম্পর্কটা খুব বন্ধুত্বের নয়। যাক, রুটি কিনে আপনি আরও খানিকটা হাঁটলেন। হেঁটে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ালেন। একজন বউমতো মহিলা দরজা খুলতেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অভয় বাড়ি আছে? বউটি বলল, না, বার্নপুর গেছে।

তাও শুনেছেন?

হ্যাঁ। বুঝতে পারলাম না, অভয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী? হতে পারে, এই অভয়ই আপনার সহ-ষড়যন্ত্রকারী।

মন্দ বলেননি। কথাটা ভেবে দেখতে হবে। তবে এমনিতে অভয় আমার পুরোনো কলিগ।

তা তো বলবেনই। সত্যি কথা কী এত সহজে বের করা যায়?

সে তো বটেই। কিন্তু সত্যি কথাটা কী তা কি আন্দাজ করেছেন?

তা আর করিনি। গভীর ষড়যন্ত্র মশাই, গভীর ষড়যন্ত্র। অপরাধবিজ্ঞানে বলা আছে, প্রকৃত ভয়ংকর অপরাধীদের বাইরের আচরণ দেখে তাদের মতলব বোঝা অসম্ভব। একজন খুনিকে হয়তো বাইরে থেকে খুবই নিরীহ বলে মনে হয়। আপনকে দেখেও আমার অনুমান, আপনি অপরাধ জগতের খুব উঁচুদরের খেলোয়াড়। টোস্ট, কফি খাওয়া, সাঁতার দেখা, পাঁউরুটি কেনা বা অভয়ের খোঁজ করা এসবের মধ্যেও একটা গভীর অপরাধপ্রবণ মন নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, ধরা যাচ্ছে না।

চমৎকার। তারপর কী হল?

হ্যাঁ, অভয়কে না পেয়ে আপনি হঠাৎ ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে গেলেন। সেই দুলকি চালে হাঁটা, কোনো উদ্‌বেগ বা তাড়াহুড়ো নেই। হাঁটতে-হাঁটতে বড়ো রাস্তায় এসে আপনি একটা বুকস্টলের সামনে দাঁড়ালেন। ঠিক কিনা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।

বুকস্টলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাঁউরুটিটা বগলে চেপে ধরে পত্রপত্রিকা দেখতে লাগলেন। এইখানে আমার একটু আপত্তি জানিয়ে রাখি। পাঁউরুটি একটা খাবার জিনিস। সেটাকে বগলে চেপে রাখাটা মোটেই উচিত কাজ নয়। মানুষের বগলে ঘাম এবং দুর্গন্ধ থাকেই। পাঁউরুটিটা বগলে চেপে রাখাটা কি আপনার উচিত হয়েছে?

আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কাজটা ঠিক হয়নি। এবার থেকে ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি সজাগ ও সতর্ক থাকব।

হ্যাঁ, আপনি স্টলে দাঁড়িয়ে মোট তিনটে পত্রিকা দেখেছেন। একটা লাইট অফ এশিয়া, একটা ইনলুকার এবং একটা বাংলা পত্রিকা স্বপ্নানন্দা। ঠিক বলেছি?

এ-পর্যন্ত আপনার সব অবজার্ভেশনই নিখুঁত। বলে যান।

ওই বুকস্টলে আপনার সময় লাগল আধঘণ্টা। আপনি বাংলা মাসিকপত্রটা কিনেও ফেললেন। সেটা এখন আপনার হাতেই রয়েছে। অবশ্য জানি না ওই পত্রিকা কেনাটাও কোনো সংকেত কিনা। ওর মধ্যেই হয়তো আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার হালহদিশ রয়েছে।

থাকতেই পারে, থাকতেই পারে। বিচিত্র কী? তারপর?

তারপর থেকে আপনি এসে এই পার্কে বসে আছেন। হয়তো এখানে আপনার সঙ্গে কারও একটা রাঁদেভু হবে। কিন্তু মশাই, সেটা আর কখন হবে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি না। সন্ধে সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেল যে!

ব্যস্ত হবেন না। কেল্লা তো প্রায় মেরেই দিয়েছেন। ওই যে দেখছেন, মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা এদিকে আসছেন ওঁর সঙ্গেই আমার রাঁদেভু। উনিই আমার অপারেটর। যত খুনখারাপি, স্মাগলিং আর দুষ্কর্ম আছে সব কাজ উনিই পরিচালনা করেন।

বটে!

হ্যাঁ। তবে বাইরে থেকে দেখে বুঝবেন না। হাতে শাঁখা-পলা, সিঁথিতে সিঁদুর। একেবারে গিন্নিবান্নির মতো চেহারা। কিন্তু ফুলন দেবীর চেয়েও ভয়ংকর।

সর্বনাশ! উনি কে বলুন তো?

উনিই বিদিশা দেবী। আমার স্ত্রী।

নিত্যানন্দ পালের খোঁজে

আচ্ছা মশাই, মহেশ চাটুজ্জের বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন?

মহেশ চাটুজ্জের বাড়ি খুঁজছেন? কেন মশাই, এ শহরে এত বাড়ি থাকতে মহেশ চাটুজ্জের বাড়িই খুঁজছেন কেন? মহেশ কিন্তু বজ্জাতের ধাড়ি। আপনি কি পাওনাদার নাকি?

আজ্ঞে ঠিক তা নয়। আসলে মহেশ চাটুজ্জের সঙ্গে আমার চেনাজানাও নেই। তবে তাঁর বাড়িটা খুঁজে পেলে শ্যামবাবুর খোঁজ পাওয়া সহজ হত আর কী। মহেশ চাটুজ্জের বাড়ির উলটোদিকে নীলমণি লেন। সেই নীলমণি লেন ধরে ঠিক একশো চুয়াল্লিশ পা হাঁটলে বাঁ হাতে চারু ঘোষের বাড়ি পড়বে। চারু ঘোষকে চেনেন কি?

চারু ঘোষ! তাঁকে চিনতে চাইছেন? তা এত মানুষ থাকতে হঠাৎ চারু ঘোষকেই বা চিনতে চাইছেন কেন? ওরকম হাড়কেপ্পনকে কেউ চিনতে চায়?

আজ্ঞে না, চারু ঘোষকে না চিনলেও ক্ষতি নেই। তবে তার বাড়িটা খুঁজে পেলে, বাড়ির দক্ষিণদিকে পুবমুখো রাস্তাটাও পাওয়া যাবে কিনা। আর ওই রাস্তাতেই দিকপতি ঘোষালের বাড়ি। চারু ঘোষের বাড়ি থেকে বড়োজোর এক ফার্লং হবে।

দিকপতি ঘোষালের সঙ্গেই বা আপনার কীসের দরকার মশাই? ষণ্ডাগুন্ডা লোক। ওর সঙ্গে মাখামাখি না করাই তো ভালো।

না না, দিকপতি ঘোষালকে আমার মোটেই দরকার নেই। আসলে দিকপতি ঘোষালের মামাতো ভাই হলেন ভবেন লাহিড়ী।

সর্বনাশ, এর মধ্যে আবার ভবেন লাহিড়ীকেও এনে ফেললেন! না মশাই, আপনি তো বিপদে পড়বেন দেখছি! এই তো চার মাস জেল খেটে এল। আপনি যদি পুলিশের লোক হয়ে থাকেন তাহলে অন্য কথা, নইলে ভবেন লাহিড়ীর খোঁজ করাটা ঠিক কাজ হবে না।

ঠিকই বলেছেন, আসলে ভবেন লাহিড়ীর ঠিকানাটার হদিসটা জানতে পারলে একটু সুবিধে হত আর কী। শুনেছি ভবেন লাহিড়ী তিরানব্বই-এর এক বাই দুই বাই তেইশ নম্বর বলভদ্র নস্কর স্ট্রিটে থাকেন। আর ও-বাড়িরই পিছন দিককার রাস্তা ধরে সাতচল্লিশ পা এগোলে নকুল নাগের ভূষিমালের দোকান, তাই না?

ভূষিমালের দরকার হলে নকুল নাগ কেন, বিস্তর নাগ-নাগিনী আছে। নকুল নাগের দোকান থেকে ভূষিমাল কিনতে হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি দেওয়া আছে কি? নকুল নাগ দিনে-দুপুরে লোক ঠকায়।

আজ্ঞে না। কেনাকাটার জন্য আসিনি মশাই। কেনাকাটার ব্যাপার নয়। আসলে নকুল নাগের দোকানের পরই পরেশবাবুর গোডাউন, সেটা ছাড়িয়ে বিশ পা হাঁটলেই অন্নপূর্ণা পাইস হোটেল, আর ওই পাইস হোটেলের ডান ধার ঘেঁষে বাঞ্ছা ঘোষ লেন গোঁত্তা খেয়ে ঢুকে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া করতে চান তো! তার জন্য এখানে বিস্তর হোটেল আছে! অন্নপূর্ণা পাইস হোটেলেই খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অতি রদ্দি দোকান মশাই, পচা মাছ, বাসি ভাত, ময়লা বাসন।

খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে মশাই, মহেশ চাটুজ্জের বাড়ি খুঁজে না পেলে যে সমূহ বিপদ।

বিপদ। বলেন কী মশাই? এ তো ভারি ভালো খবর। কারও বিপদ-আপদের কথা শুনলেই আমার মনটা ভারি নেচে ওঠে। তা কীরকম বিপদ আপনার?

আজ্ঞে সমূহ বিপদ। ওই মহেশ চাটুজ্জের বাড়ির নিশানা ধরে চারু ঘোষের বাড়ি খুঁজে বের করে, সেই বাড়ির খুঁটি ধরে দিকপতি ঘোষালের—

আহা, ও তো একবার হয়ে গেছে। আপনি ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা হোটেলে পৌঁছেও গেছেন। আসলে যেতে চাইছেন কোথায়?

আজ্ঞে সেটাই তো ফেঁদে বলছিলাম। অন্নপূর্ণা হোটেল পেয়ে গেলে আর কোনো চিন্তা নেই। ওখান থেকে হেলেদুলে হাঁটলেও দুলাল বিশ্বাসের বাড়ি পাঁচ মিনিটের পথ।

ওরে বাবা। দুলাল বিশ্বাসের মতো প্যাঁচালো লোক যে ভূ-ভারতে নেই। ভালো কথারও এমন বাঁকা মানে করবে যে হাঁ হয়ে যেতে হয়। তা দুলাল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার কী দরকার আপনার মশাই?

সে তো বটেই, দুলাল বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার তেমন কোনো ইচ্ছেও নেই আমার। তবে কিনা দুলাল বিশ্বাসের বাড়ির উলটোদিকে যে মাঠটা আছে সেটা কোনাকুনি পেরোলেই রামরতনের গোয়াল। চেনেন নাকি?

আর বলবেন না মশাই, রামরতনকে তল্লাটের সবাই হাড়েহাড়ে চেনে। দুধ না ঘড়িগোলা জল তা বুঝবার উপায় নেই। সেই দুধ থেকেই তো তিনতলা বাড়ি করে ফেলল মশাই। খবরদার, ওর কথায় ভুলে আবার দুধের বন্দোবস্ত করে ফেলবেন না।

না, দুধের তেমন দরকারও নেই আমার, ছেলেবেলা থেকেই আমার দুধে অরুচি।

আমার আবার একটু দুধের সর না হলে রাতের খাওয়াটাই পুরো হয় না। কিন্তু রামরতনের দুধে সর খোঁজার চেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে সর খোঁজা ভালো, তা রামরতনকে আপনার কীসের দরকার?

না না, রামরতনের সঙ্গে আমার কোনো দরকারই নেই, তবে তার গোয়ালঘরটা চিনে নেওয়াটা ভালো। কারণ ওই গোয়ালঘর থেকে ঈশানকোণে কয়েক পা এগোলেই মদনবাবুর হলুদ দোতলা বাড়ি বলে শুনেছি।

ওঃ, মদন আবার বাবু। আর হাসাবেন না মশাই, মদন যদি বাবু হয় তাহলে তেলাপোকাও পক্ষী। মদনকে লোকে কি নামে চেনে জানেন? মারু মদনা। অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। ওই মদনের পাল্লায় পড়লে সর্বনাশের আর দেরি নেই জানবেন।

সে তো ঠিকই মদনবাবুর পাল্লায় পড়ে আমার কাজটাই বা কী বলুন। মদনবাবুকে নয়, তার বাড়িখানা পেয়ে গেলে আর চিন্তা নেই। ওই বাড়ির সামনে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে না?

তা থাকতে পারে, ল্যাম্পপোস্টের অভাব কী এখানে। সর্বত্র ল্যাম্পপোস্ট পাবেন।

আজ্ঞে, তা তো বটেই। তবে ওই ল্যাম্পপোস্টটার একটা আলাদা ব্যাপার আছে।

কী ব্যাপার বলুন তো। ওই ল্যাম্পপোস্টের নীচে কিছু পোঁতা-টোঁতা আছে নাকি?

তা থাকতেও পারে, তবে আমার সে খবর জানা নেই।

তাহলে ল্যাম্পপোস্ট দিয়ে কী হবে মশাই, আপনি তো আর বিদ্যাসাগরের মতো ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লেখাপড়া করবেন না।

আজ্ঞে না, লেখাপড়ার পাট কবেই চুকেবুকে গেছে।

তবে?

আসলে ওই ল্যাম্পপোস্টটাকে এক নম্বর ধরে পশ্চিম দিকে এগোতে-এগোতে বারো নম্বর ল্যাম্পপোস্টের লাগোয়া বাড়িটাই হচ্ছে সনাতন সরখেলের বাড়ি।

আ মোলো! সনাতন সরখেল যে মাথা-পাগলা লোক। দিনরাত আপনমনে বিড়বিড় করে, বাতাসে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটে। অঙ্কের মাস্টার ছিল, বুঝলেন? অঙ্কে ভারি পাকা মাথা। আর ওই আঁক কষে কষেই তো মাথাটা গেল। তা আপনি কি অঙ্কে কাঁচা?

বেজায় কাঁচা মশাই, বেজায় কাঁচা। তবে সেইজন্য নয়, সনাতন সরখেলের বাড়ির লাগোয়া নরেন ঘড়াই লেন, আর ওই নরেন ঘড়াই লেনের সাতচল্লিশ বি বাড়িটা হল খগেনবাবুর।

খগেনবাবু! খগেনবাবুর সারা গায়ে চুলকুনি মশাই। দিনভর কেবল ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে সারা শরীর চুলকে যাচ্ছেন, কথা কইবার ফুরসত নেই। বড়ো ছোঁয়াচে রোগ, খগেনবাবুর ধারে-কাছে যাবেন না, আপনার ভালোর জন্যই বলছি।

চুলকুনিকে আমি বড়ো ভয় পাই। তবে রক্ষে এই যে, খগেনবাবুর সঙ্গে আমার কোনো দরকার নেই। তাঁর বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে বাঁহাতি তিন নম্বর রাস্তাটা ধরে এগোলেই গিরীশ বাগের বাজার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো কাছেই।

আজ্ঞে, আর সেই গিরীশবাবুর বাজার পেরিয়ে ছাতুওলা গলির মুখেই নিত্যানন্দ পালের বাড়ি।

তা তো বটেই। আর আমিই নিত্যানন্দ পাল। কিন্তু নিত্যানন্দ পালের সঙ্গে আপনার কাজটা কী?

আসলে হরিপদ বৈরাগী হল বন্ধু মানুষ। তা তার সঙ্গে আমার একটা বাজি হয়েছে। একটা কাজ করতে পারলে সে আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দেবে।

অ, তা কাজটা কী?

হরিপদ নিত্যানন্দ পালকে একদম পছন্দ করে না। নিজের ভায়রাভাই হওয়া সত্ত্বেও সে সর্বদাই বলে যে, নিত্যানন্দ পালের মতো এমন হাড়ে হারামজাদা নাকি তল্লাটে দুটো নেই। নিত্যানন্দ নাকি সাংঘাতিক ঝগড়ুটে, ধার নিয়ে শোধ দেয় না, হাড়কেপ্পন, লাগানি-ভাঙানি করে বেড়ায়, জলের মতো মিথ্যে কথা বলে, কথা দিয়ে কথা রাখে না, ওঃ সে বলতে গেলে মহাভারত—

তাই বুঝি! হরিপদর এত সাহস!

যে আজ্ঞে। তাই সে আমাকে বলেছে নিত্যানন্দের পেটে যদি একটা রামচিমটি কেটে পালিয়ে আসতে পারিস তবে তোকে পঞ্চাশ টাকা দেব। তাই আপনার কাছে আসা।

অ্যাঁ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চকবেড়ের গোহাটায়

চকবেড়ের গোহাটায় গরু কিনতে গিয়েছিল পানাই মণ্ডল। চকবেড়ে অঞ্চলটা তেমন চেনা নয় তার। যাতায়াতই নেই। তবে নামটা জানা ছিল। আর এই গোহাটাই পরগনায় সবচেয়ে বড়। তার বউ বলে দিয়েছে, ওগো, আজকাল যে সব হাতির মতো বড় বড় জারসি গরু, পাঞ্জাবি গরু বেরিয়েছে ওগুলো কিনো না। ওই বিরাট গরু দেখলে বাপু ভয় করে। একটা লক্ষ্মীমন্ত দেখে দিশি গরু কিনে এনো।

পানাই মণ্ডল গরুর মর্ম তেমন জানে না। এতকাল গাইগরু পোষার মতো অবস্থাই ছিল না তার। পর পর বছর চারেক ভালো বর্ষা হওয়ায় চাষটা কপালজোরে ভালোই হয়েছিল। তার ওপর নিমাই নস্কর নামে একটা চাষবাসে পাশ করা ছোকরা এসে তাকে অকালের ফসল ফলানো শিখিয়েছে। সেইসব করে হাতে কিছু বাড়তি পয়সা চলে এল। তাইতেই পাকা ঘর হল, একটা টিউবওয়েল বসাল, শ্যালো কিনে ফেলল, বউ ফুলুরানি বায়না ধরল, গরু না রাখলে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী আসে না। অতএব গরু একটা চাই।

তা সে আর বেশি কথা কি! ট্যাঁকে টাকা নিয়ে পানাই অগত্যা গোহাটায় চলে এসেছে। মুস্কিল হল গরু সে ভালো চেনে না। তার জমি চাষ হয় ভাড়া করা ট্র্যাকটরে। সুতরাং বলদ রাখারও ঝামেলা পোয়াতে হয়নি কোনওদিন। অভিজ্ঞতা না থাকলে ঠকে যাওয়া আর বিচিত্র কি। সেই জন্য একজন জানবুঝওয়ালা লোককে সঙ্গে আনবে ভেবে পীতাম্বরকে ধরেছিল। কিন্তু পীতাম্বরের শাশুড়ির এখন-তখন অবস্থা, খবর পেয়ে সে জলেশ্বরে চলে গেছে। পানাই সুতরাং তার বড় শালা ঝিকুকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ঝিকু বলল, জামাইদা, গরুর বিষয়ে আমার তেমন জ্ঞানই নেই।

তবু দুই আনাড়িতেই এসেছে আজ।

চকবেড়ের গোহাটায় ঢুকে তাদের চোখ চড়কগাছ। সমস্ত জায়গাটা গরু-গরু গন্ধে একেবারে ভোঁ-ভোঁ করছে। তেমনই ধুলো উড়ছে। গোবর আর গোচোনায় একেবারে নান্দিভাস্যি ব্যাপার। তার সঙ্গে হাজারে বিজারে মাছি আর পোকামাকড় একেবারে ঝেঁপে ধরেছে চক্করটাকে।

ঝিকু নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলে, ওরে বাবা, এ তো দেখছি নরক গুলজার!!

শুধু গরু নয়। নামে গোহাটা হলেও পাঁঠা-ছাগলের ব্যাপারীরাও বিস্তর জড়ো হয়েছে। সুতরাং দিশাহারা অবস্থা। বিস্তর খদ্দেরেরও আগমন ঘটেছে। ব্যাপার দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে পানাই বলে, ওরে ঝিকু, এ তো আমাদের বাঁশবনে ডোম কানা অবস্থা রে! কেউ কি আর আমাদের পাত্তা দেবে?

ঝিকু আনাড়ি হলেও চালাক-চতুর। তার ওপর বি এ পাশ করে এম এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। বলল, লোকে যেন আনাড়ি বলে বুঝতে না পারে।

ঘোরাঘুরি করতে করতেই হঠাৎ একটা বেঁটেমতো লোক জুটে গেল সঙ্গে। চোখে-মুখে ভারী মোলায়েম গদগদ ভাব। চোখে ধূর্তামি। খুব মাখো মাখো গলায় বলল, গরু কিনবেন নাকি কর্তা? আমি হলুম গে লালমোহন, লোকে বলে গরুর জহুরি। তা কী গরু চাই? পছন্দসই যদি কিনিয়ে দিতে পারি তাহলে ওয়ান পারসেন্ট দালালি দিয়ে দেবেন।

পানাই একটু ভাল মানুষ গোছের, হয়তো রাজি হয়ে যেত, কিন্তু ঝিকু ফস করে বলে বসল, ওহে বাপু, আমাদের গরু নিয়েই কারবার, নবগ্রামে আমাদের গোশালা গিয়ে দেখে এসো, চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

লোকটা ভড়কাল না। বলল, তা তো বটেই। গোশালা যখন আছে তখন গরু চিনবেন বৈকি। তবে কিনা গোহাটায় অনেক বড় বড় গরুর ব্যাপারীও ঘোল খেয়ে যায় কিনা। গত হপ্তায় শিবেন মান্নার মতো পাকা লোককেও এক ব্যাপারী বুড়ো গরু গছিয়ে হাওয়া হল।

পানাই একটু ভয় খেয়ে বলল, তাহলে তো খুব ভাবনার কথা হে!

তা তো বটেই। তারপর ধরুন চোরাই গরুর ব্যাপার আছে, রোগী গরুর ব্যাপার আছে, বন্ধ্যা গরুর ব্যাপার আছে। গরু নিয়ে মহাভারত হয়ে যায় কর্তা। গত বিশটি বছর এই গোহাটার সঙ্গে লেপটে আছি। গো-শাস্ত্র এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি।

পানাই মণ্ডল বলল, তা তো বটেই।

ঝিকু বলল, ঠিক আছে, ভাল গরু দেখিয়ে দেবে চলো। ভাল গরু যদি সস্তায় পাই তাহলে দালালি নয় বাপু, পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারি।

লালমোহন মাথা নেড়ে বলে, তা হবে না কর্তা। অত কমে পেরে উঠব না। দালালি করে খাই, আমারও ঘরে বালবাচ্চা আছে, খরচাপাতি আছে, এই দালালিই সম্বল। আরও জনা কুড়ি দালাল নানা এলাকা ভাগ করে কাজকারবার করছে, লড়ালড়ি তো কম নয় মশাই।

গাঁইগুঁই করে পানাই নিমরাজি মতো হল। ঝিকু লোকটার সঙ্গে বিস্তর দরাদরি করে হাফ পারসেন্টে রাজি করাল।

তবে লালমোহন লোকটা বেশ কাজের। প্রথমেই যে ব্যাপারীর কাছে নিয়ে গেল সে লোকটাকে দেখলে মায়া হয়। ভারী দীন-দুঃখী চেহারা, দুটি ছোটো গরু নিয়ে হাটের একটা একটেরে কোনায় সকলের চোখের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। গরু দুটোও ভারী ঠান্ডা, লোকটার মতোই।

দুটো গরুই ভারী পছন্দ হয়ে গেল পানাইয়ের। তার মধ্যে সাদায় বাদামি ছোপওলা গরুটা যেন তার দিকে চেয়ে চোখের ভাষায় কিছু বলতে চাইছিল।

সে ব্যাপারীকে বলল, এটির কত দাম নেবে গো ব্যাপারী?

রোগাভোগা মানুষটা ক্ষীণ গলায় বলে, যা ভাল বুঝবেন দেবেন।

ঝিকু আর লালমোহন মাঝখানে পড়ে বিস্তর ঝামেলা পাকিয়ে তুলল। লালমোহন বলল, ছ'হাজারে ছেড়ে দাও গো ব্যাপারী।

ঝিকু ফুঁসে উঠে বলল, তার মানে? তুমি দর হাঁকবার কে হে বাপু? দালালি চাও সে পরে দেখা যাবে। দরদাম তো আমরা করব। তুমি দূরে গিয়ে দাঁড়াও।

লালমোহন বলল, এ গরুর দাম আট-দশ হাজারের নীচে নয় কিন্তু। তোমাদের ভালর জন্যই বলছিলাম।

তোমাকে আর আমাদের ভাল দেখতে হবে না। আমাদের ভাল আমরা বেশ বুঝি।

লালমোহন যে সুবিধের লোক নয় তা বুঝে নিতে বেশি সময় লাগল না। কারণ লালমোহন বলে বসল, ব্যাপারীরা পেটের দায়ে অনেক সময় কম দামে গরু বেচে দেয় বটে, কিন্তু সেটা ধর্মত ন্যায্যত ঠিক নয়। গরুর একটা ধরাবাঁধা দাম তো আছে হে বাপু।

ঠিক এই সময়ে সবাইকে চমকে দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠ বলে উঠল, দাম চার হাজার টাকা।

লালমোহন চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর রুখে উঠে বলল, চার হাজার! বললেই হল চার হাজার। কে বলল কথাটা শুনি?

কিন্তু কেউ কোনও সাড়াশব্দ করল না আর।

কাঁচুমাচু মুখে গরুর ব্যাপারী পানাইকে বলল, আজ্ঞে কর্তা, ওই চার হাজার দিয়েই গরুটা নিয়ে যান। বড় ভাল গরু।

পানাই বলল, তাহলে গরুটা বেচছো কেন হে? রেখে দিলেই তো পারতে।

লোকটা মাথা নেড়ে বললে, গরু তো আমার নয় বাবু। গরুর মালিক পরমেশ্বর রায়। তাঁর গোয়ালে অনেক গরু। গরু বেশি হলে বেচে দেন। আমি হলুম তাঁর রাখোয়াল। পয়সা থাকলে আমিই কিনে নিতুম মশাই। কিন্তু আমাকে বেচলেও চার হাজার টাকা উঠবে না। তবে বলে রাখছি বাবু, গরুটা হাতছাড়া করবেন না। আপনাকে দেখলে ভাল লোক বলে মনে হয়, তাই বলছি।

লালমোহন তড়পে উঠে বলল, ও তুমি পরমেশ্বর রায়ের রাখাল! দিনে-দুপুরে তাকে ঠকাচ্ছো? দাঁড়াও, আজই পরমেশ্বরবাবুর কাছে গিয়ে তোমার নামে নালিশ জানিয়ে আসব।

ঝিকু তেড়ে উঠে বলল, তুমি কার দালাল বলো তো হে লালমোহন! আমাদের কাছে দালালি চাইছো, আর আসল দালালি করতে লেগেছো গরুর মালিকের? তুমি তো ফেরেব্বাজ লোক হে! দু'মুখো সাপ!

ফের সেই গমগমে গলাটা বলে উঠল, ও কিন্তু গরুচোর।

লালমোহন রাগে একটা লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কে, কে বলল কথাটা? কার এত আস্পর্দা?

কেউ অবশ্য টুঁ শব্দটিও করল না।

লালমোহন আগুন চোখে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখে বলল, এ তল্লাটে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে কেউ পার পাবে না। এই গোহাটায় আমার কথাই আইন। এই গরুর দাম ছয় হাজার টাকার এক পয়সা কম নয়। কিনতে হয় কেনো, নইলে কেটে পড়ো!

ঝিকু ঘুঁসি পাকিয়ে বলে, বললেই হল?

পানাই মণ্ডল ভীতু মানুষ, তাড়াতাড়ি দুজনের মাছখানে পড়ে বলল, হাঙ্গামায় কাজ নেই বাপু, গরু আমি আর কিনছি না। গরু কেনার এত ঝামেলা জানলে কে এত দূরের গোহাটায় আসত। ঘাট হয়েছে লালমোহনবাবু, আমি গরু নেবো না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই গুরুগম্ভীর গলায় ফের দৈববাণী হল, ও গরু তোমার। নিয়ে যাও। লালমোহন পাজি লোক।

লালমোহন দিশাহারার মতো চারদিকে চাইল। কিন্তু কথাটা কার মুখ থেকে বেরোল সেটা বুঝতে পারল না। চারদিকে বিস্তর ক্রেতা-বিক্রেতা, ফড়ে দালালের ভিড়, গোলমালে কান পাতা দায়। এর মধ্যে এই বাজ ডাকা গলায় কে মাঝে মাঝে কথা কয়ে উঠছে তা সে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ মস্তানি ঝেড়ে ফেলে সে পানাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন মশাই, ওই চার হাজার দরের কমিশনটা দিয়ে ফেলুন তো। তারপর গরু নিয়ে চলে যান।

পানাই গোলমাল এড়ানোর জন্য ট্যাকে হাত দিয়েছিল টাকাটা দিয়ে ফেলবে বলে। কিন্তু আচমকাই শান্ত, ছোটোখাটো গরুটা এগিয়ে এসে দুম করে একটা প্রবল টুঁসো মেরে দিল লালমোহনকে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে লালমোহন "বাবারে" বলে চেঁচিয়ে চোখ উল্টে ফেলল।

গরুর ব্যাপারী ভারী অবাক হয়ে বলল, বড় আশ্চর্য কাণ্ড মশাই। সাবিত্রী বড় ঠান্ডা স্বভাবের গরু। কখনও কাউকে ঢুঁ দেয়নি আজ অবধি। তা যাই হোক, এসব কাণ্ড দেখে বড় ঘাবড়ে গেছি। গরু আপনিই নিন।

খুশি মনে টাকা গুনে দিয়ে গরু সাবিত্রীকে নিয়ে হাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পানাই। মাঠের ভিতর হাঁটা পথ ধরে পানাই বলল, হ্যাঁরে ঝিকু, কাণ্ডটা কিছু বুঝলি?

ঝিকু মাথা নেড়ে বলল, না জামাইদা, অশৈলী কাণ্ড। কথাগুলো কে বলল বলো তো!

ঠোঁট উল্টে পানাই বলল, কিছুই বুঝলুম না, মনে হল দৈববাণী-টৈববাণী কিছু হচ্ছে, একটু ভয়-ভয় করছে যেন।

তা আমারও কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। কিন্তু জামাইদা, চারদিকটা কেমন হঠাৎ থম মেরে গেছে দেখছো?

তাই তো রে! আকাশের রংটাও তো ভাল নয়। ঝড় আসবে বুঝি। ঘূর্ণিঝড় এলে এরকমটা হয়। এত বড় ফাঁকা মাঠে ঝড়ের মুখে পড়লে যে বিপদ হবে রে!

ছোটো জামাইদা।

ছোটার কি উপায় আছে! গরুটা রয়েছে না!

গরুটা তোমার ট্যাটন আছে জামাইদা। লালমোহনকে কেমন ঢুঁসোটা মারল বলো!

সেইটেও চিন্তার কথা রে! এত ঠান্ডা স্বভাবের গরু হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল কেন বল তো!

গরুটা এলেবেলে গরু নয় জামাইদা। কিন্তু পা চালাও, ঝড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছো? উড়িয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু!

খোলা মাঠে ঝড়টা একেবারে উন্মাদের মতো ধেয়ে আসছিল। দূর থেকেই তার ডাকাতের মতো হাঁকার শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে একটা গুম গুম মেঘভাঙা আওয়াজ আর বাজের ঝিলিক।

হঠাৎ দড়িতে একটা হ্যাঁচকা টান পড়ায় পড়ো-পড়ো হয়ে ছুটতে লাগল পানাই। চেঁচিয়ে বলল, ঝিকু, ধর আমাকে, গরুটা পালাচ্ছে যে।

ঝিকু এসে তার একটা হাত চেপে ধরল বটে, কিন্তু আটকাতে পারল না। গরুর টানে দুজনেই প্রাণপণে ছুটতে লাগল এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে। প্রচণ্ড বাতাস আর ধুলোয় দিক ঠিক রইল না। একটা ছোটোখাটো গরুর গায়ে যে এত জোর আর এত বেগে ছুটতে পারে সেটা তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

কিন্তু ঝড়টা তাদের পেড়ে ফেলার আগেই সেই গরুটা মাঠটা আড়াআড়ি পার হয়ে একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে এনে ফেলল তাদের। চারদিকে বড় বড় গাছ। তাতে আড়াল হওয়া একটা পড়ো-পড়ো বাড়ি। তবে দেউড়ির পর একখানা দালান গোছের জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। শালা-ভগ্নীপোত গরু সমেত ঢুকে পড়ল সেখানে। আর তখনই বাইরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ল। কয়েকটা গাছ উপড়ে প্রায় উড়ে গিয়ে দূরে আছড়ে পড়ল। ঘরটাও থরথর করে কেঁপে উঠছিল বাতাসের ধাক্কায়। ভারী হতভম্ব হয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

ঝড় যখন থামল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাইরে বেরিয়ে কিন্তু তারা কোথায় এসেছে আর কোনদিকে গেলে গাঁয়ে পৌঁছোনো যাবে তা ঠাহর করতে পারল না। অন্ধকারে চারদিকটা একদম লেপাপোঁছা।

ওরে ঝিকু, এ তো বড় বিপদেই পড়া গেল।

তাই তো জামাইদা! এই অন্ধকারে কোনদিকে যাওয়া যায়?

হাতের দড়িতে মৃদু টান পড়তেই হাঁটতে হাঁটতে পানাই বলল, আয় ঝিকু, সাবিত্রীর পিছু পিছু যাই চল। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কি জানি বাপু, গরুটা বোধহয় সাক্ষাৎ ভগবতী।

আশ্চর্যের বিষয়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গরু নিয়ে তারা গাঁয়ের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়তে পারল।

ঝিকু, সাবিত্রী কি করে আমাদের গাঁ চিনল বলতে পারিস?

না দাদা, আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।

বাড়ি আসতেই শাঁখ আর উলুধ্বনি দিয়ে পানাইয়ের বউ গরুকে বরণ করে চাল কলা আরও কি সব মেখে খেতে দিল। বাচ্চারা এসে গরুর গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

পানাই বলল, লক্ষ্মী গরু চেয়েছিলে, কপালজোরে তাই মিলিয়ে দিয়েছেন ভগবান। মা লক্ষ্মীকে পেন্নাম করো সবাই।

সাবিত্রী ভারী খুশি হয়ে ডাক ছাড়ল, হাম্বা।

কবচ

আরে হরিপদবাবু যে! প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম।

প্রাতঃপ্রণাম। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না মশাই?

তার তাড়াহুড়ো নেই, ক্রমে ক্রমে চিনবেন। আগে কুশলপ্রশ্নাদি সেরে নিই তারপর তো অন্য কথা। তা বলি আপনার খিদেটিদে ঠিকমতো হচ্ছে তো? রাতে বেশ সুনিদ্রা হয় তো? কোষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে তো?

দেখছেন তো মশাই, বাজার যাচ্ছি। এখন কী আর এত খতেনের জবাব দেওয়ার সময় আছে?

কিন্তু হরিপদবাবু, প্রশ্নগুলোকে তুচ্ছ ভাববেন না। এসব প্রশ্নের পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্যও থাকতে পারে তো। এই যে ধরুন, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাতে ভালো ঘুমোননি, নানারকম দুশ্চিন্তা করেছেন। আপনার তেমন খিদেও হচ্ছে না বলে মুখখানা আঁশটে করে রেখেছেন। কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না বলে আপনার মেজাজটাও বেশ তিরিক্ষি। ঠিক কি না!

তা খুব একটা ভুলও বলেননি বটে। আপনার মতলবখানা কী বলুন তো?

চলুন, বাজারের দিকে হাঁটতে-হাঁটতেই দুটো কথা কয়ে নিই।

কথা কওয়ার উদ্দেশ্যটা কী একটু বলবেন? খামোখা একজন উটকো লোকের সঙ্গে হাপরহাটি বকে মরার সময় আমার নেই।

আহা, চটে যাচ্ছেন কেন? ষষ্ঠীচরণ যে আপনার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পায় আর সুদসমেত সেই পাঁচ হাজার যে পঞ্চাশ হাজার দাঁড়িয়ে যেতে বসেছে, আর পচা গুন্ডা যে ষষ্ঠীচরণের হয়ে আপনার গলায় গামছা দিয়ে প্রতি মাসে অন্যায্য টাকা আদায় করছে, সে তো আর আমার অজানা নয়।

দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। এসব গুহ্য কথা আপনি জানলেন কী করে? মেয়ের বিয়ের সময় মোটে পাঁচটি হাজার টাকা ষষ্ঠীচরণের কাছে ধার নিয়েছিলুম। তখন কী আর জানতুম যে ওই পাঁচ হাজারের ফেরে আমার ঘটিবাটি চাঁটি হওয়ার জোগাড় হবে! ঠিকই বলেছেন মশাই, আমার খিদে হচ্ছে না, ঘুম উধাও, কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার লক্ষণই নেই।

শুধু কি তাই হরিপদবাবু? গণকঠাকুর সদানন্দ সরখেল যে শনির দৃষ্টি কাটানোর জন্য প্রায় জবরদস্তি একখানা নীলা ধারণ করিয়েছিলেন তারও কিস্তি টানতে গিয়ে আপনি কী কম নাকাল হচ্ছেন! সদানন্দ আবার ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে, কিস্তি ঠিকঠাক না দিলে মহাক্ষতির অভিশাপ লাগবে। তার ওপর ধরুন আপনার বাড়ির পাশেই মহাকালী ব্যায়ামাগারের আখড়া। তারা জোর করে আপনার জমির আড়াই ফুট বাই ষাট ফুট দখল করে বসে আছে, আর আপনি প্রতিবাদ করলেই তেড়ে আসছে, এও তো সবাই জানে কিনা।

আশ্চর্য মশাই, আমি আপনাকে না চিনলেও আপনি তো দেখছি আমার সব খবরই রাখেন! তা মশাই, এতসব জানলেন কী করে? আপনি কি শত্রুপক্ষের লোক?

ছিঃ-ছিঃ হরিপদবাবু, এরকম অন্যায় সন্দেহ আপনার হল কী করে? আপনার ভালো চাই বলেই না আর পাঁচটা গুরুতর কাজ ফেলে আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি! আপনার

গিন্নির বাঁ-হাঁটুর বাত আর অম্বলের অসুখের জন্য ডাক্তার-বদ্যি আর ওষুধের পিছনে আপনার যে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে সে খবর জানি বলেই না আপনার দুঃখে দুঃখিত হয়ে না এসে থাকতে পারলাম না।

কিছু মনে করবেন না মশাই, আজকাল লোক চেনা খুব শক্ত বলে একটু ধন্দ ছিল। এখন বুঝতে পারছি, আপনি তেমন খারাপ লোক নন।

নই-ই তো! এই যে গেল হপ্তায় আপনি অফিসের লেজারে একটা চল্লিশ হাজার টাকার ক্রেডিট এন্ট্রি ভুল করে ডেবিটের ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য গণেশবাবু কী অপমানটাই না আপনাকে করলেন। ইডিয়ট, গুড ফর নাথিং, অপদার্থ, মিসফিট, নন-কমিটেড ইত্যাদি কী বলতে বাকি রাখলেন বলুন! তার ওপর হেড অফিসে জানিয়ে আপনাকে পায়রাডাঙায় বদলি করার হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। আর আপনি ভালোই জানেন, পায়রাডাঙায় বদলি হওয়া মানে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ওঃ মশাই, আপনি নির্ঘাত অন্তর্যামী। এত খবর রাখেন দেখে আমি কেবল অবাকের পর অবাক হচ্ছি। সত্যিই মশাই, গণেশবাবুর মতো এমন অকৃতজ্ঞ লোক হয় না। এই তো গত ইয়ার এন্ডিং-এ গণেশবাবুর মান বাঁচাতে পরপর চারদিন অফিসের সময় পার করেও দু-তিন ঘণ্টা করে বেশি খেটে তাঁর কাজ তুলে দিয়েছি। এই কী তার প্রতিদান? আর ভুলটাও এমন কিছু মারাত্মক নয়। সেদিন জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন যাব বলে একটু তাড়াহুড়ো ছিল। বিকেল ছ-টা ছাব্বিশের ট্রেন ধরব বলে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে সামান্য একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল।

সেই কথাই তো বলছি। তারপর ধরুন, এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড়ে কী কাণ্ডটা হল?

কিছু হয়েছিল নাকি? কী হয়েছিল বলুন তো?

সে কী মশাই, এতবড়ো ঘটনাটা ভুলে মেরে দিলেন! আপনার তো এখনও ভীমরতি ধরার বয়স হয়নি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর তিন মাস, এর মধ্যেই স্মৃতিবিভ্রম তো ভালো কথা নয়। অবশ্য জলাতঙ্কের ইনজেকশান নিলে অনেক সময়ে শরীরে নানারকম কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়, তাতে স্মৃতিবিভ্রম হওয়াও বিচিত্র নয়।

আমি যে জলাতঙ্কের ইনজেকশান নিয়েছিলাম এ খবরও আপনি জানেন দেখছি! নাঃ আমার আরও অবাক হওয়ার উপায় নেই মশাই। ইতিমধ্যে অবাক হওয়ার অপটিমামে পৌঁছে গেছি।

আহা, অবাক হওয়ার দরকারটাই বা কী আপনার। এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড় দিয়ে আসার সময় আপনি যে দূরে শ্যামাদাস মিত্তিরকে দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে 'শ্যামদাস, ওহে শ্যামাদাস' বলে চিৎকার করে ছুটে গিয়েছিলেন, তা কি আপনার মনে নেই?

দোষটা কিন্তু শ্যামাদাসেরই, বুঝলেন মশাই, গত অক্টোবরে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে বলে আমার কাছে দূরবিনটা ধার চেয়েছিল। দূরবিনটা আমার ঠাকুরদার। সাবেক জিনিস, একটা স্মৃতিচিহ্নও বটে। কিন্তু শ্যামাদাস এমন বেআক্কেলে যে, দূরবিনটা ছ-মাসের মধ্যে ফেরত দিল না। চাইলেই বলে, দেব দিচ্ছি। তারপর শুনলুম তার বড়ো শালা নাকি দূরবিনটা তার কাছে চেয়ে নিয়ে গেছে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাবে বলে। বলুন তো, টেনশন হওয়ার কথা নয়! তাই সেদিন তাকে দেখে ওরকম ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলুম।

আর তার ফলেই না আপনি রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের লেজ মাড়িয়ে ফেললেন। আর কুকুরটাও ঘ্যাঁক করে আপনার ডান পায়ে কামড় বসিয়ে দিল।

ওঃ, সে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনাই বটে। তবে আপনি যে অন্তর্যামী সে বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহই নেই। এসব ঘটনা আমার বাড়ির লোক আর অফিসের কলিগরা ছাড়া কেউ জানে না। কুকুরের কামড়ের চেয়েও অনেক বেশি যন্ত্রণা হল পেটে অতগুলো ইনজেকশন নেওয়া। সে কী অসহ্য অবস্থা তা কহতব্য নয়।

না হরিপদবাবু, আপনি নবুবাবুর কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনার দুর্ভোগের জন্য নবুবাবুর অবদানের কথাটাও একটু ভাবুন। সেবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় নবুবাবুর ছেলে গজা অঙ্কে বাইশ পেয়েছিল। নবুবাবু তখন আপনাকে গজার প্রাইভেট টিউটর রাখেন। অঙ্কের মাস্টার হিসেবে আপনার খুবই সুনাম। গজাকে অঙ্ক শেখানোর জন্য আপনাকে নবুবাবু মাসে সাতশো টাকা দিতেন। তা দেবেন নাই বা কেন। নবুবাবুর টাকার লেখাজোখা নেই, আর গজাও তাঁর একমাত্র ছেলে। কিন্তু হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে এগারো পেল এবং অ্যানুয়েলে পেয়েছিল মাত্র তিন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নবুবাবু আপনাকে ছাড়িয়ে তো দিলেনই, তার ওপর প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করলেন। অভিযোগ ছিল, আপনি ইচ্ছে করেই গজাকে ভুলভাল শিখিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর গোয়ালে আগুন লাগানোর অভিযোগে এক দফা, তাঁর বুড়ি পিসির মৃত্যু হওয়ায় সেটাকে খুনের মামলা সাজিয়ে আর এক-দফা, তাঁর বাড়িতে যে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল সেই বাবদে তিনি আর-এক দফা আপনাকে অভিযুক্ত করে এফআইআর করেন। পুলিশ একবার আপনাকে নিয়ে গিয়ে থানার লক আপে এক রাত্রি আটকেও রাখে। ঠিক কি না?

আর বলবেন না মশাই, আমার দোষ কী বলুন! গজা বেশিরভাগ দিনই অঙ্ক কষতে বসে ঘুমিয়ে পড়ত বা পেট ব্যথা বলে আমাকে বিদায় করে দিত। নবুবাবুকে বলেও লাভ হত না। বলতেন, ছেলেমানুষ, ওরকম তো একটু করবেই। ওই ফাঁকে-ফাঁকে শিখিয়ে দেবেন। কী কুক্ষণে যে গজাকে পড়াতে রাজি হয়েছিলুম কে জানে। নবুবাবু আমার জীবনটাই অসহ্য করে তুলেছেন।

সম্প্রতি তিনি আপনার বিরুদ্ধে একটা জালিয়াতির মামলা করার জন্যও তৈরি হচ্ছেন বলে শুনেছি।

ওরে বাবা!

তাই তো বলছি, আপনি কেমন আছেন সেটা জানা বড়ো দরকার।

যে আজ্ঞে। ভেবেচিন্তে মনে হচ্ছে আমি বিশেষ ভালো নেই। আমার ঘুম হচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না, কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না। বুক দুরদুর করে, শরীর দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে।

আহা, তার জন্য চিন্তা কী হরিপদবাবু। আমি তো আছি।

আপনি আছেন, কিন্তু কীভাবে আছেন?

আপনার দুঃখদুর্দশা দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল বলেই তো হিমালয়ে পাহাড়িবাবার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম।

বলেন কী? আমার জন্যে আপনি হিমালয় ধাওয়া করেছিলেন? আপনি তো অতি মহৎ মানুষ মশাই। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনিও না।

তাতে কী? আমার চেনা-অচেনা ভেদ নেই। আপনার দুঃখের কথা পাহাড়িবাবার শ্রীচরণে নিবেদন করতেই উনি টানা পাঁচ বছরের ধ্যানসমাধি থেকে জেগে উঠে খুব চিন্তিত মুখে

বললেন, তাই তো? হরিপদর সময়টা তো বিশেষ ভালো যাচ্ছে না! এর একটা বিহিত তো করতেই হয়।

বলেন কী মশাই?

তবে আর বলছি কী। পাহাড়িবাবার মহিমা তো জানেন না। সাক্ষাৎ শিবস্বয়ম্ভো! তিনি প্রসন্ন হলে আর চিন্তা কীসের? তা তিনি সব শুনেটুনে আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েই এই একস্ট্রা স্পেশাল বগলামুখী কবচখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা দুধ, দই আর গঙ্গাজলে শোধন করে ধারণ করবেন। দেখবেন সব গ্রহ-বৈকল্য কেটে গিয়ে আপনি একেবারে অন্য মানুষ।

আপনি তো বড়ো পরোপকারী মানুষ মশাই।

আর লজ্জা দেবেন না। মানুষের জন্য আর কতটুকুই বা করতে পারি। যাই হোক, প্রণামী বাবদ সামান্য পাঁচ হাজার টাকা ফেলে দিলেই হবে।

অ্যাঁ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওয়ারিশান

ঘরের বাহিরে পা রাখতেই প্রফুল্লবাবু দেখতে পেলেন, চারদিকে বেশ একটা হাসিখুশি ভাব। টমেটোর মতো টুকটুকে রাঙা রোদ উঠেছে, আমলকী গাছে বসে একটা দোয়েল পাখি ফচকে ছেলেদের মতো শিস দিচ্ছে, ঘাসের ওপরে হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের ফোঁটার মতো শিশির জমে আছে, হিমেল একটা হাওয়া সজনে আর নিমগাছের সঙ্গে নানা কথা কইতে কইতে বয়ে যাচ্ছে। আরও যেসব দৃশ্য প্রফুল্লবাবুর চোখে পড়ল তাতে তাঁর খুশি হওয়ার কথা নয়। যেমন নগেন ঘোষাল দাঁত খিঁচিয়ে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে দাঁতন করছেন, পরাণ মিত্তির তাঁর বাড়ির বারান্দায় মাদুরে বসে উচ্চকণ্ঠে ছেলে পটলকে ইংরিজি গ্রামার পড়াচ্ছেন, নিমাই সরখেলের বুড়ি পিসি কতক বককে বকা-ঝকা করতে করতে সামনের উঠোনে গোবরছড়া দিচ্ছেন। এসব নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। তবু আজ এসব দৃশ্য তাঁর ভারি ভালো লাগল। বাস্তবিক প্রফুল্লবাবু আজ খুবই প্রফুল্ল বোধ করছেন।

প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্ল হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। তাঁর অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। বাজারে বেশ কিছু ধার-দেনা আছে। চাষবাস থেকে তেমন আয় হয় না। টাকার অভাবে বাড়িটা মেরামত করতে পারছেন না, বর্ষাকালে ঘরে জল পড়ে। পয়সার জোর না থাকলে মানুষের কাছে মানসম্মানও বজায় রাখা যায় না। লোকে ভারি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তিনি গরিব হলেও তাঁর খুড়োমশাই বেজায় বড়োলোক। লোহার কারবার করে লাখো লাখো টাকা করেছেন। তবে পঞ্চানন বিশ্বাস প্রফুল্লবাবুর মুখদর্শনও করতেন না। তার কারণ প্রফুল্লবাবুর যৌবনকালে খুব যাত্রা-থিয়েটার করার নেশা ছিল, আর যেটা তাঁর বাবা বা কাকা কেউই পছন্দ করতেন না। প্রফুল্লবাবু লুকিয়ে গিয়ে যাত্রাদলে নাম লেখান এবং মেয়েদের ভূমিকায় চুটিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। যাত্রা করছেন বলে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি ওই পুরুষ হয়ে মেয়ে সেজে অভিনয় করতেন বলে বাবা আর কাকা দু-জনেই তাঁর ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে ওঠেন। বাবা মারা যাওয়ার আগে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র অবধি করে ছেড়েছিলেন, আর পঞ্চানন বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক রহিত করে দেন। প্রফুল্লবাবু অবশ্য যাত্রাদলে বেশিদিন টিকতে পারেননি। কারণ ক্রমে ক্রমে মহিলার ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় শুরু করতে থাকায় প্রফুল্লবাবুর কদর কমে যায়। তিনি যাত্রা ছেড়ে সংসারে মন দেন। কিন্তু তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেননি। সম্প্রতি খবর এসেছে তাঁর নিঃসন্তান খুড়োমশাই তাঁর নামে আশি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। খবরটা পেয়ে আশি লক্ষ টাকা মানে ঠিক কত টাকা তা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রফুল্লবাবু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। বিশ-পঞ্চাশ বা দুশো-পাঁচশো টাকা অবধি ভাবতে প্রফুল্লবাবুর বিশেষ অসুবিধে নেই। ক্ষেত্রবিশেষে দু-চার-পাঁচ হাজার অবধিও ভেবে ফেলতে পারেন। কিন্তু তা বলে আশি লাখ! ওরে বাবা! আশি লাখ তো পাহাড়-পর্বত। প্রথমে মাথা ঘুরে পড়লেন, তারপর খেতে বসে কয়েকবার বেজায় বিষম খেলেন, আর প্রায়ই আনমনে চলাফেরা করতে গিয়ে ঘরের চৌকাঠে, রাস্তায় পড়ে থাকা ইটে, ইঁদুরের গর্তে হোঁচট খেয়ে পা মচকালেন, তেলকে জল, জলকে তেল বলে ভুল করলেন।

তবে যাই হোক, তিন দিন ধরে তাঁর মনটা ভারি প্রফুল্ল রয়েছে। যখন-তখন ফিক ফিক করে হেসে ফেলছেন, আপনমনে বিড়বিড় করে মাথা নাড়া দিচ্ছেন, আনন্দটা একটু বেশি ঠেলে উঠলে ছাদে গিয়ে কয়েক পাক চরকি নাচও নেচে নিচ্ছেন।

আজ রোববার পঞ্চানন বিশ্বাসের ম্যানেজার অঘোরবাবু আশি লাখ টাকার চেক নিয়ে আসছেন। শর্ত একটাই, গাঁয়ের পাঁচজন বিশিষ্ট লোক যদি প্রফুল্ল বিশ্বাসকে শনাক্ত করেন তবেই চেকটা হস্তান্তর করে অঘোরবাবু রসিদ নিয়ে চলে যাবেন। অঘোরবাবুর চিঠিতে এই শনাক্তকরণ ব্যাপারটার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ অঘোরবাবু প্রফুল্লবাবুকে চেনেন না, আর খুড়োমশাইও প্রফুল্লবাবুর মুখদর্শন করবেন না। তবে সেটা কোনো সমস্যাই নয়। এই গাঁয়ে তাঁর দীর্ঘকাল বাস। সবাই এক ডাকে তাঁকে চেনে। অঘোরবাবুর চিঠি পাওয়ার পরই প্রফুল্লবাবু গাঁয়ের পাঁচজন বাছা বাছা মাতব্বরকে গিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। নগেন ভট্চায, বীরেশ মিত্তির, বৈকুণ্ঠ গোঁসাই, সদানন্দ সমাদ্দার আর পাঁচুগোপাল দত্ত। এঁরা সবাই মান্যগণ্য লোক। নগেন ভট্চায দারোগা ছিলেন, বীরেশ মিত্তির ছিলেন ওভারসিয়ার, বৈকুণ্ঠ গোঁসাইয়ের তেলকল আছে, সদানন্দ সমাদ্দার পঞ্চায়েতের পাণ্ডা, পাঁচুগোপাল দত্ত একজন নামকরা নাট্যকার, মেলা পালা লিখেছেন।

কিন্তু প্রফুল্লবাবুর এখন চিন্তা হল আশি লক্ষ টাকা নিয়ে। আশি লাখ অনেক টাকা বটে, কিন্তু একটু খুঁতও আছে। টাকাটা লাখই বটে, কোটি নয়। লোকে তাঁকে লাখোপতি বলবে ঠিকই, কিন্তু কোটিপতি বলবে না। কিন্তু কোটিপতিটা শুনতে আরও একটু ভালো। তাই প্রফুল্লবাবু প্ল্যান এঁটে রেখেছেন, টাকাটা হাতে পেয়ে খরচাপাতি একদম করবেন না। বরং আরও শক্ত হাতে খরচ কমিয়ে আশি লাখকে এক কোটিতে নিয়ে তুলবেন। বাজার থেকে মাছ-মাংস আনা ইতিমধ্যেই বন্ধ করেছেন, তেরো টাকার চাল আনতেন, এখন আট টাকার মোটা চাল ছাড়া আনেন না, দুধের বরাদ্দ কমিয়ে অর্ধেক করে ফেলেছেন, কাজের লোক ছাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আরও খরচ কী করে কমানো যায় তা নিয়ে দিনরাত্তির মাথা ঘামাচ্ছেন। এ নিয়ে বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি এবং অশান্তি বড়ো কম হচ্ছে না। তাঁর গিন্নি তো তাঁকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন বলে নিত্য টানাহ্যাঁচড়া করছেন। বলছেন, কোথায় এক কাঁড়ি টাকা পেয়ে একটু ভালো-মন্দ বাজার করবে, গয়নাগাঁটি গড়িয়ে দেবে, বাড়িটা বেশ সারিয়ে-টারিয়ে ঝাঁ-চকচকে করবে, তা নয় এ যে আরও পেচেশপনা শুরু হল!

যে যাই বলুক প্রফুল্লবাবু তাতে কান দিচ্ছেন না। টাকা জিনিসটাই ভারি অস্থায়ী, আজ আছে তো কাল নেই। সেই যে ইস্কুলের নীচু ক্লাসে অঙ্ক কষেছিলেন, একটা আশি গ্যালনের চৌবাচ্চায় মিনিটে সাড়ে সাত গ্যালন জল ঢোকে আর আট গ্যালন জল বেরিয়ে যায়, চৌবাচ্চাটি খালি হতে কত মিনিট লাগবে? অঙ্কটার কথা ভেবে আজ একটু শিউরে উঠলেন প্রফুল্লবাবু। সুতরাং বেরিয়ে যাওয়ার ফুটোটা আরও ছোটো করতে হবে এবং ঢোকার ফুটোটা বড়ো করা দরকার।

আজকাল ব্যয়সংকোচের নানা ফন্দিফিকির তাঁর মাথায় ঘুরছে। আগে তাঁর বাড়িতে নিয়মিত কয়েকজন ভিখিরি আসত। একমুঠো চাল বা সিকিটা-আধুলিটা দেওয়াও হত তাদের। আশি লাখ টাকার খবর পাওয়ার পর প্রফুল্লবাবু তাদের হুড়ো দিয়ে তাড়িয়ে ছেড়েছেন। তারা আর এ বাড়িমুখো হয় না।

অর্থাগম বাড়ানোর জন্য প্রফুল্লবাবু বন্ধকী কারবার খুলবেন বলে ঠিক করে ফেলেছেন। লোকের হঠাৎ বিপদে পড়ে টাকার দরকার হলে সোনাদানা বন্ধক রেখে চড়া সুদে ধার নেবে।

এ কারবারে লোকসানের ভয় নেই, ষোলোআনা লাভ। টাকা সময়মতো শোধ করতে না পারলে তাদের সোনাদানাও প্রফুল্লবাবুর হাতে এসে যাবে। এই প্রস্তাবে অবশ্য তাঁর গিন্নির সায় নেই। উনি ভারি বিচলিত হয়ে বলেছেন, না না, ও ভারি সব্বোনেশে ব্যবসা। লোকের বিপদ-আপদের সুযোগ নিয়ে টাকা রোজগার করা ভারি খারাপ, তাতে অমঙ্গল হবে। কিন্তু প্রফুল্লবাবু কানে তোলেননি। কোটি টাকা পার না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সোয়াস্তি নেই।

নগেন ভট্‌চাযের বেশ দশাসই লম্বাই-চওড়াই চেহারা, কাঁচাপাকা পেল্লায় গোঁফ আর বাবরি চুল। বীরেশ মিত্তির রোগা-ভোগা মানুষ, তাঁরও গোঁফ আছে বটে, কিন্তু ঝোলা গোঁফ। তেলকলের মালিক বৈকুণ্ঠ গোসাঁইয়ের চেহারাখানাও বেশ তেল-চুকচুকে, নাদুসনুদুস, দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই, মাথা জোড়া টাক। সদানন্দ সমাদ্দারের কেঠো রসকষহীন নিরানন্দ চেহারা, সর্বদাই ভারি ব্যস্তসমস্ত ভাব। পাঁচুগোপাল দত্ত ভারি ঠান্ডা সুস্থির মানুষ, মুখে সর্বদা পান আর মিঠে হাসি। বেলা দশটার মধ্যেই একে একে এসে পড়লেন সব।

নগেন ভট্‌চায বাজখাঁই গলায় বললেন, কই হে প্রফুল্ল, আপ্যায়নের কী ব্যবস্থা হয়েছে শুনি! আমার আবার সকালে দুটি হাফ বয়েল ডিম না হলেই চলে না।

প্রফুল্লবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। অ্যাপায়নের ব্যবস্থা যে তিনি করেননি তা নয়, তবে একটু চেপে-চুপে। দুটি করে সন্দেশ আর একটি করে শিঙাড়া। আমতা আমতা করে বললেন, তা সে ব্যবস্থাও হবে।

বীরেশ মিত্তির মাথাটা ঘন ঘন নাড়া দিয়ে বললেন, হ্যাঁ! হাফ বয়েল ডিম আবার একটা বস্তু হল! ডিম ভাঙলেই ফচ করে খানিকটা সিকনির মতো বেরিয়ে আসে। ছ্যাঃ ছ্যা! বলি সকালবেলায় লুচি দিয়ে মোহনভোগ খেয়েছ কখনো?

সদানন্দ সমাদ্দার অত্যন্ত অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, ওহে এই বয়সে ওসব গুরুভোজন কোনো কাজের কথা নয়। ডিমে কোলেস্টরেল বৃদ্ধি, লুচি আর মোহনভোগে হাই ক্যালোরি, বরং দুধ-কলা দিয়ে পোটাক ছাতু মেরে দাও, সারাদিনের মতো পেট ঠান্ডা।

পাঁচুগোপালবাবুর মুখে পান, খাবার-দাবারের কথায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন না। খুব ঠাণ্ডা মিষ্টি গলাতেই বললেন, তা কীরকম খরচাপাতি করবে হে প্রফুল্ল?

প্রফুল্লবাবু আমতা আমতা করে বললেন, কীসের খরচাপাতির কথা বলছেন বলুন তো পাঁচুদা।

বীরেশবাবু বললেন, আহা, গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপটার কথাই তো বলা হচ্ছে হে। পড়ো-পড়ো অবস্থা, সংস্কার না করলেই নয়, টাকার জোগাড় ছিল না বলেই হয়নি। তোমার টাকা পাওয়ার খবর পেয়েই আমরা এস্টিমেট নিয়েছি, তা ধরো কমসম করেও সাড়ে তিন লাখে দাঁড়াচ্ছে!

নগেন ভট্‌চায মশাই ভারি উদার গলায় বললেন, আহা, সেই সঙ্গে রাসেশ্বরীর মন্দিরের এস্টিমেটটাও জুড়ে দাও না হে। চূড়াটা কবে ভেঙে পড়ে গেছে, পশ্চিমের দেয়ালে ফাটল, পুকুরঘাটের সিঁড়ি ভেঙে ধসে গেছে। তা ওই লাখ চারেক হলেই হয়ে যাবে মনে হয়। এক-আধ লাখ এদিক-ওদিক হতে পারে।

সদানন্দ মিষ্টি করে হেসে বললেন, আরে, প্রফুল্লর টাকা তো গাঁয়েরই টাকা, কী বলো? গরিব গাঁ আর কার ভরসা করবে! ফটক বাজার থেকে কালীতলা অবধি রাস্তাটার হাল দেখেছো? বর্ষাকালে অগম্য। দশ থেকে বারো লাখ ফেলে দিলেই রাস্তা একেবারে রেড রোড হয়ে যায়। নিরঞ্জন ঠিকাদার তো মুখিয়ে বসে আছে হে।

নগেনবাবু বললেন, আহা, ও আর চিন্তার কী আছে! আশি লাখ টাকার মালিকের কাছে ও তো নস্যি।

বীরেশ মিত্তির পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে কী দেখছিলেন, মুখ তুলে বললেন, ও আরও একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল হে। প্রগতি সংঘের ক্লাবঘর আর নবীন যুবদলের খেলার মাঠ। বেচারারা বহুকাল হা-পিত্যেশ করে আছে। ক্লাবঘরের জন্য লাখ তিনেক আর খেলার মাঠ বাবদ মাত্র দেড় লাখ।

পাঁচুগোপাল পানের পিক ফেলে এসে বললেন, আসল কথাটাই তো এখনও তুললে না তোমরা! বিদ্যাপতি ইনস্টিটিউশনের এক্সটেনশন বিল্ডিং আর বয়েজ হস্টেল। ও দুটো না হলেই নয়। গাঁয়ের মান থাকছে না। দুটো মিলিয়ে বাইশ-তেইশ লাখে দাঁড়াবে গিয়ে।

বীরেশবাবু কী যেন যোগ করতে চাইছিলেন, ঠিক এমন সময়ে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। প্রফুল্লবাবু গিয়ে দরজা খুলে বললেন, কাকে চাই?

আজ্ঞে আমি অঘোর সরকার, পঞ্চানন বিশ্বাসের ম্যানেজার। এটা কি প্রফুল্ল বিশ্বাসের বাড়ি?

প্রফুল্লবাবু অম্লান বদনে বললেন, না। প্রফুল্লবাবু মারা গেছেন।

মুক্তিপণ

সদাপ্রসন্নবাবু সকালবেলাতেই তাঁর চিঠির বাক্সে একখানা চিঠি পেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। একখানা হুমকির চিঠি। তাতে লেখা, 'মহাশয়, আপনার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে আমরা হরণ করিয়াছি। তাহার মুক্তিপণ বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা প্রস্তুত রাখিবেন। আমার লোক গিয়ে লইয়া আসিবে। পুলিশে খবর দিয়া লাভ নাই। ফুলুদারোগা দারোগাকুলের কলঙ্ক। তাহার মতো অপদার্থ লোকের সাধ্য নেই আপনার পুত্রকে উদ্ধার করে। টাকাটা জোগাড় হইলে বাড়ির মাথায় একটা সাদা নিশান উড়াইয়া দিবেন।'

সদাপ্রসন্নর মুখ শুকিয়ে গেল। বুক ঢিবঢিব করতে লাগল। তিনি কালবিলম্ব না করে কাঁপতে-কাঁপতে থানায় গিয়ে হাজির হলেন।

'দারোগাবাবু, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।'

ফুলুদারোগা অতি ব্যস্তসমস্ত মানুষ। সমাজে যত অপরাধ বাড়ছে, দারোগাদের ততই খাওয়া-দাওয়ার সময় টান পড়ে যাচ্ছে। এই তো পরেশবাবু আর তাঁর ভাড়াটে যজ্ঞেশ্বরবাবুর মধ্যে হাঙ্গামা বেধেছে। পরেশবাবু নাকি যজ্ঞেশ্বরকে ঘুসো মেরেছেন। পরেশবাবু বলেছেন, 'ওটা মোটেই ঘুসো নয়, ঠুসো।' সকাল থেকে ফুলুবাবু পাঁচখানা বাংলা অভিধান ঘেঁটে ঘুসো আর ঠুসোর তফাত খুঁজে বেড়াচ্ছেন। হরিদাসী মণ্ডলের ছেলে বিরিঞ্চি সেই ক্লাস ওয়ান থেকে প্রতি ক্লাসে দু'বার ফেল মেরে তিনবারের বার পরের ক্লাসে ওঠে। এটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ক্লাস সেভেনে ওঠার পর দু'বার ফেল মেরে এবার তিনবারের বার ন্যায্যত তার ক্লাস এইটে ওঠার কথা। কিন্তু কী এক রহস্যময় কারণে সে এবারেও ফেল মেরেছে বলে হরিদাসী ব্রজমাস্টারকে কেন গ্রেফতার করা হবে না, এই দাবি নিয়ে সকাল থেকে থানায় হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। পালপাড়ার নবীনবাবুর অভ্যাস কাকভোরে উঠে বারান্দায় গুন গুন করে রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে পায়চারি করা। কিন্তু তিনি গান গাইতে শুরু করলেই পাশে গন্ধর্ববাবুর বাড়ির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা এমন ঘাউ-ঘাউ করে ওঠে যে, তাতে সুর ঘেঁটে যায়। সুতরাং তিনি মানবাধিকারের দাবিতে থানায় এসেছেন নালিশ করতে। গন্ধর্ববাবুও ছাড়ার পাত্র নন। তিনিও এসে বসে আছেন এই নালিশ নিয়ে যে, নবীনবাবু বেসুরো গলায় গান গাওয়ার চেষ্টা করেন বলেই কুকুরটা ওরকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

এইসব নানা অভিযোগ ও পালটা অভিযোগে ব্যতিব্যস্ত ফুলুদারোগা সদাপ্রসন্নর আর্তনাদ শুনেও প্রথমটায় গা করেননি। কিন্তু চিঠিটা পড়ে তিনি খাড়া হয়ে বসলেন। এবং রাগে কাঁপতে লাগলেন। দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'কী, এত বড় আস্পদ্দা?'

সদাপ্রসন্ন কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'আমারও সেই কথা। লোকটার স্পর্ধাটা একবার দেখুন!'

ফুলুদারোগা একটা খাতা খুলে কলম বাগিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ছেলে কবে থেকে নিখোঁজ বলুন তো?'

সদাপ্রসন্নবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'বলা মুশকিল।'

'বয়স কত?'

সদাপ্রসন্ন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, 'বয়স বলা শক্ত।'

'আহা, আপনি সঠিক না জানলে ছেলের মাকে জিগ্যেস করে আসুন না!'

'আজ্ঞে, সেটা আরও কঠিন কাজ।'

'কেন মশাই, কঠিন কেন? তিনি কি রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়েছেন?'

'আজ্ঞে, সেটা বললে মিথ্যে বলা হবে।'

'তাহলে ছেলের নামটা বলুন।'

'আজ্ঞে, সেটা বললে মিথ্যে বলা হবে।'

'ছেলের নাম নেই? এ তো বড় আশ্চর্য কথা!'

নাতবউ মালপো ভেজে দেয়নি বলে চুড়োমাধব দাস এফ আই আর করতে এসেছে নাতবউয়ের নামে। সে পাশ থেকে বলে উঠল, 'আহা, ওর ছোট ছেলে যে মোটে হয়ইনি।'

ফুলুবাবু চটে উঠে বললেন, 'তা হলে যে চিঠিতে আপনার ছোট ছেলের কথা লিখেছে?'

'আজ্ঞে, ছেলেধরা লিখলে আমার কী করবার আছে বলুন?'

'অ, বুঝেছি। তা হলে কি মেজো ছেলেকেই ধরে নিয়ে গিয়েছে বলতে চান?'

'আজ্ঞে, সেটাও তো সম্ভব নয়।'

'ছেলে হারালে বাপের মাথার ঠিক থাকে না জানি, তা বলে এই বিপদের সময়ে তথ্য গোপন করাও তো কাজের কথা নয়। আপনার মোট কয় ছেলে বলুন তো?'

সদাপ্রসন্ন বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'ছেলে আর হল কই?'

'অ্যাঁ, ছেলেই হয়নি! তবে কি ছেলে মনে করে আপনার মেয়েকেই ধরে নিয়ে গিয়েছে?'

'সেটাই বা বলি কী করে?'

মাধব আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'ছেলেপুলে আসবে কোথা থেকে? সদাপ্রসন্নর যে বিয়েই হয়নি এখনও।'

ফুলুদারোগা হাঁ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, 'তা হলে চুরি হল কে? পুষ্যিপুত্তুর নয় তো?'

সদাপ্রসন্ন বিষণ্ণ বদনে বললেন, 'আজ্ঞে, পুষ্যি আমার কয়েকজন আছে বটে, তবে পুষ্যিপুত্তুর নেই!'

ফুলুদারোগা ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'তা হলে এই চিঠিটার মানে কী?'

'আজ্ঞে, সেইটে জানতেই আপনার কাছে আসা।'

ফুলুবাবু ভারী খাপ্পা হয়ে বললেন, 'আমি কি মানে-বই যে, আমার কাছে মানে জানতে এসেছেন? ঘুসো আর ঠুসো নিয়ে সকাল থেকে গলদঘর্ম হচ্ছি মশাই, মানে-টানে বলা আমার কর্ম নয়। তবে এ চিঠি যে লিখেছে, তার আমি মুন্ডু ছিঁড়ে নেব।'

একটু ভরসা পেয়ে সদাপ্রসন্নবাবু বাড়ি ফিরতেই তাঁর পুরনো কাজের লোক হলধর এসে বলল, 'তোমার আক্কেলটা কী বলো তো দাদাবাবু? কার ছেলে কে চুরি করেছে তার ঠিক নেই, তুমি কেন থানা-পুলিশ করে বেড়াচ্ছ?'

'আহা, যার ছেলেই হোক, চুরি তো হয়েছে। সেটাও কি দুশ্চিন্তার কথা নয়? এখন পাঁচ লাখ টাকা আমি পাই কোথায় তাই ভাবছি।'

'তার মানে? ও টাকা কি তুমি দেবে নাকি?'

'আমার কাছেই চেয়েছে যে।'

হলধর চোখ কপালে তুলে বলল, 'অনেক আহাম্মক দেখেছি বটে, কিন্তু তোমার মতো দেখিনি বাপু!'

সদাপ্রসন্ন হলধরের কথায় কান দিলেন না। বসে-বসে পাঁচলাখ টাকা জোগাড়ের কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁর কিছু সোনাদানা আছে বটে, কিন্তু তাতে মেরেকেটে কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা হতে পারে। পুকুরটা বেচলে বড়জোর হাজার পঞ্চাশেক আসবে। আর থাকে বাড়িটা। জমিসহ এই পুরোনো বাড়িটার দাম লাখ-দুয়েক উঠলেই ঢের। সব বেচেও পাঁচলাখ ছোঁয়া যাবে না। তাই সদাপ্রসন্নর দুশ্চিন্তা বাড়ল।

তিনদিন পর দ্বিতীয় চিঠিটা এল, 'মহাশয়, আপনার কি অপত্যস্নেহ বলিয়া কিছু নাই? আপনার মতো পাষণ্ড বাপ থাকিলে পুত্রকন্যাদিগের যে কীরূপ দুরবস্থা হয়, তাহা ভাবিয়া হৃৎকম্প হইতেছে। তবে বলিয়া রাখি, আপনার খোকাটিকে দত্তক লইবার জন্য বিলাতের এক নিঃসন্তান সাহেব-দম্পতি দশলক্ষ পাউন্ড দিতে প্রস্তুত হইয়া সাধাসাধি করিতেছেন। দশলক্ষ পাউণ্ডে কত টাকা হয় তাহা হিসেব করিয়া দেখিবেন। খোকাটিকে বিলেতে পাচার করিলে জীবনে আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া আশা করেন কি? কিন্তু আমরা অতটা পাষণ্ড নহি। পিতৃহৃদয় কীরকম উতলা হয়, তাহাও আমরা জানি। অনুমান করি, আপনি এখনও পাঁচলক্ষ টাকা জোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মাগ্গিগণ্ডার বাজারের কথা বিবেচনা করিয়া আপনার সুবিধার্থে আমরা আমাদের দাবি একলক্ষ টাকা হ্রাস করিলাম। চারলক্ষ টাকা দিয়া খোকাটিকে তাহার মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিন। দয়া করিয়া সাদা নিশানটি উড়াইতে ভুলিবেন না।'

চিঠিটা পেয়ে বুকের ভার খানিকটা কমল সদাপ্রসন্নবাবুর। যাক, একলাখ টাকাও তো কম নয়। তবে চারলক্ষ টাকার জোগাড়ও শক্ত কাজ। কয়েকদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া খুবই কমে গিয়েছিল তাঁর। এই চিঠি পাওয়ার পর দুপুরে একমুঠো বেশি ভাত খেয়ে ফেললেন।

সদাপ্রসন্নর বুড়ি পিসির বয়স নব্বইয়ের উপর। চোখেও ভালো দেখেন না, কানেও ভালো শোনেন না। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'ও বাবা সদু, বিয়ে করলি, ছেলেপুলেও হল, কিন্তু বুড়ি পিসিটা পাশের ঘরে থেকেও টের পেল না বাপ! এ তোর কেমন ব্যাভার? বিয়ের ঢাকঢোল কানে এল না, রোশনচৌকি দিলি, হাজার লোক খাওয়ালি, রোশনাই দিলি, নতুন বউ এল, কিচ্ছুটি টের পেলুম না তো! এখন শুনছি তোর ছোট খোকাটাকে নাকি ধরে নিয়ে গিয়েছে? এসব কী কাণ্ড বুঝিয়ে বল তো বাছা।'

পিসিকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সদাপ্রসন্ন বরং টাকা জোগাড় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যাচাই করে দেখলেন, ঘরের সোনাদানার দর দশ হাজারও হচ্ছে না। পুকুরের দর উঠল মাত্র তেরো হাজার আর বাড়ির দর সত্তর হাজারও ছুঁতে পারল না।

গভীর রাতে উঠে একটা শাবল নিয়ে বাড়ির মেঝে ঠুকতে লাগলেন সদাপ্রসন্ন। পুরোনো বাড়িতে অনেক সময় গুপ্তধন পাওয়া যায় বলে শুনেছেন। যদি ঘড়া দু'য়েক মোহর পাওয়া যায়, তা হলেই মার দিয়া কেল্লা!

আরও দিন তিনেক বাদে তৃতীয় চিঠিও এসে হাজির ঃ 'মহাশয়, বাড়িতে কি এক টুকরা সাদা কাপড়ও জুটিল না? যদি না জোটে তবে একটি ধুতি উড়াইয়া দিলেও চলিবে। আমরা অবিবেচক নহি। বুঝিতেছি, চারলক্ষ টাকাও আপনার জোগাড় নাই। কাজটা সহজও তো নহে। যাহা হউক, সব দিক বিবেচনা করিয়া এবং আপনার মুখ চাহিয়া আমরা দাবির অর্থ আরও কমাইয়া দিলাম। তিনলক্ষ পাইলেই আমরা এখন খোকাটিকে ছাড়িয়া দিব। আমাদের দিকটাও দেখিবেন। খোকাটির ভরণপোষণের ব্যয় নিতান্ত কম নহে। দুই বেলায় আধসের দুধ, চকোলেট, লজেন্স, খেলনা, অন্নবস্ত্রাদি, জুতা-মুজা, তেল, সাবানের নিমিত্তি আমাদের খরচ তো কম হইতেছে না। শীঘ্র করুন। নিশান উড়াইয়া দিন!'

চিঠিটা পেয়ে সদাপ্রসন্নর একটু আনন্দের ভাবই হল। দরটা বেশ অনেকটা নেমেছে।

এদিন তিনি দু'গ্রাস ভাত বেশি খেয়ে ফেললেন। তারপর টাকা জোগাড়ের উপায় ভাবতে বসলেন। তাঁর কয়েকজন অপোগণ্ড পুষ্যির মধ্যে একজন হলেন বগলাখুড়ো। আপন খুড়ো নন, জ্ঞাতি। বগলাপতি বোকাসোকা, নির্বিরোধী মানুষ। সারাদিন মাটি কুপিয়ে বাগান করেন। বাগান নিয়েই তাঁর সময় কেটে যায়। আর কোনও দিকে দৃক্‌পাত নেই। তবে লোকে বলাবলি করে যে, বগলাপতি বোকা সেজে থাকলে কী হয়, অনেক সুলুকসন্ধান জানেন। মরিয়া সদাপ্রসন্ন অগত্যা বগলাপতিকেই ধরে পড়লেন, 'ও বগলাখুড়ো, লাখতিনেক টাকার বড় দরকার। কী করে জোগাড় করা যায় বলতে পারেন?'

বগলাপতি অতি মনোযোগে বেগুন গাছের মাটি তৈরি করছিলেন। কথাটা শুনে মাটিমাখা হাতে মাথাটা একটু চুলকে বললেন, 'তাই তো? লাখতিনেক টাকা ঠিক কত টাকা বলো তো?'

'তা কি ছাই আমিই জানি! লোকের মুখে লাখ-বেলাখ শুনি বটে, কিন্তু আমারও আন্দাজ নেই।'

'বড়ই মুশকিলে ফেললি বাপ। টাকাপয়সার হিসেব বড় গোলমেলে। তবে অনেক টাকাই হবে বোধ হয়, তাই না?'

'তা টাকাটা বেজায় বেশি বলেই মনে হচ্ছে খুড়ো।'

'ওইখানেই তো মুশকিল। কম টাকার সঙ্গে আমি বেশ মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে পারি। হিসেব রাখাও ভারী সোজা। কিন্তু বেশি টাকা যেন অকূলপাথার। তাই বেশি টাকাকে আমি বড্ড ভয় পাই। এই তো মাস দুই আগে ওই কেয়াঝোপের নীচে কোদাল চালাতে গিয়ে ঠং করে একটা শব্দ হল। মাটিটা একটু খুঁড়তেই দেখি, একটা কলসির কানা উঁচু হয়ে আছে। ভয়ে তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে ফেললাম। মাটির নীচে কলসি মানেই বিপজ্জনক ব্যাপার। সোনাদানা বেরিয়ে পড়লে যে অকূলপাথারে পড়ে যাব বাপ!'

সদাপ্রসন্ন হাঁ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তা আমাকে বলেননি কেন?'

'বললে যদি লোক জানাজানি হয়ে যায়, তা হলে যে এখানে মানুষের মেলা বসে যাবে বাপ। ঘরদোরে আর শান্তি থাকবে না। তা ছাড়া ওখানে গোটা পাঁচ-সাত কেউটে সাপের আস্তানা। খোঁড়াখুঁড়ি করা হলে ধেড়ে সাপগুলো তাদের দেড়-দুশো কুসিকুসি ছানা নিয়ে কোথায় যাবে বলো তো? ওদের ভিটেছাড়া করা কি ভালো?'

সদাপ্রসন্ন খুব ভাবিত হলেন। ভেবেটেবে বললেন, 'তা বটে, তবে থাক, কলসি টানাটানি না করাই ভালো।'

'মহাশয় এখনও সাদা নিশানের দেখা নাই। আর কতদিন ধৈর্য ধরিব? বুঝিতেছি, আপনি কোনও কাজের নহেন। যাহা হউক, অবস্থাগতিক বিবেচনা করিয়া মনে হইল, বাজার এখন নিতান্তই দুর্মূল্য। আলু চারিটাকার নীচে নামিতেছে না। চাউল, ডাইল ইত্যাদিও উচ্চমার্গে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং এমতাবস্থায় আপনারও সঙ্গতির অভাব ঘটিতেছে। দয়া করিয়া আমাদের হৃদয়হীন, পাষণ্ড ভাবিবেন না। আন্তর্জাতিক বাজারে খোকাটির দর আরও বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু আমরা আপনার পিতৃহৃদয়ে শেল হানিতে চাহি না। তাই মুক্তিপণ মাত্র একলক্ষ টাকা ধার্য করিলাম। শীঘ্র করুন। খোকাটিকে পালিতে-পুষিতে এই মহার্ঘ বাজারে আমাদিগের প্রচুর ব্যয় হইতেছে। শীঘ্র নিশান না উড়াইলে কিন্তু বিপদ।'

একলাখ টাকা দেখে বেশ উল্লসিতই হয়ে পড়লেন সদাপ্রসন্ন। আর তাঁর হাসিখুশি ভাব দেখে একাধারে এ-বাড়ির বাজার সরকার, হিসেবরক্ষক এবং সম্পর্কে সদাপ্রসন্নর মামা গোলোকবিহারী গম্ভীরভাবে বললেন, 'দর আরও কমবে।'

'অ্যাঁ, কী করে জানলেন? আপনাকে তো কিছুই বলিনি।'

গোলকমামা এ কথার জবাব দিলেন না। তবে দিনসাতেক বাদে সত্যিই চিঠি এল ঃ 'মহাশয় বড়ই চিন্তায় ফেলিলেন। প্রতিদিন সাদা নিশান দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া আছি, কিন্তু নিশান উড়িল না। আপনাকে ভালো ও বোকা লোক বলিয়া জানিতাম। এখন মনে হইতেছে আপনি একজন ঘড়িয়াল ও ধূর্ত মানুষ। খোকাটিকে আমাদের কাছে গছাইয়া দিব্য দিনাতিপাত করিতেছেন। যাহা হউক, আপনাকে আর একটি সুযোগ দিতেছি। ইহাই অন্তিম সুযোগ। মাত্র পাঁচ সহস্র দিলে আমরা খোকাটিকে ফিরত দিতে রাজি। যদিও তাহাকে পালিতে-পুষিতে আমাদের তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে। এইবার নিশানটি উড়ান। বিলম্বে হতাশ হইবেন।'

পাঁচ হাজারকে সদাপ্রসন্নর এখন নিতান্তই হাতের ময়লা বলে মনে হচ্ছে। দিয়ে ফেললেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু একটাই মুশকিল। খোকাটা কার? কার খোকা কে চুরি করল সেটা এখনও পর্যন্ত ভালো বোঝা যাচ্ছ না। কাছেপিঠেও কারও খোকা বা খুকি চুরি যায়নি, সদাপ্রসন্ন খোঁজ নিয়ে দেখেছেন।

গোলোকমামা মানুষ একটু গেরামভারী বটে, কথাটথা বিশেষ আসে না, সর্বদাই হিসেবপত্র নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। সংসারের আয়-ব্যয়ের পাই-পয়সার অবধি এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই।

সকালবেলায় গোলোকবিহারী হিসেবের খাতা খুলে বসে মন দিয়ে কাজ করছিলেন। সদাপ্রসন্ন গিয়ে চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, 'পাঁচ হাজারে নেমেছে।'

গোলোকবাবু তলচক্ষুতে একবার সদাপ্রসন্নকে দেখে নিয়ে বললেন, 'নেমে যাওয়ারই কথা। মানুষের কি অত দাম হয়?'

'আরও কি একটু কমবে বলে মনে হয় মামা?'

গোলোকবিহারী তাঁর আসনের তলা থেকে একটা খাম বের করে সদাপ্রসন্নর হাতে দিয়ে বললেন, 'একটু আগে চিঠিরর বাক্সে এটা পেলাম। পড়ে দ্যাখ।'

চিঠিতে লেখা ঃ 'মহাশয়, স্থির করিয়াছি বিনা পণেই খোকাটিকে আপনার হাতে তুলিয়া দিব। তবে একটি শর্ত আছে। আপনাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহ না করিলে খোকাটিকে পালন-পোষণ করিবে কে? শর্ত পালন না করিলে খোকা পাইবেন না। ইহা আমাদের শেষ কথা।'

সদাপ্রসন্ন অবাক হয়ে বললেন, 'অ্যাঁ!'

গোলোকবিহারী তলচক্ষুতে আর-একবার ভালো করে দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, 'আমাদেরও ওই কথা!'

রাজার হেঁচকি

'এই যে বলাইবাবু, নমস্কার। তা খবরটবর সব ভালো তো?'

'হ্যাঁ, তা খবর তেমন খারাপও কিছু নয়। বাজারে নতুন ফুলকপি উঠেছে, রাঙা মুলো পাওয়া যাচ্ছে, সরেস নলেনগুড়ও এসে গিয়েছে। টাটকা কইমাছের আমদানিও ভালো। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না।'

'আপনি কি নবকিশোর রায়কে চেনেন?'

'নবকিশোর! না মশাই, নবকিশোর নামে কাউকে তো মনে পড়ছে না।'

'তা হলে বটকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্যে?'

'উঁহু, বটকৃষ্ণ নামটা শোনা-শোনা হলেও চেনা-চেনা লাগছে না তো।'

'মহানন্দ তলাপাত্র নামের কাউকে কি চেনা ঠেকেছে?'

'না মশাই, মহানন্দ নামটা শুনেছি বলেই মনে পড়ছে না।'

'মুশকিল কী জানেন বলাইবাবু, আপনি না চিনলেও এঁরা সব আছেন কিন্তু! এই আপনার মতোই সকালে বাজার করছেন, দশটায় অফিসে যাচ্ছেন, সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে রুটি আর কুমড়োর ছেঁচকি খাচ্ছেন, লুঙি পরে রকে বসে আড্ডা দিচ্ছেন।'

'অ, তা হবে, কিন্তু এদের কাউকেই আমি চিনি না মশাই।'

'আজ্ঞে, তাই তো বলতে চাইছি বলাইবাবু, দুনিয়ার ক'টা লোককেই বা আপানি চেনেন? চেনা তো বড় সহজ কাজও নয়। লোকও যে হাজারে-বিজারে, লাখো-লাখো, কোটি-কোটি। কোন মহাপুরুষ যেন বলেছেন, লোক না পোক। তা এত অচেনা লোকের মধ্যে এক-আধজনকে মাঝে-মাঝে চেনা করে নিতে ইচ্ছে যায় না আপনার? এই ধরুন, নবকিশোরকে আপনি চেনেন না, কিন্তু নবকিশোরের ছেলে কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে ফস করে যদি আপনার মেয়ে টেঁপির বিয়ে হয়ে যায়, তা হলে নবকিশোর কি আপনার অচেনা থাকবে?'

'টেঁপির বিয়ের কথা উঠছে কেন মশাই? টেঁপির তো মোটে এগারো বছর বয়স!'

'আহা, কথার কথা বলছি আর কি। কৃষ্ণকিশোরেরও মোটেই বিয়ের বয়স হয়নি, সবে সতেরোয় পড়েছে। তাই বলছিলুম অচেনা লোক বলে কি দূরে ঠেলে রাখা ভালো? কার সঙ্গে কখন কোন সূত্রে চেনা-পরিচয় হয়ে যায় তার তো কোনও ঠিক নেই। এই যে আমি, গতকাল পর্যন্তও কি আমার সঙ্গে আপনার চেনা ছিল? আজ কেমন হুট করে চেনা হয়ে গেল বলুন তো!'

'না মশাই, চেনা এখনও হয়নি, আপনাকে আমি মোটেই চিনি না।'

'ওই তো আপনার দোষ বলাইবাবু! চিনবেন না বলে গোঁ ধরে থাকলে কি আর চেনা যায়! আমি হলুম গে গোবিন্দলাল।'

'অ। তা ভালো। পরিচয় পেয়ে বড় খুশি হলুম। আমি তা হলে আসি?'

'বিলক্ষণ। আসবেন বইকি। তা চলুন, আমিও ওইদিকেই যাব কিনা! যেতে যেতে দুটো সুখ-দুঃখের কথাও বলা যাবে। তবে আমার আবার দুঃখের পাল্লাটাই ভারী কিনা।'

'দেখুন গোবিন্দবাবু, দুঃখটুঃখ আমাদের সবারই আছে। এখন ওসব হাপরহাটি শোনার আমার সময় নেই। অফিসের দেরি হয়ে যাবে।'

'তা তো বটেই। তবে কিনা আজ একটু দেরি হলেও তেমন ক্ষতি নেই। রোববারের অফিস তো।'

'আজ রোববার বুঝি? একেবারেই খেয়াল ছিল না। অফিস না থাকলেও আমার অনেক কাজ আছে গোবিন্দবাবু।'

'সে আর বলতে! রোববার তো আপনার গেঞ্জি আর আন্ডারওয়্যার কাচার দিন এ কে না জানে? এ ছাড়া করালীবাবুর সঙ্গে জমিতে বেড়া দেওয়া নিয়ে বকেয়া ঝগড়াটাও মুলতুবি রয়েছে। রোববারে কিস্তির কাজিয়াটাও সারতে হবে। তারপর ধরুন বেলা এগারোটায় লক্ষ্মীকান্তবাবুর সঙ্গে একপাট্টি দাবা খেলা আছে। রোববারে যে আপনার দম ফেলার সময় থাকে না এও সবাই জানে কিনা।'

'আপনি তো খুব ঘোড়েল লোক মশাই। আমার সম্পর্কে এত খবর পেলেন কোথায়? আপনি পুলিশের চরটর নন তো?'

'ঘাবড়াবেন না বলাইবাবু। আমি আসলে একজন দুঃখী লোক। একটা খারাপ খবর দিতেই আপনার কাছে আসা।'

'খারাপ খবর? কীরকম খারাপ খবর মশাই? কাটোয়ায় আমার নব্বই বছরের বুড়ি পিসি থাকেন, তা পিসি হঠাৎ মারাটারা যাননি তো? আমার রাঙামামার ক্যানসার হয়েছিল বলে একটা উড়ো খবর পেয়েছিলাম, তাঁর কিছু হলটল নাকি? হ্যাঁ মশাই, টাটা কোম্পানির শেয়ারের দর কি হঠাৎ পড়ে গিয়েছে? আমার চিরশত্রু কালোবরণ কি লটারি পেয়েছে? নাকি ট্যারাকেষ্ট জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে? সে বলেছিল বটে, জেল থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে নেবে। হ্যাঁ মশাই, বিষ্টুবাবু কি তাঁর দু'হাজার টাকা ধার আদায় করতে আসছেন? আমার নামে হুলিয়া জারি হয়নি তো? নাকি কেউ আমাকে মারার জন্য গুন্ডাদের সুপারি দিয়েছে?'

'না, মশাই না। খবরটা খারাপ হলেও আপনার ভয় নেই। কথাটা হল আমার চাকরিটা গিয়েছে।'

'যাক বাবা, বাঁচা গেল! খারাপ খবরের কথা শুনলে আজকাল বড় বুক ধড়ফড় করে। তা আপনার চাকরি গেলে আমার কী যায় আসে বলুন। আমি মশাই বড্ড ছাপোষা লোক, সাহায্য-টাহায্য চেয়ে লজ্জা দেবেন না।'

'আরে না, আপনাকে লজ্জা দেওয়ার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। দুঃখের কথা কইলে বুকটা একটু ঠান্ডা হয়, এই যা।'

'তা অবশ্য ঠিক। তা আপনি কোথায় চাকরি করতেন গোবিন্দবাবু?'

'রামনগর রাজবাড়ির কথা জানেন কি?'

'রামনগর রাজবাড়ি! না মশাই, ঠিক মনে পড়ছে না?'

'আপনার জানা না থাকলেও রামনগরের রাজবাড়ি খুবই বিখ্যাত।'

'তা হতেই পারে। কত কিছুই তো আমাদের জানা নেই।'

'অতি সত্যি কথা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই রাজবাড়িতে আমার একটি চাকরি হয়েছিল।'

'রাজবাড়ির চাকরি! কিন্তু শুনতে পাই, আজকাল আর রাজাগজাদের দিন নেই। রাজবাড়িগুলো সব মিউজিয়াম বা সরকারি দপ্তর হয়ে গিয়েছে।'

'তা গিয়েছে বটে। তবে দেশের সব চোর-ডাকাত যেমন জেলে যায় না, পুকুর বা নদীর সব মাছই যেমন ধরা পড়ে না, দেশলাইয়ের সবকটা কাঠিই যেমন জ্বালানো যায় না, তেমনই

রাজবাড়িগুলোরও কয়েকটা এখনও টিকে আছে। রামনগরে শুধু রাজবাড়ি নেই, জরির পোশাক পরা মুকুট মাথায় বুড়ো রাজা আছেন, তাঁর তিন রানি, মন্ত্রী, সেনাপতি, সেপাই-সান্ত্রী সব আছেন। সকালে রোজ দরবার বসে, সেখানে অপরাধীদের বিচারও হয়। সভাগায়ক, সভাকবি পর্যন্ত আছেন।'

'বলেন কী মশাই? এ তো আষাঢ়ে গল্প। তা সেখানে যাওয়া যায়?'

'খুব যাওয়া যায়। রাস্তাটা একটু প্যাঁচালো, এই যা!'

'তা আপনি সেখানে কী চাকরি করতেন গোবিন্দবাবু?'

'চাকরিটা বেশ গুরুতরই ছিল মশাই। সকালে শয্যাত্যাগের পর থেকে রাতে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত রাজামশাই ক'বার কাশলেন, ক'বার হাঁচি দিলেন, ক'বার হাই বা ঢেকুর তুললেন এবং ক'টা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তার হিসেব রাখা। কাশি হলে ক্রসচিহ্ন, হাঁচি হলে ঢ্যাড়া, ঢেকুর তুললে গোল্লা, হাই তুললে দাঁড়ি, আর দীর্ঘশ্বাস ফেললে ভাগচিহ্ন। রাত্রিবেলা বুড়ো রাজবৈদ্য সেগুলো যোগ দিয়ে হয়তো দেখলেন, রাজামশাই বাইশবার কেশেছেন, এগারোটা হাঁচি দিয়েছেন, একশো বত্রিশটা ঢেকুর আর তেরোটা হাই তুলেছেন, সেই বুঝে তিনি রাজার জন্য নানা ওষুধের ব্যবস্থা করতেন।'

'এ তো ভারী মজার চাকরি মশাই!'

'না মশাই, মোটেই মজার চাকরি নয়। রাজার হাঁচি-কাশির হিসেব রাখতে গিয়ে আমার নিজের নাওয়া-খাওয়া শিকেয় উঠল। সারাক্ষণ রাজমশাইকে নজরে-নজরে রাখতে হত। একটা হাঁচি-কাশির এদিক-ওদিক হলে বেতন কাটা যেত।'

'তা রাজবাড়িতে বেতনটা কীরকম ছিল গোবিন্দবাবু?'

'তা সেটা খুব মন্দ ছিল না। মাসে পাঁচ মোহর।'

'মোহর? মানে সোনার মোহর?'

'আজ্ঞে, সেখানে এখনও মোহরেরই চল কিনা! রাজামশাই তো সোনা-রুপো ছাড়া আর কোনও ধাতু ছুঁতেন না। তাঁর তলোয়ারের হাতলটাও রুপোবাঁধানো, গাড়ু, পিকদানি, থালা-গেলাস, সবই রুপোর!'

'ওঃ, এ তো ভাবা যায় না মশাই! মাসে পাঁচ মোহর মানে তো পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা! রীতিমতো শাঁসালো চাকরি মশাই? তা সেটা খোয়ালেন কী করে?'

'সেটাই তো দুঃখের কথা মশাই! একদিন রাতে রাজামশাই খেতে বসেছেন। কাশ্মীরি পোলাওয়ের সঙ্গে মাছের নবরত্ন কালিয়া, মোগলাই দমপুক্ত, মাংস, মুড়িঘণ্ট, মুর্গমসল্লম, চিংড়ির মালাইকারি, আলুবখরার চাটনি, নলেনগুড়ের পায়েস, রাবড়ি, রাঘবশাহি আর সরভাজা।'

'এ যে এলাহি ব্যবস্থা মশাই! বলি রাজাগজাদের কি ব্লাডসুগার, কোলেস্টেরল, হার্ট ডিজিজের ভয় নেই, নিদেন গ্যাস, অম্বল অথবা ডিসপেপসিয়া তো হতেই হবে।'

'আপনার আমার মতো চুনোপুঁটি তো নন, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, ইয়া বুকের ছাতি, পেল্লায় ভুঁড়ি, থামের মতো পা, মুগুরের মতো হাত।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। তারপর কী হল বলুন?'

'হ্যাঁ, সেই দুঃখের কথাটাই বলি। মাংস চিবোতে গিয়ে রাজামশাই একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছিলেন। সে এমন ঝাল লঙ্কা যে, রাজামশাই একেবারে নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা। ঝালের চোটে হেঁচকি উঠে গেল। আর সে কী হেঁচকি মশাই! হেঁচকির চোটে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। রাজবৈদ্য ছুটে এলেন, মন্ত্রী এলেন, সেনাপতি এলেন, বিদূষক এলেন। ঘটি-ঘটি জল খাওয়ানো হল, নানা মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা হল, বিদূষক নানা রসিকতা করলেন, কিছুতেই কিছু

হয় না। রাজামশাই হিচিক-হিচিক করে কেবল হেঁচকি তুলে যাচ্ছেন। তখন আমি বললাম, 'মন্ত্রীমশাই আমি একটু চেষ্টা করে দেখব?' মন্ত্রী বললেন, 'অবশ্য-অবশ্য। রাজাকে আরোগ্য করলে পারিশ্রমিক পাবে।' আমি দুরুদুরু বুকে এগিয়ে গিয়ে কী করলাম জানেন? রাজার গালে সপাটে এক চড় কষিয়ে দিলাম!'

'বলেন কী মশাই! এঃ হেঃ এটা খুব ভুল করলেন। রাজার গালে চড় মারলে কি কারও চাকরি থাকে?'

'থাকে। আমারটা অন্তত ছিল। কারণ, সামান্য একজন নফরের হাতে আচমকা চড় খেয়ে রাজা এমন চমকে গেলেন যে, তাঁর হেঁচকি সেরে গেল। গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, 'এই ছোকরা কে?' মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজা, এ আপনার হাঁচি-কাশির হিসেবরক্ষক।' রাজা থমথমে মুখে একটা 'হুঁ' দিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন। হেঁচকি সেরে যাওয়ায় আমি একথালা রুপোর টাকা বকশিস পেলাম। কোম্পানির আমলের অ্যান্টিক জিনিস।'

'তা হলে চাকরি গেল কীসে?'

'পরদিন আমাকে বরখাস্ত করে যে চিঠিটা দেওয়া হল, তাতে লেখা ছিল, 'রাজা ক'টা হেঁচকি তুলেছিলেন তার হিসেব রাখোনি বলে তোমাকে বরখাস্ত করা হচ্ছে।'

'এ তো বড় অন্যায় মশাই! হেঁচকির হিসেব রাখবার তো কথা ছিল না আপনার?'

'সেই দুঃখের কথাই তো বলতে এত দূর আসা মশাই। তা বলাইবাবু, আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই রুপোর টাকাগুলোর কীরকম দাম হবে বলতে পারেন? ভাবছি, কয়েকটা বেচে দেব। যদুস্বর্ণকার পাঁচশো করে দিতে চাইছে। খুব ঠকা হবে কি? এই যে দেখুন না!'

'আহা, হাটেবাজারে এমন জিনিস বেচবার দরকার কি আপনার? এই দরেই আমি না হয় সবকটা কিনে নিচ্ছি।'

'নেবেন? তা নিন। চেনা মানুষের কাছে দু-পাঁচশো টাকা ঠকেও সুখ।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই!'

যতীনবাবুর চার হাত

যতীনবাবুর দোষটা কি জানেন?

আজ্ঞে না, দোষটা কী বলুন তো!

যতীনবাবুর সবচেয়ে বড়ো দোষ হল উনি বড্ড ভালোমানুষ।

অ। তা ভালোমানুষিটা দোষের খাতে ধরছেন কেন?

ধরব না মশাই? কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, ব্যাংকে দিব্যি মোটা টাকার আমানত ছিল, কয়েক লাখ টাকা শেয়ারেও খাটছিল। গাড়ি-বাড়ি-জমিজমায় একপ্রকার ভাসাভাসি কাণ্ড, কিন্তু ওই যে, ভালোমানুষির দোষ। কেবল বলেন আমি একা ভালো থাকলে তো হবে না, অন্যদেরও ভালো রাখতে হবে। আর যেমনি কথা তেমনি কাজ। দু-হাতে আর কতই বা বিলানো যায়। ভগবান যদি চারখানা হাত দিতেন তবে বিলিয়ে সুখ হত।

বটে! তা তার ঠিকানাটা কী বলুন তো!

আহা! আগে সবটা শুনুন তবে তো!

কিন্তু দেরি করলে সব বিলি হয়ে যাবে যে!

আরে না মশাই, না। বিলি হয়েই যেত, কিন্তু ভগবান যে তাঁর আবদার মঞ্জুর করবেন সেটা যতীনবাবু ভেবে দ্যাখেননি। এখন যে তাঁর বড়ো বিপদ চলছে।

কেন মশাই, বিপদ কীসের?

বলছি মশাই, বলছি। তার আগে একটা কথা শুনে রাখুন। ভগবান মানুষটা কিন্তু বড্ড বেখেয়ালের লোক। বড়ো গলা করে চেয়েচিন্তে দেখবেন, কথাটা ভগবান কানেই তুলবেন না হয়তো। কিন্তু হঠাৎ হয়তো আনমনে ফিসফিস করে কিছু একটা চেয়ে বসলেন, অমনি সেটা মঞ্জুর করে দিলেন। তাতে যে কত বিভ্রান্তি হয় সেটা মোটেই ভেবে দেখলেন না।

তা হলটা কী মশাই?

ওই চারটে হাত চেয়েছিলেন যতীনবাবু, ওইটেই তাঁর কাল হল। রাত্রিবেলা শুয়ে ঘুমোচ্ছেন হঠাৎ বগলের তলায় সুড়সুড়ি। প্রথমটায় তেমন বুঝতে পারেননি। অস্বস্তি বোধ করে এপাশ-ওপাশ করছেন, হঠাৎ দুই বগল ফুঁড়ে ভচাক ভচাক করে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এল। প্রথমটায় তো চোরের হাত মনে করে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। বাড়ির লোকজনও সব লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে এল। কিন্তু কাণ্ড দেখে সবাই তাজ্জব। চোর-ডাকাতের ব্যাপার নয়। যতীনবাবুর দুই বগলের তলা দিয়ে গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে-খুঁড়ে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এসেছে।

যাঃ, এ আপনি গুল দিচ্ছেন।

আপনি তো গুল বলেই খালাস। যতীনবাবুর অবস্থা দেখলে বুঝতে পারতেন এটা গুল হলেই বরং ভালো ছিল।

কেন মশাই, দু-দুটো বাড়তি হাত থাকলে কাজকর্মের বেশ সুবিধেই হওয়ার কথা।

কাজকর্মের কথা আর বলবেন না মশাই। কাজকর্মের আগে আরও জ্বলন্ত সব সমস্যা রয়েছে। প্রথম কথা যতীনবাবুর সব জামারই দুটো করে হাতা। কিন্তু চারটে হাতকে দুটো

হাতায় গলানো যাচ্ছে না বলে সকালেই দর্জিদের ডেকে পাঠানো হল। তারাও পড়ল সমস্যায়। জীবনে চার হাতাওয়ালা জামা বানায়নি, প্রথম সমস্যা হল সেটা।

আহা, হাতাগুলো একটু বেশি ঢোলা করে নিলেই তো হয়।

না, হয় না। নতুন হাত দুটো মহা বজ্জাত। তারা পুরোনো হাতের সঙ্গে এক হাতায় ঢুকতেই রাজি নয়। তারা মুঠো পাকিয়ে দর্জিদের দিকে তেড়ে যাওয়ায় সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। যাই হোক, শেষ অবধি চার হাতওয়ালা জামা তৈরি করা হল বটে, কিন্তু চার হাতার গেঞ্জি অমিল। যতীনবাবুর আবার গেঞ্জি ছাড়া চলে না, শেষ অবধি হোসিয়ারিতে অর্ডার দিয়ে অনেক কষ্টে গেঞ্জিরও বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য ক্ষেত্রে।

সেটা কীরকম?

বলছি। যতীনবাবুর এখন একুনে দু-খানা ডান হাত আর দু-খানা বাঁ-হাত, বুঝলেন তো!

দিব্যি বুঝেছি। দুটো ডান, দুটো বাঁ, সোজা হিসেব।

হিসেবটা যদি এত সোজা হত তাহলে আর চিন্তা ছিল কী? প্রথম মুশকিল হল খেতে বসে। যতীনবাবু পুরোনো ডান হাত দিয়ে জলখাবারের একখানা লুচি আলুর ছেঁচকি সাপ্টে সবে মুখে তুলেছেন অমনি তাঁর নতুন ডান হাত ফস করে আরও দু-খানা লুচি পায়েস মেখে তাঁর মুখে দিল গুঁজে। এখন আপনি বলুন আলুর ছেঁচকির সঙ্গে পায়েস মিশে গেলে সেটা খেতে কেমন হয়।

তাই তো! কথাটা ভেবে দেখার মতো।

দুপুরে সবে ঘি মাখা ভাতের গরাস মুখে তুলতে যাবেন এমন সময় তার বিকল্প ডান হাত একগোছা সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি তাঁর মুখে গুঁজে দিলে যতীনবাবুর মনের অবস্থাটা কী হয় বলতে পারেন।

খুব খারাপ হওয়ার কথা।

আর শুধু কী তাই? টেলিফোন ধরতে যাবেন, সেই ফোন নিয়ে দুই ডান হাতে এমন কাড়াকাড়ি হল যে হাত ফসকে টেলিফোনটাই পড়ে ভেঙে গেল। বাঁ-হাতে ঘড়ি পরবেন সে উপায় নেই, এক হাতে ঘড়ি পরতে গেলেই আর-এক হাত খাবলা মারে। একটু তবলা বাজানোর শখ আছে যতীনবাবুর। কিন্তু এখন দুটো ডান হাত এবং দুটো বাঁ-হাত মিলে তবলা ডুগিতে এমন সব আওয়াজ তোলে যে কহতব্য নয়। বরাবর বাঁ-হাতে চায়ের কাপ ধরার অভ্যাস তাঁর, সবে চুমুক দেবেন অমনি নতুন বাঁ-হাতটা উঠে এসে কাপটা এমন চেপে ধরল যে, গরম চা চলকে পড়ে পেটে ফোসকা হওয়ার জোগাড়। বাজার করতে গিয়েও বিপত্তি। পুরোনো হাতে বাছাই বেগুন তুলছেন, নতুন হাত টপাটপ কানা বেগুন তুলে ব্যাগে ভরে দিচ্ছে। বুড়ো ঢ্যাঁড়স, পাকা পটল, ধশা আলু কী থাকছে না আজকাল তাঁর বাজারে!

এঃ হেঃ! যতীনবাবুর তো তাহলে খুব বিপদ যাচ্ছে মশাই।

তা আর বলতে। তাই বলছিলুম, ভগবানের কাছে ফস করে কিছু চেয়ে বসবেন না। বেখেয়ালের লোক, কোনটা দিয়ে ফেলেন কে জানে। যা আছে তাই নিয়েই খুশি থাকুন মশাই বুঝলেন?

খুব, খুব।

পরাণের ঘোড়া

ঘোড়ার মতো জিনিস হয় না। দেখতে যেমন বাহারের, ক্ষ্যামতাও তেমনি দশ মুখে বলার মতো। পরাণ সেই ছেলেবেলা থেকে ঘোড়া দেখে আসছে। তার বাবা গড়ান মণ্ডল ছিল শশীবাবুর আস্তাবলের ছোটো সহিস। মস্ত জমিদার শশীবাবুর ভারি ঘোড়ার শখ। মেলা টাকা খরচ করে দিগ্-বিদিগ থেকে ঘোড়া কিনে আনতেন। মোট এগারোখানা ঘোড়া ছিল তাঁর। দুঃখের বিষয় মোটা মানুষ বলে শশীবাবু ঘোড়ায় চাপতে পারতেন না। তাঁর ছিল দেখেই সুখ। পরাণেরও তাই। মাঝে মাঝে বাবার কাছে ঘোড়ায় চাপবার আবদার করত ঠিকই, কিন্তু বাপ গড়ান ভয় খেয়ে বলত, পাগল হয়েছিস! শশীবাবুর ঘোড়ার পিঠে তোকে চাপালে রক্ষে আছে? তদ্দণ্ডে আমার চাকরিটা যাবে।

সেই ইচ্ছে মনে মনে পুষে রেখেই বড়ো হল পরাণ। আর বড়ো হয়ে সেও তার বাপের মতোই গরিব হল। পয়সা মোটেই হচ্ছিল না তার। তবে ঠিক করে রেখেছিল, পয়সা যদি কোনোদিন হয় তবে আর কিছু নয়, নিজের জন্য একটা ঘোড়া কিনবে।

তা ঘোড়া হল না পরাণের। গন্ধেশ্বর দাসের খেতে মজুর খেটে দিন গুজরান হয় তার। অসুরের মতো খাটুনি বটে, তবে পরাণ বিয়ে-থাওয়া করেনি বলে চলে যায়। এখন তার বাতিক হয়েছে ছুটি হলেই কাগজ-কলম-পেনসিল বা সস্তায় কেনা রঙের কাঠি দিয়ে ঘোড়ার ছবি আঁকা। আঁকা শেখেনি কারও কাছে। কিন্তু তাতে কী, কাউকে দেখানোর জন্য তো নয়, নিজের জন্যই সে অখণ্ড মন দিয়ে নানা ধরনের ভঙ্গিতে ঘোড়ার ছবি আঁকার চেষ্টা করে যায়। ওইটেই তার নেশা। ফুলবাড়ির হাটে একটা লোক মাঝে মাঝে পটের ছবি বিক্রি করতে আসে। তার কাছে রঙ-তুলিও পাওয়া যায়। আর ছবি আঁকার ভুষো কাগজও। পয়সা খরচ করে সেই রঙ কিনে আনল একদিন। দেখল তুলি দিয়ে আঁকার আরও সুবিধে। প্রথমটায় মাপটাতে একটু অসুবিধে হয় বটে, তবে কিছুদিনের চেষ্টায় দেখল ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়। সারাদিন খেতের কাজ করে সন্ধেবেলা এসে পরাণ ছবি আঁকতে বসে যায়। নিজে আঁকে, নিজেই দেখে। তারপর একটু-আধটু শুধরোতেও হয়।

ফুলবাড়ির হাটের পটুয়া হরিরাম তার ছবি আঁকার শখ দেখে বলল, চট বা ক্যানভাসে আঁকলে তা বহুদিন টিকবে, বলে কয়েকখানা ছবি আঁকার ছোটো ক্যানভাস তাকে বেজায় সস্তাতেই দিয়ে দিল।

এদিকে গন্ধেশ্বর একদিন তাকে ডেকে বলল, দ্যাখ বাপু, তুই বেশ গায়ে-গতরে আছিস। আমি কেরামতের বাঁধের ধারের জমিটা রেজিস্ট্রি করতে গঞ্জে যাচ্ছি। সঙ্গে টাকা থাকবে। চলনদার হিসেবে তুই সঙ্গে যাবি। দিনকাল ভালো নয়।

রাজি না হয়ে উপায় কী? একখানা মজবুত লাঠি কাঁধে নিয়ে গন্ধেশ্বরকে পাহারা দিয়ে গঞ্জে নিয়ে যাচ্ছিল পরাণ, পীরপুর শ্মশানের ধারে যখন গোরুর গাড়ি পৌঁছেছে তখনই আশপাশের বাঁশঝাড় থেকে জনা পাঁচ-সাত লেঠেল ডাকাত বেরিয়ে এসে চড়াও হল।

পরাণ গায়ে-গতরে লম্বায়-চওড়ায় বেশ জোয়ান বটে তবে তেমন বীর নয়। জীবনে মারপিট করেনি। আদতে সে নিরীহ মানুষ। তাই ডাকাতদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যই

তার ছিল না। তবে আর কিছু না পারুক গন্ধেশ্বরকে সে আগলে রেখেছিল। বলেও ছিল, টাকার বটুয়াটা ছেড়ে দেন কর্তা। টাকা তো আর প্রাণের চেয়ে বড়ো নয়। কিন্তু গন্ধেশ্বরের কাছে তা নয়, টাকাই তার জানপ্রাণ। ফলে ধুমধাড়াক্কা লাঠিপেটা খেতে হল তাকে। গন্ধেশ্বরের চেয়েও পিটুনি অনেক বেশি খেতে হল পরাণকে। কাঁকালে চোট, মাথায় চোট, কনুইয়ের চোট।

কয়েক লহমায় লুটপাট সেরে ডাকাতরা হাওয়া হওয়ার পর গাঁয়ের লোক এসে তাদের জল-টল দেয়, নিয়ে গিয়ে দাওয়াতে বসায়। টাকার শোকে খুব কান্নাকাটি জুড়েছিল গন্ধেশ্বর। তারা নানা সান্ত্বনাবাক্যে তাকে ঠান্ডা করল। বাড়ি ফিরে গায়ের ব্যথা আর টাকার শোকে শয্যা নিল গন্ধেশ্বর। আর পরাণ রাত্তিরবেলাতেই তার লণ্ঠন জ্বেলে বসে গেল ছবি আঁকতে। তবে ঘোড়ার নয়, আজ যারা হামলা করেছিল তাদের মধ্যে দু-জনের মুখ তার মনে গেঁথে আছে। ছবিতে মুখ দুটো ফোটানো যায় কিনা সেটাই দেখছিল পরাণ, এবং দেখল, ছবি দুটো প্রায় হুবহু হয়েছে।

ডাকসাইটে দারোগা অনাদি সরখেল ডাকাতির তদন্তে এসে গন্ধেশ্বর আর পরাণকে মেলা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। চেহারার বর্ণনা চাওয়াতে পরাণ তার আঁকা ছবি দুটো এনে দেখাতেই দারোগাবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, এ তো ধামাল আর ধানুকা! বিস্তর কেস আছে এদের নামে!

তিন দিনের মাথায় ডাকাতদের পাঁচ-সাতজন ধরা পড়লে গন্ধেশ্বরের তিন লাখ টাকার দু-লাখ উদ্ধারও হয়ে গেল। অনাদি সরখেল কঠিন মানুষ হলেও রসকষহীন নন। তিনি পরাণকে একদিন থানায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুই কি ছবি আঁকিস নাকি?

পরাণ ছবি আঁকাটা অপরাধ কিনা বুঝতে না পেরে খুব ভয়ে ভয়ে বলল, ওই একটু-আধটু মকসো করি আর কী। মাপ করে দেন হুজুর।

অনাদি গম্ভীর গলায় বললেন, মাপ করার কিছু নেই। ছবি আঁকা খারাপ কাজ তো নয় রে আহাম্মক। তোর আঁকার হাত তো দিব্যি ভালো। কার কাছে শিখিস?

পরাণ হাত কচলে বলে, গরিব মানুষ হুজুর, কার কাছে শিখব? নিজেই একটু-আধটু চেষ্টা করি।

হবিবপুরে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করিস। সমঝদার মানুষ। আমি বলে রাখব'খন।

সুধীরবাবু তাঁর আঁকা দেখে ভারি অবাক হয়ে বললেন, না শিখেই যা এঁকেছিস তাইতেই তো তাজ্জব হতে হয়। তা শুধু ঘোড়ার ছবি কেন রে? আর কিছু আঁকিস না?

আজ্ঞে আমার ছেলেবেলা থেকেই বড্ড ঘোড়ার শখ। আর ঘোড়ার জন্যই আঁকি। নইলে আঁকার তেমন ইচ্ছে আমার হয়নি কখনো।

তা আঁকার বিষয় হিসেবে ঘোড়াও কিছু খারাপ নয়। তবে অন্য বিষয়েও একটু আঁকিবুকি করলে ভালো হবে তোর। দুনিয়ায় ঘোড়া ছাড়াও কত কিছু আছে।

তা আছে। তবে পরাণের মনপ্রাণ জুড়ে কেবল ঘোড়াই লাফিয়ে-দাপিয়ে বেড়ায়। তা সে অবাধ্য হল না। সুধীরবাবুর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে নানা বিষয়ে ছবি আঁকার তালিম নিতে লাগল।

একদিন গিয়ে দেখে সুধীরবাবুর বাড়ির সামনে একখানা চকচকে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। একজন বেশ বড়োলোকি চেহারার ফর্সামতো মানুষ চেয়ারে বসা। আর সুধীরবাবু তাঁকে

পরাণের ছবিগুলো দেখাচ্ছেন। তাকে দেখিয়ে সুধীরবাবু বললেন, এই এরই আঁকা। এর নাম পরাণ মণ্ডল। হাসির কথা হল এ ছেলেটার খুব ঘোড়ার শখ। পয়সা পেলে নাকি প্রথমেই একটা ঘোড়া কিনবে।

শুনে লোকটা একটু হাসল আর পরাণ খুব লজ্জা পেল।

লোকটা খানিকক্ষণ ছবিগুলো খুব মন দিয়ে দেখে হঠাৎ মুখ তুলে পরাণকেই জিজ্ঞেস করল, একটা ঘোড়ার দাম কত?

শুনে হাঁ করে রইল পরাণ। ঘোড়ার শখ তার আছে বটে, কিন্তু দরদাম সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। সে মাথা-টাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, সেসব তো জানা নেই।

লোকটা ফের হেসে বলল, ঘোড়া কিনলেই তো হবে না, তার দানাপানির জোগাড় চাই, অসুখ হলে চিকিৎসা করানো চাই, যত্ন-আত্তি চাই।

অতসব কী পরাণ জানে? সে শুধু জানে ঘোড়া টগবগ করে ছোটে, চিঁহিঁ বলে লাফায়, চামরের মতো লেজে ঝাপটা মেরে বাহার দেখায়। সে বলল, যে আজ্ঞে।

তোমার পাঁচটা ছবি আমার পছন্দ হয়েছে। এই নাও দাম।

বলে লোকটা পরাণকে একগোছা টাকা দিল, বেশ অনেক টাকা। হাতে পেয়ে পরাণের হাঁ-মুখ আর বন্ধ হয় না। তার হাবিজাবি ছবিরও যে একটা দাম হতে পারে এ সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে হাতজোড় করে বলল, ও ছবি আপনি এমনিই নিয়ে যান, টাকা দিতে হবে না আজ্ঞে। এ যে অনেক টাকা।

লোকটা স্মিতমুখে বলে, টাকা পেয়ে ঘাবড়ে যেয়ো না হে। তোমার অনেক টাকা হবে। তোমার ভিতরে যে মালমশলা আছে তা ভগবানের দেওয়া। দামটাও সেই জন্যই। সকলের কী আর ওসব মালমশলা থাকে?

তা পরাণের অবাক ভাবটা অনেকক্ষণ চেপে রইল তার ভোম্বল মাথায়। দুটো দিন কাজে কামাই দিয়ে উড়ু উড়ু মন নিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াল সে। ব্যাপারটা এখনও সে তার বোকা মাথা দিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

সুধীরবাবু তাকে ডেকে বললেন, মজুরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ছবি নিয়ে পড়ে থাক। ও ছোটো কাজের আর তো দরকার নেই তোর। ডালভাতের অভাব না হলেই হল।

কাজ ছাড়ার কথা বলতে যেতেই গন্ধেশ্বর হাউরে মাউরে করে তেড়ে এল, কাজ ছাড়বি মানে? ছাড়লেই হল? আমার তাহলে চলবে কী করে? আর তুই-ই খাবি কী?

পরাণ বলল, আজ্ঞে আমার অন্য উপায় হয়েছে। আর ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না, মজুর অনেক পাবেন।

গন্ধেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। চোখে জল। বলল, তা জানি। কিন্তু তোর সঙ্গে যে আমি আমার মেয়ে ফুলির বে দেবো বলে ঠিক করে রেখেছি।

পরাণ তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে জিভ কেটে বলে, বিয়ে। ও বাবা, ওর মধ্যে আমি নেই। বউ বড়ো ঝামেলার জিনিস। তার ওপর ফুলি। সে পয়সাওলা বাপের আদুরে মেয়ে, আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করবে না।

গন্ধেশ্বর হাপুস নয়নে বলে, তা তুই কী পাত্তর খারাপ। সেই যে ডাকাতের হাত থেকে আমার প্রাণরক্ষে করতে মার খেয়েছিলি সেই থেকে তোকে এ বাড়ির সকলের পছন্দ। ফুলিরও ভারি ইচ্ছে।

পরাণ সবেগে মাথা নেড়ে বলে, সে হয় না।

গন্ধেশ্বর ফুঁসে উঠে বলে, দারোগাবাবুরও ইচ্ছে।

পরাণ ভারি মুশকিলে পড়ে গেল। দারোগাবাবু অনাদি সরখেল ভারি ভালো চোখে দেখেন তাকে। তাঁর অবাধ্য হওয়াটা কাজের কথা নয়।

গন্ধেশ্বর বলল, ওরে শোন, বিয়েতে আমি তোকে একটা ভালো ঘোড়া কিনে দেব বলে ঠিক করেই রেখেছি। তোর যে ভারি ঘোড়ার শখ সে কথা সবাই জানে কিনা।

পরাণ একটু হাঁ করে থেকে ঢোঁক গিলে বলল, তবে আর কথা কীসের?

তা পরাণের এখন বউ হয়েছে, একটা শাঁসালো শ্বশুরবাড়ি হয়েছে, বেশ কিছু টাকাও হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা তার এখন একটা টগবগে, তেজি, দৌড়বাজ এবং দুষ্টু ঘোড়াও হয়েছে।

আস্পর্দা

লোকটার সত্যিকারের মতলবখানা কী, কিংবা সে কেমন লোক তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু নবকুমারবাবুর বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়াটাই তো একটা মস্ত বড় অপরাধ। ফটকে দু-দুজন দারোয়ান, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও লোকটা যে কীভাবে ঢুকে পড়ল সেটাই কেউ বুঝতে পারছে না। আর সেইজন্যই বারবাড়ির কাছারিঘরের সামনে তাকে ঘিরে মেলা লোক-লশকর জুটে গেছে। নানা প্রশ্নবাণে তাকে জেরবার করে ফেলার অবস্থা। কিন্তু চেঁচামেচিতে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে যা বলার চেষ্টা করছে তা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। তার বয়স ত্রিশের মধ্যেই, ভারী রোগাভোগা চেহারা, পরনে হেটো ধুতি আর একটা আধময়লা সাদা কামিজ, কাঁধে একখানা ক্যাম্বিসের বড় ব্যাগ, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রংটা বোধহয় ফরসাই ছিল, রোদে রোদে ঘুরে তামাটে মেরে গেছে।

লছমন পালোয়ান নববাবুর পোষা কুস্তিগীর, কেশব হেলা বেতনভুক লেঠেল, বিষ্ণু দত্ত মাইনে করা গুন্ডা, তারাও এসে নানারকম হুমকি ছাড়ছে। কিন্তু লোকটা এতই দুবলা যে কেউ আর গায়ে হাত তোলেনি। কারণ একটার বেশি দুটি রদ্দা সহ্য করার শক্তিও লোকটার নেই। তা বলে বীরত্ব দেখাতে কেউ ছাড়ছে না।

ঠিক এই সময়ে, সকাল আটটায় নববাবু রোদ পোয়াতে সামনে বোরান্দায় এসে বেতের চেয়ারে বসলেন। অতি সুপুরুষ, যেমন ফরসা তেমনই লম্বাচওড়া, পরনে ড্রেসিং গাউনের ওপর দামি বালাপোষ, চোখে-মুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব। তা সেটা নববাবুকে মানায়ও। তাঁর তিন-তিনটে ব্যবসা, লাখ লাখ টাকা আয়। দাপুটে লোক বলে সবাই তাঁকে মান্যগণ্য করে। অঞ্চলের প্রভাবশালী মানুষদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। নববাবুর সুখের অবধি নেই। তাঁর দু-দুটো ছেলে বিদেশে পড়াশুনো করে। এক কোটিপতির বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় আর তাঁর কী চাই? শুধু ছোট মেয়েটার বিয়ে বাকি। তবে সে এখন খুবই ছোট, সাত-আট বছর বয়স।

নববাবু ভ্রু কুঁচকে জটলাটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটু। তারপর তাঁর খাস চাকর শ্রীপদকে বললেন, ওখানে কী হয়েছে রে?

আজ্ঞে, একটা উটকো লোক ঢুকে পড়েছে বলে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

লোকটা কে?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, চোরছ্যাঁচড়াও হতে পারে। উগ্রবাদী হলেই বা আটকাচ্ছে কীসে। আজকাল কি মুখ দেখে লোক চেনার উপায় আছে কর্তা!

লোকটাকে এখানে নিয়ে আয় তো দেখি।

এত্তেলা পেয়ে লোকজন প্রায় পাঁজাকোলা করে লোকটাকে বারান্দায় তুলে এনে নববাবুর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। ততক্ষণে ভয়ে লোকটার কাঁপুনি ধরে গেছে। গলা আরও ক্ষীণ হয়ে গেছে।

তুমি কে হে?

লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে কোনওক্রমে বলল, আজ্ঞে আমি পবন দাস। মালখানাগড়ে বাড়ি।

তা এবাড়িতে ঢুকেছিলে কেন?

লোকটা হাতজোড় করে বলে, আজ্ঞে একটা ময়ূর দেখে ঢুকে পড়েছি।

অ।, তা ময়ূর আগে আর দ্যাখোনি নাকি?

দেখেছি। ময়ূর বড় সুন্দর তো, পেখম ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই দেখে ভাবলুম একটা ছবি আঁকি।

ছবি! তুমি কি আঁকিয়ে মানুষ নাকি হে!

যে আজ্ঞে।

তা কীসের ছবি আঁকো তুমি?

আজ্ঞে পট আঁকি, সিনসিনারি আঁকি, পশুপাখি আঁকি, মানুষ আঁকি।

বাঃ এ তো খুব ভালো কথা। তুমি তাহলে তো একজন গুণী মানুষ! তা চট করে আমার মুখখানা এঁকে দেখাও দেখি। তুমি কেমন আঁকিয়ে দেখি!

লোকটা যেন এই কথায় একটু ধাতস্থ হয়ে কাঁধের ব্যাগখানা নামিয়ে তা থেকে তার আঁকার সরঞ্জাম বের করে মেঝেতে বসে গেল। একখানা মোটা কাগজে ভারী মন দিয়ে সে তুলি আর রঙে কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে হুবহু নববাবুর মুখখানা এঁকে ফেলল।

দেখে সবাই তাজ্জব।

নববাবু কাগজখানা তুলে আলোতে ভালো করে দেখে বললেন, না হে, তোমার যে পাকা হাত তা স্বীকার করতেই হচ্ছে।

লোকটা হাতজোড় করে বলে, ওই একটা কাজই আমি পারি। ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই পারি না বলে আমার বড় দুরবস্থা।

নববাবু খুশি হয়ে বললেন, আহা, এমন ছবির হাত যার, তার আর ভাবনা কী? বলি চালচুলো কিছু আছে?

লোকটা মাথা চুলকে বলল, গাঁয়ে একটু মাথা গোঁজার জায়গা ছিল। তা মহাজন দেনার দায়ে কেড়ে নিয়েছে। তিন কুলে কেউ নেই। পেটের ধান্ধায় বেরিয়ে পড়েছি।

চিন্তা কোরো না। আমার কাছারিঘরের পাশেই কর্মচারীদের থাকার কয়েকখানা ঘর আছে। কালীপদ রিটায়ার করে দেশে চলে গেছে, তার ঘরেই বেশ থাকতে পারবে। খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা হবে।

লোকটা এ কথায় একেবারে গলে গেল।

নববাবু বললেন, তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমার পরিবারের লোকজনের ছবি আঁকতে হবে কিন্তু।

লোকটা খুব রাজি।

তা পবন দাস রয়ে গেল। দু'বেলা দুটি খেতে পায়, শোওয়ার জন্য একখানা তক্তপোশ, মাথার ওপর পাকা ছাদ, এর চেয়ে বেশি সুখ পবন কল্পনাও করতে পারে না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর যেখানে-সেখানে ছবি আঁকতে বসে যায়। চিত্রকর সে খুবই ভালো। যা আঁকে তাই যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাকে দিয়ে নিজের নিজের মুখ আঁকাতে সবাই এসে ধরে পড়ে। তা পবন কাউকে বিমুখ করে না। এঁকে দেয়। আর এইভাবেই গঞ্জে তার বেশ একটু নামডাক হল। গঞ্জের এক মহাজন এসে একদিন ফস করে পাঁচশো টাকা ফেলে বলল, বাপু হে, আমার বাবা বুড়ো হয়েছেন, কবে আছেন কবে নেই, একখানা ছবি এঁকে দাও, বাঁধিয়ে রাখব।

পাঁচশো দিয়ে শুরু হল, কিন্তু পাঁচশোতেই ব্যাপারটা থেমে থাকল না। ক্রমে ক্রমে হাজার, দু-হাজার, তারপর পাঁচ-দশ হাজার অবধি উঠে যেতে লাগল তার ছবির দাম। তেল রং আর ক্যানভাস কিনে আঁকা ধরল পবন। শ্বাস ফেলার সময় রইল না।

বছর না ঘুরতেই পবন হিসেব করে দেখল, সে লাখপতি হয়ে গেছে। কোটিপতি হতেও বেশি দেরি নেই।

পুরুষের ভাগ্য ব্যাপারটা ভারী গোলমেলে। নববাবু দিব্যি ছিলেন, হঠাৎ মাত্র বাহান্ন বছর বয়সেই তাঁর একদিন হার্ট অ্যাটাক হল। মরো-মরো হয়েও বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু বড্ড জবুথবু হয়ে পড়লেন। কাজ-কারবার দেখে কে? ছেলেরা বিদেশে, মেয়ে-জামাইও দূরে থাকে। দুটো কারবার বেচে দিলেন নববাবু। একটা কারবার ধুঁকতে ধুঁকতে চলতে লাগল। কর্মচারীরা চুরিচামারি শুরু করল। বিপক্ষের লোকেরা পিছনে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখে ছেলেরা দেশে ফিরল বটে, কিন্তু কাজ-কারবারে অভিজ্ঞতার অভাবে ব্যবসায় বড় রকমের লোকসান হয়ে গেল। বড়লোক নববাবু দ্যাখ না দ্যাখ বেশ গরিব হয়ে গেলেন। দারোয়ান, কর্মচারী সব বিদেয় করে দিতে হল, বাগানে আগাছা গজাল, ঘরদোর শ্রীহীন হতে লাগল। শুধু বারবাড়ির ছোট ঘরখানায় বসে ছবি আঁকা ছাড়েনি পবন।

পবনকে ডেকে একদিন নববাবু বললেন, বাপু হে, চিরদিন কারও সমান যায় না। আজ অবস্থাগতিকে আমার দুর্দশা উপস্থিত। ভাগ্যগুণে তুমি খুব উন্নতি করেছ। এখন আর কষ্ট করে এ বাড়িতে থাকবে কেন? বরং দালানকোঠা কিনে আরামে থাকোগে যাও।

পবন জিব কেটে বলল, তাই কি হয়? আমার যা কিছু হয়েছে সব তো আপনার জন্যই। একদিন আপনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন। আজ প্রতিদান দেওয়ার সময় এসেছে।

নববাবু অবাক হয়ে বলেন, বলো কী হে! কলিকাল বলে কথা, এ যুগে কি কেউ কারও জন্য করে? দেখো বাপু, আমি নিজের কর্মফল ভোগ করছি। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের ক্ষতি করবে কেন? আমার সব বন্ধুই এই অসময়ে আমাকে ছেড়ে গেছে। তুমি কেন পড়ে থাকবে?

আপনার সুদিন যে থাকবে না তা বোধহয় আমিও জানতাম। কে জানে ভগবান বোধহয় সেইজন্যই আমাকে এবাড়িতে টেনে এনেছিলেন। আমার বেশ কিছু টাকা জমেছে। এ টাকা আমার কোন কাজে লাগবে বলুন, তিন কুলে কেউ নেই আমার।

নববাবু বিপদে পড়লেও অহংটা টনটনে আছে। মাথা নেড়ে বললেন, সে হয় না।

নববাবুর স্ত্রী পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, কোন সুবাদে তোমার টাকা নেব বাবা? প্রতিদান নিলে বড্ড ছোট হয়ে যাব যে।

পবন তটস্থ হয়ে বলে, ছেলে বলে ধরে নিন না মা।

নববাবুর স্ত্রী রামসুন্দরী বললেন, তা হয় না। তবে আমার ছোট মেয়ে মঞ্জুরীর বিয়ের বয়স হয়েছে। যদি তাকে বিয়ে করো তাহলে একটা উপায় হয়তো হয়।

পবন অবাক হয়ে বলে, সে তো আস্পর্দা হয়ে যাবে মা ঠাকরুন।

নববাবু হাঃ হাঃ করে হেসে বলেন, আস্পর্দা! কার হে?

কানাই সামন্তের দোকান

নাঃ, একশোটা টাকা জলেই গেল কানাই সামন্তর। তা এরকম কত টাকাই তো তার যায়। কি আর করা। কানাই কিন্তু পয়সাওলা লোকও নয়, বরং বড়ই গরিব। গাঁয়ের এক প্রান্তে তার ছোট মুদির দোকান। তেমন চলেও না। তার ওপর লোকে ধারবাকিতে জিনিস নিয়ে টাকা শোধও দিতে চায় না। তা মুশকিলে পড়েই কানাই সামন্ত সহজে বড়লোক হওয়ার ফিকির খুঁজছিল।

তা ফিকির কে না খোঁজে। কেউ কেউ ফিকিরের জোরে পয়সা বাগিয়েও তো নেয়। কিন্তু কানাইয়ের কপালটাই এমন যে, সে কেবল ফেরেববাজদের খপ্পরে পড়ে যায়।

এই তো মাস চারেক আগে প্রাতঃকালেই এক ডাকসাইটে সাধুবাবা এসে হাজির। যেমন পেল্লায় চেহারা, তেমনি বিরাট তার দাড়ি আর গোঁফ। হাতে সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূল, মাথায় জটা। দেখলে ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়। এসে আধসের ছাতু আর এক পো গুড় চাইল। ভারী ভক্তির সঙ্গেই দিয়েছিল কানাই, সাধুবাবা তার ঝোলা থেকে থালা আর ঘটি বের করে টিপকলের জলে ছাতু মেখে এক চোপাটে উড়িয়ে দিয়ে যা একখানা বজ্রপাতের মতো ঢেঁকুর তুলল যে পিলে চমকে যায়। দামটা চাইবার সাহসই হচ্ছিল না কানাইয়ের। হাতজোড় করে বসে রইল পায়ের কাছে।

সাধু এরপর বাইরের বেঞ্চিখানায় শুয়ে ঘণ্টা চারেক টানা ঘুম দিয়ে উঠল। সে কী নাকের ডাক রে বাবা। দুপুরে উঠে সেবার জন্য চাল ডাল চাইল, সঙ্গে আলু কুমড়ো পটল বরবটি যা ছিল ঘরে, নুন তেল এবং একটু ঘি-ও। ভয়ে ভয়ে তাও বের করে দিল কানাই। ঝোলা থেকে হাঁড়ি বের করে ইটের উনুনে কাঠের জ্বালে সের দেড়েকের মতো খিচুড়ি সাপটে আবার সেই উদগার। দিনান্তে ঝোলা থেকে একটা নুড়ি পাথর বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, তোর সেবায় খুশি হয়ে এই পরশপাথর দিয়ে গেলুম। লোহায় ছোঁয়ালেই সোনা। বলে নিজের হাতের লোহার বালাটায় পাথরটা ঠেকাতেই সেটা হলুদবর্ণ ধারণ করায় কানাই আর চোখের জল সামলাতে পারল না। এতদিনে তার দুঃখ ঘুচল। সাধু তার জন্য যজ্ঞ করবে বলে পাঁচশো টাকা নিয়ে চলে গেল।

সাধু যেতে না যেতেই যেন ভগবানই একজন দূতকে পাঠিয়ে দিলেন। এক গরুর গাড়ি বোঝাই পুরোনো লোহালক্কর নিয়ে একটা বুড়ো লোক এসে হাজির। 'পুরোনো লোহা চাই গো' বলে হাঁক পাড়ছিল। তাকে আর হাঁকাহাঁকি করতে না দিয়ে দরদাম না করেই এক গাড়ি পুরোনো বালতি, ভাঙা ট্রাঙ্ক, জং ধরা শিক এই সব পাঁচ হাজার টাকায় কিনে ফেলল কানাই।

সেই সব এখনও দোকানের পাশে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, পরশপাথর ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে ক্ষয় করে ফেলেছে, কিছুই হয়নি।

তা কানাইকে এরকম আক্কেল সেলামি মাঝে মাঝেই দিতে হয়।

বছর দেড়েক আগেই এক ভণ্ড ফকির তাকে অক্ষয় ক্যাশবাক্স গছিয়ে গিয়েছিল। মিষ্টি হাসি, মিঠি মিঠি বুলি, মিষ্টি চাউনি আর ভালো পোশাক-টোশাক দেখে কানাই কুপোকাৎ। ফকির তার দোকান দেখে খুব আক্ষেপ করে বলল, ভালো লোকেদের কপাল খারাপই হয়। তবে গুরুর মেহেরবানিতে এখন থেকে আর কানাইয়ের কষ্ট থাকবে না। সে তার পুঁটুলি খুলে একখানা কাঠের পুরোনো ক্যাশবাক্স বের করে তার হাতে দিয়ে খুলতে বলল। খুলে কানাই দেখে তাতে

অন্তত শ' পাঁচেক টাকার তাড়া, ফকির টাকাটা তুলে নিয়ে বাক্স বন্ধ করে তাকে ফের খুলতে বলল। কানাই খুলে দেখে তাতে অবিকল আগের মতোই শ' পাঁচেক টাকা। ফকির বাক্সটা তাকে দিয়ে বলল, দিনে দু'বারের বেশি খুলো না কিন্তু। বেশি লোভ ভালো নয়। এই অক্ষয় ক্যাশবাক্স তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। দরগায় সিন্নি চড়ানোর জন্য হাজার খানেক টাকা দক্ষিণা নিয়ে ফকির বিদেয় হল। ক্যাশবাক্স আজও দোকানঘরে পড়ে আছে। ওই দু'বারই যা ফকিরের কেরামতিতে টাকা বেরিয়েছিল, তারপর থেকে ঠন ঠন।

এই পরশুই এক আখাম্বা তান্ত্রিক এসে হাজির, বিভীষণ চেহারা, পরনে রক্তাম্বর, দাড়ি- গোঁফ, চুল নিয়ে একেবারে লকলক করছে। গুল্লু চোখে বেশ ব্যাঘ্রদৃষ্টি। বজ্রকণ্ঠে বলল, তোর তো দুঃখু রে!

যে আজ্ঞে বাবা, বড় কষ্টে আছি।

বাড়িতে পাঁঠা আছে?

আজ্ঞে না।

ফলার করানোর মতো কিছু নেই?

আজ্ঞে, দুধ-চিঁড়ে হবে।

তাই নিয়ে আয়। সঙ্গে মর্তমান কলা।

তা তান্ত্রিক সেরটাক চিঁড়ে-দুধ খেয়ে ভারী খুশি। বলল, পাঁঠা হলে আরও জমত রে। তা যাক, এই আয়নাখানা দিয়ে যাচ্ছি, আয়নার দিকে চেয়ে মা কালীকে স্মরণ করে তিনবার বলবি জিঞ্জিরি ফটাস! জিঞ্জিরি ফটাস! জিঞ্জিরি ফটাস! অমনি আয়নার ভিতর দিয়ে গুপ্তধনের হদিস পেয়ে যাবি। একেবারে ফটোগ্রাফের মতো। এবার মায়ের পুজোর বাবদ পাঁচশো এক টাকা বের কর দিকি।

তা কানাই এখন খানিক সেয়ানা হয়েছে। আভূমি পেন্নাম করে বলল, পাঁচশো পেরে উঠবো না বাবা, ক্যাশবাক্সে বড় জোর পঞ্চাশটা টাকা হতে পারে।

তান্ত্রিকের বড় তাড়া, বলল, তাই দে। আমার আবার আজ রাতের মধ্যেই মাধবপুর শ্মশানে পৌঁছোতে হবে।

টাকা নিয়ে একটা কাঠের ফ্রেমের সস্তা পুরোনো আয়না দিয়ে উধাও হল।

সেই আয়নায় গুপ্তধন কেন, নিজের মুখখানাও ভালো করে দেখা যায় না, এমন ময়লা।

নিজের আহাম্মকির কথাই আজকাল বসে বসে ভাবে কানাই। লোভেই না পাপ হয়, আর পাপেই তো বিনাশ, লোভে পড়েই না সে কতগুলো ঠগবাজ আর জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিল। ভবিষ্যতেও হয়তো পড়বে।

তবে জিনিসগুলো সে ফেলে দেয়নি, সেই পরশমণি, ক্যাশবাক্স আর আয়না সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। জিনিসগুলো জালি হলেও তাকে তো গুণাগার দিতে হয়েছে।

ক'দিন যাবৎ তার বউ নন্দরানি একটা আয়নার বায়না করছে। মুগবেড়ের হাট থেকে সাড়ে বারো টাকায় একখানা আয়না অনেক দিন আগেভাগে কিনে দিয়েছিল কানাই, যে আয়নাখানা হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাওয়ায় বউ নন্দরানির ভারী অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু মুগবেড়ের হাট বসবে সেই শনিবার। হাট ছাড়া ভালো আয়না পাওয়াও যায় না। মাঝখানের তিনটে দিন কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য সে তান্ত্রিকবাবার দেওয়া আয়নাটা একটু সাফসুতরো করে দিয়েছে নন্দরানিকে।

সকালে দোকান খোলার আগে যখন চাট্টি মুড়ি আর বাতাসা খেতে বসেছে কানাই তখন নন্দরানি এসে বলল, ওগো এ কী আয়না দিয়েছ। এর ভিতর যে সব বিটকেল জিনিস দেখা যাচ্ছে।

কানাই উদাস হয়ে বলে, ও আয়নাটা ওরকমই। কোনওরকমে কাজ চালিয়ে নাও, তিন দিন পরই ভালো আয়না এনে দেব।

নন্দরানি রাগ করে বলে, না বাপু, আমি বরং কাঁসার থালায় মুখ দেখে সিঁদুর পরে নেব। এই ভূতুড়ে আয়না তোমার কাছে থাক। বলে আয়নাটা তার পাশে রেখে চলে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুড়ির বাটি রেখে কানাই আয়নাটা নিয়ে উঠে পড়ল। দোকানে এসে জায়গামতো আয়নাটা রাখতে গিয়েও কী ভেবে একটু ভালো করে দেখল আয়নাটাকে। ঘষে মেজে একটু সাফসুতরো করায় আয়নাটা ঠিক আগের মতো ঘোলাটে নেই আর, কিছু যেন দেখাও যাচ্ছে।

ভালো করে দেখতে গিয়ে কানাইয়ের একগাল মাছি। সত্যিই তো, আয়নায় নিজের মুখের বদলে অন্য কি সব যেন দেখা যাচ্ছে। একটু আলোতেও নিয়ে গিয়ে সে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে পেল বেশ আবছায়ার মধ্যে, যেন একটা অন্ধকার ঘরে একখানা সিন্দুকমতো বাক্স, আর তা থেকে একটা তালা ঝুলছে। আর সিন্দুকের পাশ দিয়েই খুব সরু একটা সিঁড়ি ওপর দিকে উঠেছে। আর কিছু বোঝা গেল না।

কানাই বজ্রাহতের মতো আয়নার দিকে চেয়ে বসে রইল। মনে হচ্ছে এটা একটা গুপ্তধনেরই সংকেত। কিন্তু এই ব্যাটা লোহার বাক্সটা কোথায় কোন মাটির নীচে পোঁতা আছে তা কে বলবে?

কানাইয়ের এখন ভারী মুশকিল হল। গুপ্তধনের হদিস একটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ঠিকানা? সেটাই তো জানা নেই। আয়নাখানা ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে সাবধানে লুকিয়ে রাখল সে। তারপর আকাশপাতাল ভাবতে বসল।

তার ভাবনার চোটে চার-চারজন খদ্দের এসে ফিরে গেল। একজন ময়দার খোঁজে এসেছিল, একটা বাচ্চা মেয়ে এসেছিল হলুদের গুঁড়ো কিনতে, একজন এল পোস্ত আর একজন এসেছিল সোডা নিতে। সবাইকে মাথা নেড়ে নেই বলে ফিরিয়ে দিল সে।

দিনকতক আয়না নিয়েই তার চব্বিশ ঘণ্টা কাটছে। ফাঁক পেলেই আয়না মুখের সামনে ধরে বসে থাকে, কিন্তু দৃশ্যটার কোনও পরিবর্তন নেই, সেই তালা লাগানো লোহার সিন্দুক আর সরু সিঁড়ি।

নাওয়া-খাওয়া গোল্লায় গেল কানাইয়ের। রাতে ঘুম হয় না। সারাদিন বিড় বিড় করে।

দিন পনেরোর মাথায় দুপুরবেলা যখন ফাঁকা পেয়ে দোকানঘরে বসে আয়নায় মজে আছে কানাই, তখন একজন কেষ্টবিষ্টু চেহারার লোক এসে দোকানের সামনে একটা মোটরগাড়ি থেকে নামল। একটা হাঁক মেরে বলল, ওহে দোকানি, তোমার কাছে লবঙ্গ পাওয়া যাবে?

কানাই অম্লানবদনে বলে দিল, না নেই।

লোকটা বেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে হঠাৎ বলল, দোকানদারিতে মন দাও হে দোকানি, লক্ষ্মী তোমার ঘরেই পা বাড়িয়ে আছে। আয়নার গুপ্তধন তো মরীচিকা।

এই বলেই বাবুটি গাড়িতে উঠে ভোঁ করে চলে গেল, আর অবাক হয়ে কানাই দেখল আয়নাটা একদম অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই সিন্দুক নেই, সিঁড়ি নেই, কিচ্ছু নেই, কানাইয়ের মাথায় বজ্রাঘাত। খানিকক্ষণ হতভম্ব বসে থাকার পর হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরল। বাবুটি শেষ কথাটা যেন কী বলে

গেল? লক্ষ্মী তোমার ঘরেই পা বাড়িয়ে বসে আছে। আয়নার গুপ্তধন তো মরীচিকা! তাহলে কি লোকটা সব জানে?

কানাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার দোকানের চারপাশটা ভালো করে দেখল, দেখল তার দোকানটা ভারী হতশ্রী। অযত্নে-অনাদরে কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া। দোকানে তেমন জিনিসপত্রের যোগান নেই, খদ্দের এসে ফিরে যায়। হিসেবপত্রও ঠিকমতো রাখা হয় না, খরিদ্দারদের সঙ্গে তেমন বিনয় বচনে কথাও বলে না সে। তাহলে এটাই কি তার অভাবের কারণ?

পরদিন থেকেই দোকানের পিছনে লেগে পড়ল কানাই। বিস্তর মেহনতে দোকানটা যথাসাধ্য সাফসুতরো করল। পাইকারি বাজার থেকে মেলা মাল তুলে এনে দোকান সাজাল। হিসেবের খাতা রাখল নতুন করে।

মাস ঘুরতে না ঘুরতেই বিক্রিবাটা বেড়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ। সারাদিন খদ্দেরের আনাগোনা। সন্ধের পর টাকা গুনতে হিমসিম খেতে হয়।

পরশমণি, ক্যাশবাক্স, আর আয়না সে ফেলেনি, তার আহাম্মকির স্মারক হিসেবে সেগুলো দোকানেই রাখা আছে, সেদিকে চেয়ে মাঝে মাঝে সে বিজ্ঞের মতো হাসে।

নফরগঞ্জের রাস্তা

ও মশাই, নফরগঞ্জে যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিকে বলতে পারেন?

নফরগঞ্জে যাবেন বুঝি? তা আর বেশি কথা কী! গেলেই হয়। বেশি দূরের রাস্তাও নয়। নফরগঞ্জে একরকম পৌঁছে গেছেন বলেই ধরে নিন।

বাঁচালেন মশাই, স্টেশন থেকে এই রোদ্দুরে মাইল পাঁচেক ঠ্যাঙাচ্ছি। তিন তিনটে গাঁ পেরিয়ে এলুম, এখনও নফরগঞ্জের টিকিটিও দেখতে পাইনি।

আহা, বড্ড হয়রান হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে! এই দাওয়াতেই বসে জিরিয়ে নিন কিছুক্ষণ। বেলা মোটে বারোটা বাজে। চিন্তা নেই।

তা না হয় বসছি। তা নফরগঞ্জ এখান থেকে কতটা দূর বলতে পারেন?

অত উতলা হচ্ছেন কেন? এই মানিকপুর গাঁকে তো অনেকে নফরগঞ্জের চৌকাঠ বলেই মনে করে। তা নফরগঞ্জে কার বাড়িতে যাবেন মশাই?

সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। গলাটাও শুকিয়ে এসেছে কিনা। তা একটু জল পাওয়া যাবে?

বলেন কী! মানিকপুরে জল পাওয়া যাবে না মানে? মানিকপুরের জল যে অতি বিখ্যাত। এখানকার জলে কলেরা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ, আমাশয়, বেরিবেরি সব সারে। এই যে ঘটিভরা জল, ঢক ঢক করে মেরে দিয়ে দেখেন দিকি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শরীরের বল ফিরে আসে কিনা।

বাঁচালেন মশাই, তেষ্টায় বুকটা কাঠ হয়ে আছে।

কেমন বুঝলেন জল খেয়ে?

দিব্যি জল, হুবহু জলের মতোই।

জলের মতো লাগলেও ও আসলে হল জলের বাবা। একবার পেটে সেঁধোলে আর উপায় নেই। লোহা খেলে লোহাও হজম হয়ে যাবে। রোগ-বালাই পালাই-পালাই করে পালাবে। হাতির বল এসে যাবে শরীরে।

তাই হবে বোধহয়। জল খেয়ে আমার বেশ ভালোই লাগছে। এবার তাহলে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই রওনা দিতে পারি।

আহা, সে হবে'খন। নফরগঞ্জ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তা কার বাড়ি যাবেন যেন? কুঞ্জবিহারী দাস মশাইয়ের নাম শোনা আছে কি?

কুঞ্জবিহারী? তা কুঞ্জবিহারী কি আপনার কেউ হয়? শালা বা ভগ্নীপোত বা ভায়রাভাই গোছের?

না মশাই না, কুঞ্জবিহারীকে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে।

তা ভালো, তবে কিনা ভেবেচিন্তে যাওয়া আরও ভালো।

কেন মশাই, ভেবেচিন্তে যাওয়ার কী আছে? মানুষের বাড়িতে কী মানুষ যায় না? তার ওপর মাথায় একটা দায়িত্ব নিয়েই যেতে হচ্ছে।

সেটা বুঝতে পারছি। প্রাণের দায় না হলে কী কেউ সাধ করে নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারীর ডেরায় গিয়ে সেঁধোবার সাহস করে?

আপনি কী বলতে চাইছেন যে কুঞ্জবিহারী খুব একটা সুবিধের লোক নন!

সেকথা আবার কখন বললুম? না মশাই, আমি বড্ড পেটপাতলা মানুষ। মনের ভাব চেপে রাখতে পারিনে। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, ওসব ধরবেন না।

বলেই যখন ফেলেছেন তখন ঝেড়ে কেশে ফেললেই তো হয়। অসোয়াস্তি কমে যাবে।

আসলে কী জানেন কুঞ্জবিহারী বোধহয় খুবই ভালো লোক। তবে নিন্দুকেরা নানা কথা রটায় আর কী।

না মশাই, আপনি চেপে যাচ্ছেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই যে, আমার ভাইঝির সঙ্গে কুঞ্জবিহারীর ছেলে বিপ্লববিহারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতেই আসা।

বিপ্লববিহারী! ওরে বাবা!

অমন আঁতকে উঠলেন কেন মশাই! বিপ্লববিহারী কি ছেলে ভালো নয়? শুনেছি সে ভালো লেখাপড়া জানে। এম.এসসি পাশ করে আরও কীসব পড়াশুনো করছে! চাকরিও করে ভালো।

তা হবে। কত কিছুই তো শোনা যায়।

নাঃ, বড্ড মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। ভাবগতিক তো মোটেই ভালো বুঝছি না। দাদাকে বারবার বললুম, ফুলির বিয়ের সম্বন্ধ অত দূরে কোরো না। কিন্তু দাদা কী আর শোনার পাত্র? বেশ ফ্যাসাদেই পড়ে গেল দেখছি। ও মশাই, একটু খুলে বলুন না, এখানে বিয়ে হলে আমার ভাইঝিটা কি জলে পড়বে?

ভাইঝি তো আপনার। তাকে জলে ফেলুন, ডাঙায় ফেলুন সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমি আর কথাটি কইছি না।

তাহলে আর কী করা! যাই, নিজের চোখে অবস্থাটা একটু দেখেই আসি।

আহা অত তাড়া কীসের? দুটো মিনিট বসেই যান। আমার মেয়েকে বলেছি, শশা দিয়ে দুটি মুড়ি মেখে দিতে। দুপুরবেলায় গেরস্থ বাড়িতে শুধু মুখে চলে গেলে যে অকল্যাণ হয়। ডাব পাড়তে গাছে লোক উঠেছে। এল বলে। ডাব খেয়ে মাথাটা ঠান্ডা করুন।

না মশাই, না! দুপুর গড়িয়ে গেলে চলবে না। সেখানে যে আমার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন!

দেরি কীসের। সবে তো বারোটা। পথও বেশি নয়। কথা আছে।

আজ্ঞে, কথাই তো শুনতে চাইছি।

নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারী দাস সম্পর্কে জানতে চাইলে এ তল্লাটের গাছপালা, গোরুবাছুরকে জিজ্ঞেস করলেও মেলা খবর পেয়ে যেতেন। এই দশ-বারো বছর আগেও কুঞ্জগুন্ডা দিনে তিনটে খুন না করে জলস্পর্শ করত না। প্রতি রাতে অন্তত গোটা দুই বাড়িতে ডাকাতি না করলে তার ঘুম হত না। আর রাহাজানি, তোলা আদায় কোন গুণটা না ছিল তার! তবে এখন বয়স হওয়াতে রোখ কিন্তু কমেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়লে আর বিশেষ লাশটাশ ফেলে না। তবে তার জায়গা এখন নিয়েছে ওই তার ছেলে বিপ্লববিহারী। তফাত হচ্ছে, বাপ মানুষ মারত দা-কুড়ুল দিয়ে, ছেলে মারে বন্দুক-পিস্তল দিয়ে।

বলেন কী মশাই! দাদা যে বলল, কুঞ্জবিহারী রীতিমতো ফোঁটাকাটা বৈষ্ণব। ভারি নিরীহ মানুষ। তার ছেলেটিও নাকি ভারি বিনয়ী। আর খুব সভ্যভব্য।

হাসালেন মশাই, আপনার দাদার চোখে নিশ্চয়ই চালসে ধরেছে। এই যে আপনার মুড়ি আর ডাব এসে গেছে। রোদে তেতে পুড়ে এসেছেন, একটু খিদে-তেষ্টা মিটিয়ে নেন তো?

আর খিদে-তেষ্টা। আপনার কথা শুনে খিদে-তেষ্টা তো মাথায় উঠেছে।

আহা, তা বললে কী আর চলে? তা ভাইঝির বিয়ে দেওয়ার জন্য কি আর পাত্র জুটল না?

সেইটেই তো ভাবছি। দাদার তো দেখছি কাণ্ডজ্ঞানই নেই।

তা কুঞ্জগুন্ডা তার ছেলের বিয়েতে কত পণ নিচ্ছে? দু-চার লাখ টাকা হবে না?

না মশাই, সেরকম তো কিছু শুনিনি। বরং দাদা একবার কথা তোলায় নাকি কুঞ্জবিহারী তার দু-হাত ধরে কেঁদে ফেলে আর কী। লোকটা নাকি বলেছে, তাদের বংশেই পণ নেওয়ার কোনো রেওয়াজ নেই।

হুঁঃ! আপনিও বিশ্বাস করলেন সে কথা। আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে না নিলেও গোপনে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে ঠিকই। ধরে রাখুন, তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা হবেই।

কিন্তু দানসামগ্রী দিতেও যে বারণ করেছে। বলেছে, দানসামগ্রী আবার কীসের? আমার ছেলে যদি তার বউকে প্রয়োজনের জিনিস কিনে দিতে না পারে তবে আর তাকে যোগ্যপাত্র বলে ধরা যায় না।

হেঃ হেঃ, কথার মারপ্যাঁচ মশাই, কথার মারপ্যাঁচ। এখন ওসব বললে কী হয়। বিয়ের পর দেখবেন নানা ছুতোয় হরেকরকম ফিকির করে ঘাড়ে ধরে আদায় করবে।

আপনি তো আমাকে বড়োই টেনশনে ফেলে দিলেন মশাই। এখন এই বিয়ে কী করে ভাঙা যায় তাই ভাবছি। কথা একরকম পাকা হয়েই আছে। আজ দিন ঠিক করে নিয়ে যাওয়ার কথা আমার। পুরুতমশাই অপেক্ষা করছেন। বড়ো মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

বিয়ে ভেঙে দেওয়াই ঠিক করে ফেললেন বুঝি।

তাছাড়া আর উপায় কী বলুন।

আহা, শুনে বড়ো স্বস্তি পাচ্ছি। মেয়েটা বেঁচে গেল। তাহলে বরং আজ আর আপনার নফরগঞ্জে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়ির পিছনে টলটলে পুকুরের জলে স্নান করে নিন, তেল গামছা সাবান সব আসছে ভিতরবাড়ি থেকে। তারপর দুপুরে দুটি ডাল-ভাত খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হবেন'খন। পাবদা মাছের ঝাল, সরপুঁটির সর্ষে ভাপা, রুই মাছের কালিয়া, ঝিঙে পোস্ত, সোনা মুগের ডাল, মুড়িঘণ্ট, চাটনি আর পায়েস হয়েছে। এতে হয়তো আপনার একটু কষ্টই হবে। তবু গরিবের বাড়িতে দুটি অন্নগ্রহণ না করলে ছাড়ছি না মশাই।

বাপ রে! বলেন কী? এত দূর এসে যদি ফিরে যাই তাহলে দাদা কী আর আমাকে আস্ত রাখবে! বিয়ে ভাঙতে হলে কুঞ্জবাবুর মুখের ওপরেই কথাটা কয়ে আসতে হবে। তাতে প্রাণ গেলেও কিছু নয়। আর ভোজ খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও আমার নয়। আমাকে এখনও রওনা হতে হচ্ছে।

বলছিলাম কী, উত্তেজিত না হয়ে আর একটু বসুন। বলছিলাম কী, বিয়েটা একেবারে ভেঙে দেওয়ার আগে একটু অগ্রপশ্চাৎ ভাবাও তো দরকার। হুট বলে বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাও ঠিক হবে না।

বলেন কী মশাই! এর পরও এই বিয়ে কেউ দেয়?

সেটা অবিশ্যি ঠিক। তবে কিনা কুঞ্জবিহারী বা বিপ্লববিহারীর বদনাম থাকলেও তাদের সংসারে কিন্তু অশান্তি নেই। কুঞ্জগুণ্ডার বউ কুসুম তো ভারি লক্ষ্মীমন্ত মহিলা। পুজোপাঠ, ব্রাহ্মণসেবা, দানধ্যান, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মেলা গুণ রয়েছে।

অ্যাঁ! এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘ।

যে আজ্ঞে। বিয়ে হলে আপনার ভাইঝি দুঃখে থাকবে না। কারণ, বিপ্লববিহারী বাইরে যেমনই হোক, আসলে ছেলে তেমন খারাপ নয়। ষণ্ডা হলেও সে ফিজিক্সে এম.এসসি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তার ওপর এম.বি.এ। স্বভাবও ভারি ভালো। ভারি বিনয়ী, ভারি ভদ্রলোক।

এ যে উলটো গাইছেন মশাই।

আহা যার যা গুণ তা তো বলতেই হবে। আর কুঞ্জবিহারীও ষণ্ডাগুন্ডা বটে, কিন্তু বৈষ্ণবও বটে। রোজ গেঁড়িমাটি দিয়ে রসকলি কাটে। ভিখিরিদের খাওয়ায়, জীবসেবা করে। গুণ কিছু কম নেই।

এ তো ফের উলটো চাপ মশাই।

উলটো চাপ নয় মশাই, মানুষের দোষের কথা শুধু বললেই তো হবে না। তার গুণের দিকটাও তো দেখা দরকার।

কুঞ্জগুন্ডার আরও গুণ আছে নাকি?

তা আর নেই! জীবনে কখনো এক পয়সা কাউকে ঠকায়নি। একটি কালো টাকাও তার তবিলে নেই। গরিবদুঃখীর জন্য প্রাণ দিয়ে করেন। গাঁয়ে চারখানা পুকুর কাটিয়েছেন, অনাথ আশ্রম খুলেছেন, স্বর্গত বাপের নামে অন্নসত্র দিয়েছেন, দুটো ইস্কুল তাঁর পয়সায় চলে। দানধ্যানের লেখাজোখা নেই মশাই।

তাহলে যে বলছিলেন লোক খুব খারাপ! খুন-টুন করেন।

আজ্ঞে তাও করে থাকতে পারেন। তবে কিনা খুনগুলো প্রমাণ হয়নি। অন্তত পুলিশের কাছে কোথাও রেকর্ড নেই। কেউ কেউ বলে আর কী।

না মশাই, আমার মাথা ঘুরছে। এবার রওনা না হলেই নয়।

আহা ব্যস্ত হবেন না। কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। স্বয়ং কুঞ্জবিহারীই এসে ভিতর-বাড়িতে বসে আছেন।

এসব কী বলছেন! কুঞ্জবিহারী এখানে এসে বসে আছেন, এর মানে কী?

আজ্ঞে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

কীরকম?

এ গাঁয়ের নাম মানিকপুর নয়।

তাহলে?

আপনি আতাগঞ্জ পেরিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে ফেলায় একটু ঘুরপথে ঝালাপুর হয়ে সোজা নফরগঞ্জেই এসে পড়েছেন যে। সোজা মানিকপুর হয়ে এলে রাস্তা দু-মাইল কম পড়ত।

তাহলে এ বাড়ি—?

আজ্ঞে এটাই কুঞ্জবিহারী দাসের বাড়ি। আমি হলুম গে তাঁর ভায়রাভাই নবকুমার হাজরা।

অ। তাই বলুন।

গয়ানাথের হাতি

একটা হাতি কেনার ভারি শখ ছিল গয়ানাথের। শখ সেই ছেলেবেলা থেকেই। গাঁয়ের মগনলালের হাতি ছিল। হাতিতে চেপে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত। হাতির ঠমক-চমকই আলাদা রকমের। ঘোড়া বা গাধাতেও চাপা যায় বটে, তবে তাতে তেমন সুখ হয় না। কেউ তাকিয়েও দেখে না তেমন। কিন্তু হাতি বেরোলে লোকে ভারি সম্মান করে পথ ছেড়ে দেয়।

তা গয়ানাথ হাতি কিনবে কী, তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। চাষবাস করে যা মেহনতটা হয় তার দশ ভাগের এক ভাগও ফসল হয়ে ঘরে ওঠে না। ধারকর্জ শোধ করতে করতেই মাঠের ফসল যখন ঘরে পৌঁছোয় তখন তার বারো আনাই খসে গেছে। তবে তা নিয়ে গয়ানাথের দুঃখও নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। গরিবের ঘরে জন্মেছে, গরিবের মতোই বেঁচে আছে, গরিবের মতোই জীবনটা যাবে। তারা গরিবেরই বংশ। তা বলে হাতির শখ তার যায়নি।

তার যে একটা হাতির শখ আছে সেটা অনেকেই জানে। ধনেশ বৈরাগী একদিন বলল, তা হাতি পুষলে খাওয়াবি কী বাপ? তোর নিজেরই পেট চলে না, আর হাতির পেট দেখেছিস তো, আস্ত একখানা ছোটোখাটো বাড়ি ঢুকে যায়।

গয়ানাথ বলে, তা আর জানি না। হাতির অ আ ক খ সব জানি। খোরাকির চিন্তা পরে, আগে হাতিটা তো হোক।

জপেশ্বর সাধুখাঁ হাটবারে গোরু বেচতে গোহাটায় গিয়েছিল। গয়াকে দেখে বলল, দূর বোকা, হাতি কেনা বেজায় লোকসান। আমার গোরুটা বরং কিনে রাখ, দোবেলা সাত সের দুধ দেবে। হাতির দুধ তো আর মানুষে খেতে পারে না, দোয়ানোও কঠিন কাজ।

গয়ানাথ হেসে বলল, দুধেল হাতি না হলেও চলবে গো জপেশ্বরদাদা।

তবে সবচেয়ে অন্যরকম কথা কয় গয়ানাথের বউ জবা। সে বড়ো ধার্মিক মহিলা। পুজো-আচ্চা, ব্রত-পার্বণ, উপবাস-কাপাস তার লেগেই আছে। সে বলে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি বাপু, হাতি নিয়ে আমার কাজ নেই। কবে হাতির পায়ের তলায় কার প্রাণ যায় ঠিক কী। হাতির চিন্তা ছেড়ে একটু ভগবানকে ডাকো তো। পরকালের কাজ হোক।

গয়ানাথ অবাক হয়ে বলে, ভগবানকে আবার ডাকাডাকির কী আছে। তাঁর সঙ্গে তো আমার নিত্যি দেখা হয়।

জবা ভয় খেয়ে বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে বলে, ওগো, ভগবানকে নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে নেই। তাতে পাপ হবে যে!

কিন্তু গয়ানাথের মুশকিল হল, কিছুদিন যাবৎ দুপুরবেলায় বাস্তবিকই বটগাছের তলায় ভগবান এসে থানা গেড়ে বসেন। বুড়োসুড়ো মানুষ। একটা চটের থলিতে করে হুঁকো, তামাক, টিকে নিয়ে আসেন। গাছতলায় একখানা আসন পেতে বসে গুড়ুক গুড়ুক তামাক খায়। মাঠে চাষের কাজ করতে করতে আড়ে আড়ে দেখে গয়ানাথ।

একদিন গিয়ে পেন্নাম করে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কে আজ্ঞে, কোথা থেকে আগমন হলেন?

বুড়োমানুষটা ভারি খুশিয়ান হাসি হেসে বলেন, আমি হলুম গে ভগবান, বুঝলি। হ্যাতান্যাতা লোক নই, স্বয়ং ভগবান।

বাপ রে! ডবল পেন্নাম হই কর্তা, আপনিই তাহলে তিনি?

তাহলে আর বলছি কী? তা কিছু জাদুটাদু দেখতে চাস নাকি?

জিব কেটে গয়ানাথ বলে, আরে না। আপনার মুখের কথাতে আমার পেত্যয় হয়েছে।

তা তুই কত বড়ো হাতি চাস বল তো!

গয়ানাথের মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, আজ্ঞে হাতিই যদি হয় তাহলে তো বড়ো হওয়াই ভালো, কি বলেন কর্তা?

তা বটে। হাতি ছোটোখাটো হলে আর সুখ কী? হাতি বলে টের পেতে হবে তো!

যে আজ্ঞে। তবে কিনা হাতির বড়ো দাম শুনেছি।

আচ্ছা, তুই মন দিয়ে চাষবাস কর তো। হাতির সময় হোক তখন ঠিক হাতি এসে হাজির হবে।

তা ভগবান প্রায়ই এসে গাছতলায় বসে থাকেন। তার মেহনত দেখেন। তার সুখ-দুঃখের কথাও শোনেন। আর গয়ানাথ মাঝে মাঝে ভগবানের তামাক সেজে দেয়, পা টিপে দেয়, বাতাসও করে।

বউ কথাটা বিশ্বাস করল না দেখে গয়ানাথ মাথা চুলকে বলল, তাই তো! ভগবানকে পেতে হলে অনেক পুণ্যিটুন্যি করতে হয় শুনেছি, তপস্যাও লাগে, কিন্তু আমার তো কিছুই নেই। তাহলে বোধহয় দিনের বেলাতেই আমি জাগাস্বপ্ন দেখি। ভগবান কী আর তুচ্ছ মানুষের কাছে ধরা দেন।

তা সেদিনই ভগবান বললেন, হ্যাঁ রে, তোর আমাকে এত সন্দেহ কেন? জাদুটাদু যদি দেখতে চাস সে অন্য কথা।

আজ্ঞে না কর্তা, বউ বলছিল কিনা, তাই একটু ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম।

বুড়োমানুষ তামাক খেয়ে ভারি আয়েশ করে গাছে ঠেস দিয়ে বসে ট্যাক থেকে একটা চোপসানো ন্যাতানো বেলুন বের করে বললেন, আজ তোর জন্য একটা হাতি নিয়ে এসেছি।

হাতি! কই হাতি?

এই যে দেখছিস না।

কর্তা, ও তো একটা বেলুন মনে হচ্ছে।

ওরকম মনে হয়, যা দেখছিস সবই তো আদতে বেলুন। এই যে ফুটো দেখছিস এটাতে কষে ফুঁ দে তো বাবা।

তা গয়ানাথ ফুঁ দিল। আর তাজ্জব কাণ্ড। যত ফুঁ দেয় ততই বেলুনটা ফুলে একটা হাতির আকার নিতে থাকে।

ভগবান বলেন, যত বড়ো হাতি চাস তত ফুঁ দিয়ে যা।

বেলুনটা যখন ফুলে বেশ একটা পেল্লায় হাতির সাইজ হল তখন একটা সুতো দিয়ে ফুটোটা বেঁধে দিয়ে বললেন, এই নে তোর হাতি।

হাতিটা দিব্যি দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাতে লাগল, দু-একবার হাতির ডাকও ছাড়ল।

গয়ানাথ তাজ্জব হয়ে বলে, বেলুন থেকে যে হাতি হয় তা আমার জানা ছিল না কর্তা। কিন্তু এই হাতিকে খাওয়াতেও তো হবে।

যখন একটা কুকুরছানার মতো ছোটো হয়ে গেছে তখন হাওয়া বন্ধ করে তোর পাতের একমুঠো ভাত দিস, তাতেই দেখবি হেউ-ঢেউ হয়ে যাবে। আর হাতি রাখার জন্য হাতিশালেরও দরকার নেই। বালিশের পাশে ঘুম পাড়িয়ে রাখবি। আর বড়ো হাতিতে তোর বউ ভয় পেলে ছোটো করে নিবি। তখন হাতি তোর ছেলেপুলের সঙ্গে দিব্যি খেলা করতে পারবে'খন।

মহা খুশি হয়ে সেদিন বিশাল হাতিতে চেপে বাড়ি ফিরল গয়ানাথ, সারা গাঁ ঝেঁটিয়ে হাতি দেখতে এল। গয়ানাথের বউয়ের গালে হাত। আর তার ছেলেপুলেদের সে কী আনন্দ!

গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বররা তুমুল মিটিং-এ বসে গেল, গয়ানাথের মতো এমন হাড়হাভাতে মানুষ হাতি কিনে ফেলল, এ তো সাংঘাতিক কথা! জিজ্ঞেস করলে সে হাতজোড় করে কেবল বলে, ভগবান দিয়েছেন, নইলে আমার সাধ্যি কী যে হাতি কিনব! কিন্তু মোড়লরা ভগবানের ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস করল না। বলল, এর মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে। গয়ানাথ নিশ্চয়ই গুপ্তধন পেয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যে গাঁয়ে জানাজানি হয়ে গেল যে, গয়ানাথের হাতির সংখ্যা মোটেই একটা নয়। একপাল এবং নানা সাইজের হাতি। সকালে গয়ানাথ তার বিশাল হাতিতে চেপে মাঠে চাষ করতে যায়। দুপুরে তাকে ভাত পৌঁছে দিতে তার বউ যখন যায় তখন যায় একটা ছোটোখাটো হাতিতে চেপে। আবার বিকেলে গয়ানাথের ছেলেপুলেরা যে হাতিটার সঙ্গে খেলা করে সেটা একটা গোরুর সাইজের। আর গাঁয়ের বিখ্যাত চোর নটবর দাস স্বচক্ষে দেখেছে, গয়ানাথের একটা কুকুরছানার মতো ছোটো হাতিও নাকি আছে। আর সেটা গয়ানাথের শিয়রের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমোয়।

মোড়ল-মাতব্বররা তাকে ডেকে বলল, দেখ, গুপ্তধন যদি পেয়েই থাকিস তাহলে তাতে আমাদেরও একটা পাওনা হয়। ভালো চাস তো আধাআধি বখরা করে নে। নইলে ভালো হবে না। যার এবেলা ভাত জুটলে ওবেলা জোটে না তার চার-পাঁচটা হাতি হয় কী করে? গয়ানাথ ফের হাত জোড় করে বলে, সবই ভগবানের ইচ্ছে।

তার বউ জবা একদিন বলল, ওগো, ভগবানের সঙ্গে যখন তোমার এতই ভাব তখন আর একটু চেয়েই দ্যাখো না! আমাদের তো এত অভাব। শুধু হাতি হলেই তো হবে না।

তা কী চাইব?

এই একখানা সাতমহলা বাড়ি, সাত ঘড়া মোহর, সাত কলসি হিরে-মুক্তো।

তা সে আর বেশি কথা কী? বলব'খন।

সেদিন ভগবান গাছতলায় বসেছেন। গয়ানাথ তাঁকে পাখার হাওয়া করতে করতে বলল, আজ্ঞে বাবা; একটা কথা ছিল।

ভগবান হুঁকোয় টান দেওয়া থামিয়ে বললেন, সাতমহলা বাড়ি, সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি হিরে-মুক্তো তো। তাতে হবে তো তোর? আরও কিছু লাগবে না?

মাথা চুলকে গয়ানাথ বলে, বউ তো আর কিছু বলেনি।

ভগবান মিটিমিটি হেসে বলেন, সাতমহলার জায়গায় চৌদ্দ মহলা বাড়ি হলে তো আরও ভালো, চৌদ্দর জায়গায় চৌষট্টি মহল হলে আরও আনন্দ—কী বলিস? আর সাত ঘড়াই বা কেন, ভগবান তো তোকে সাত হাজার ঘড়া মোহর দিতে পারে, আর হিরে-মুক্তোও সেই পরিমাণ।

গয়ানাথ শুকনো মুখে বলে, আমি গরিব মানুষ, অত কী সামলাতে পারব?

আহা, সামলানোর জন্য মাইনে দিয়ে লোক রাখবি। তখন কী আর তুই আজকের গয়ানাথ থাকবি? কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠবি যে, সমাজ তোকে দু-বেলা সেলাম ঠুকবে। ভালো হবে না?

গয়ানাথ খুব চিন্তিত মুখে বলে, শুনে ভালো লাগছে না বাবা।

তাহলে ভালো করে ভেবে দ্যাখ গিয়ে। বউয়ের সঙ্গেও পরামর্শ করিস। যা চাস তাই পাবি। তবে—

তবে কী বাবা?

এই গাছতলায় রোজ দুপুরে যে এসে বসতুম সেটা আর হবে না। তোকে দিয়ে থুয়ে, একটা হিল্লে করে দিয়ে আমাকে এবার পাততাড়ি গুটোতে হবে।

শুনে গয়ানাথের বুকটা কেমন করে উঠল। বলল, বাবা, তুমি না এলে যে চারদিক বড়ো ফাঁকা হয়ে যাবে।

দুর বোকা! আমি না এলেই কী! তোর কত লোকলশকর হবে, কত নামডাক হবে। কত খাতির হবে তোর!

রাত্রিবেলা বউয়ের কাছে সবটাই খুলে বলল গয়ানাথ। জবা বলল, আহা, ভগবানবাবা এসে গাছতলায় না-ই বা বসলেন। আমি তাঁর জন্য সোনার সিংহাসন বানিয়ে দেব। রোজ পোলাও-পায়েস ভোগ দেব, ঠাকুরের সোনার গড়গড়া হবে, তুমি বরং ওটাই চেয়ে নাও। আর রোদে-জলে ভগবানের গাছতলায় বসে কষ্ট করার দরকারই বা কী!

কথাটা কানে যেন ভালো শোনাল না গয়ানাথের। তার বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাও কম। সে শুধু বোঝে, বুড়োমানুষটা এসে ওই যে গাছতলায় বসে থাকেন ওতেই তার বুক ভরে যায়।

পরদিন হাতির হাওয়া খুলে দিয়ে বেলুনটাকে ট্যাকে গুঁজে মাঠে গেল গয়ানাথ। তারপর দুপুরে ভগবান এসে গাছতলায় বসতেই তাড়াতাড়ি গিয়ে তামাক সেজে হাতে হুঁকোটা ধরিয়ে দিয়ে একটা প্রণাম করে উঠল। ট্যাক থেকে ন্যাতানো বেলুনটা বের করে বলল, এই নাও বাবা, তোমার জিনিস, আমার হাতির শখ মিটে গেছে।

বলিস কী?

আজ্ঞে, দুনিয়ার সব জিনিসই যে ফোলানো জিনিস, ফোঁপড়া, তা আমি টের পেয়েছি।

তা কী ঠিক করলি?

ওসব মোহর-টোহরে আমার দরকার নেই। আধপেটা খেয়ে থাকব, তবু রোজ তোমাকে গাছতলায় এসে বসে থাকতে হবে।

ভালো করে ভেবে দ্যাখ।

ভাবতে আমার বয়েই গেছে। অত বুদ্ধিও নেই। আমার ভাবনা তুমিই ভাবো।

ভগবান গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতে খেতে খুব হাসলেন। যেন কথাটা শুনে ভারি আহ্লাদ হয়েছে তাঁর।

রুণু

লালটু বৈরাগী ছিল জমিদারের মাহুত। বেশি বয়স নয় তার। বাইশ-তেইশ হবে, আর যে হাতিটায় সে মাহুত হয়ে চাপত সেটা ছিল বিশাল আকারের। রাস্তা দিয়ে যখন চলত মনে হত একটা পাহাড় হেঁটে যাচ্ছে।

বারবাড়ির মাঠে আমরা খেলতাম, খেলুড়িদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু ছিল রুণু নামের একটা ছেলে, তার মতো বাঁদর ছেলে কমই হয়। ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়াগুলিকে গাড়োয়ানরা ওই মাঠে ছেড়ে দিয়ে যেত ঘাস খাওয়ার জন্য। রুণু নারকেলের দড়ি দিয়ে লাগাম বানিয়ে সেই ঘোড়াগুলোর পিঠে চড়ে উত্যক্ত করে মারত। তার পকেটে সবসময়ে থাকত গুলতি। কাকে যে টিপ করবে তার ঠিক নেই, ফকেরুদ্দিনকে এমন গুলতি মেরেছিল যে দম বন্ধ হয়ে সে চোখ উলটে ফেলেছিল। যার ওপর রাগ হত তাকে বিচুটি গাছ তুলে এনে তাড়া করত। স্কুলের ক্লাসে, পাড়ায় এবং বেপাড়ায় মারপিট লেগেই থাকত তার। প্রতিদিন তার শরীরে নতুন নতুন কাটা বা ফোলা বা কালশিটের দেখা পাওয়া যেত। যেমন মারত তেমনি মার খেতও প্রচুর।

সেই রুণু একদিন দৌড়ে গিয়ে জমিদারের হাতির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। লালটু রাগ করে বলল, তোর আক্কেল নেই! হাতির পায়ের তলায় গেলে কী হত জানিস?

তা তুমি আছ কী করতে? হাতি সামলাতে পারো না?

না পারলে এতক্ষণে কী হত জানিস?

খুব জানি। একটু হাতিতে চড়াও না লালটুদা।

সে উপায় নেই। এখন যাচ্ছি হাতি চান করাতে, দেরি হয়ে গেলে মুশকিল।

একটু চড়াও না লালটুদাদা, ও লালটুদাদা গো, পায়ে পড়ি।

উরেব্বাস রে! বামুনের ছেলে হয়ে ওকথা বলতে আছে? আমার যে পাপ হবে রে! আচ্ছা, হাতিতে বসাচ্ছি, সাবধানে চড়বি।

হাওদা নেই, বস্তা-টস্তা বাঁধা নেই, হাতির খোলা পিঠে চড়া কিন্তু ভারি শক্ত ব্যাপার, কারণ হাতির বেজায় চওড়া পিঠে দু-ধারে পা ঝুলিয়ে বসবার উপায় নেই, হাওদা না থাকায় ধরার মতোও কিছু থাকে না বলে সবসময়েই পড়ে যাওয়ার ভয়, কারণ হাতি চলে হেলে-দুলে, আর একটা অসুবিধে হল হাতির গায়ের লোম, যেগুলো ছুঁচের মতো গায়ে বেঁধে।

কিন্তু হাতি চড়ার আনন্দে ওসব অসুবিধে আর কী গায়ে মাখে। হাতি বসতেই হইচই করে ছেলেপুলেরা হাঁচড়ে-মাচড়ে উঠে পড়ল তার পিঠে, হাতি উঠে দাঁড়ানোর সময় সে যেন ভূমিকম্পের অবস্থা, সওয়ারিরা পড়ে যায় আর কী, উপুড় হয়ে হাতির লোম খামচে ধরে কোনোরকমে সামাল দেওয়া।

হেলেদুলে যখন হাতি চলছে তখন মনে হচ্ছে আমাদের চারদিকটাই দোল খাচ্ছে, সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

পড়া পারত না বলে স্কুলে প্রথম পিরিয়ড থেকেই রুণুকে নানারকম শাস্তি পেতে দেখতুম, হয় বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো ক্লাসের বাইরে নিলডাউন, আর নাহলে নানুবাবুর ক্লাসে হাত পেতে বেত খাচ্ছে। কিন্তু ওসব ছিল তার গা-সওয়া। একবার ক্লাসে মারপিট করায় মনিটর তার নাম লিখেছিল লিস্টিতে। প্রাণেশবাবু ক্লাসে এসেই তার চুল ধরে মাথাটা নামিয়ে পিঠে বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পড় মারলেন। সেই শব্দে ক্লাস কেঁপে উঠল। রুণু নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে কানে আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বলল, মেরে ভালোই করলেন স্যার। সকালে নদীতে চান করতে গিয়ে কানে জল ঢুকে গিয়েছিল, থাপ্পড়ের চোটে সেটা বেরিয়ে গেছে। আর যাবে কোথায়, এই কথা শুনে প্রাণেশবাবুর সে কী মার রুণুকে!

হ্যাঁ, ওই সাঁতার, স্কুলে যাওয়ার অনেক আগেই রুণু গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে পড়ত। জলের নেশা ছিল তার, অন্তত দু-ঘণ্টা ধরে সে সাঁতরাত। ডুবত, উঠত, চিতসাঁতার, ডুবসাঁতার সবকিছুতেই ওস্তাদ ছিল সে, অতক্ষণ জলে থাকায় গা সাদা হয়ে যেত তার। তারপর দাদু বা দাদা কেউ এসে তাকে হাত ধরে টেনে তুলে বাড়ি নিয়ে যেত।

তাকে যিনি পড়াতে আসতেন সেই নীতিন মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে বলতেন, তোমার মাথা তো খারাপ নয়, তবে পরীক্ষায় কম নম্বর পাও কেন?

আমার বেশি লিখতে ভালো লাগে না।

বেশি লেখার তো দরকার নেই, কারেক্ট লিখলেই হল।

আমার ভালো ছেলে হতে ইচ্ছে করে না।

কী মুশকিল! তুমি কি ইচ্ছে করে ভুল লিখে দিয়ে আসো?

রুণু চুপ।

নিরীহ নীতিনবাবু বলেন, আমার কাছে যখন পড়া দিচ্ছ তখন ভুল হচ্ছে না, কিন্তু ইস্কুলে গেলেই ভুল! এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

মা সব শুনে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, তুই এমন কেন করিস বাবা? তোকে লোকে ভুল বুঝলে যে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

রুণু মাকে জড়িয়ে ধরে গায়ে মুখ গুঁজে বলে, আমি তো খারাপ ছেলে মা!

শোনো কথা। কে তোকে খারাপ বলে রে? দুষ্টু? সে তো অনেকেই ছেলেবেলায় দুষ্টু থাকে। দুষ্টু তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

সেবারে রুণু পরীক্ষায় ফার্স্ট হল না বটে, কিন্তু সেকেন্ড হল। স্কুলের সবাই অবাক, যে ছেলে সারা বছর পড়া পারে না, সে কী করে এক ঝটকায় এত নম্বর তুলে ফেলল।!

নাগমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই টুকেছে।

হেডস্যার এমদাদ আলি বিশ্বাস রাশভারি মানুষ। মাথা নেড়ে বললেন, টুকলে পাশ নম্বর হয়তো ওঠে, কিন্তু স্ট্যান্ড করা যায় না। কারণ টোকা দেখে কপি করতে অনেক সময় লাগে, টুকলিবাজরা কখনো ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় না।

রুণুর একটু গুণও ছিল। সে কখনো কোনো ফড়িং-এর ডানা ছিঁড়ে দেয়নি, পাখি বা কুকুরকে ঢিল মারেনি, কানা-খোঁড়া কাউকে কখনো খ্যাপায়নি, সে কুকুর পোষে, তার একটা ডানা-কাটা বুলবুলি পাখি আছে। পাখিটাকে কেউ ডানা কেটে ছেড়ে দিয়েছিল, উড়তে পারছিল না। তাকে যত্ন করে সে খাঁচায় রেখেছে। আকাশের দিকে তাকালে তার মন খারাপ হয়ে যায়। সে জেনেছে আকাশের নীল ছাদটা আসলে কোনো ছাদ নয়, আসলে আকাশের কোনো

সীমানা নেই। এত বড়ো এত বিশাল যে ভাবতে গেলেই তার মাথা ঝিমঝিম করে, মনে হয়, বিশ্বজগৎটা একটু ছোটো হলে বড়ো ভালো হত। কেন যে হল না!

নদী আর দাদু, রুণুর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি হল দাদু। দাদুর কাছে রোজ রুণুর নামে কত নালিশ জমা হত। কার আম, কার জাম, কার লিচু বা পেয়ারা পেড়ে এনেছে। কার টিনের চালে ঢিল মেরেছে, কার ছেলেকে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়ে এসেছে, দাদু গম্ভীর হয়ে শোনেন আর বলেন 'হুঁ'। ওই 'হুঁ-তেই সব শাসন থেমে থাকে। সেই আততায়ী নাতিকে নিয়েই দুপুরে এক পাতে খেতে বসেন তিনি। পরম স্নেহে নিজে হাত গুটিয়ে নাতিকে ইচ্ছেমতো পাত লণ্ডভণ্ড করতে দেন।

আর বহমান ওই নদী। নদীর কোনো নীরবতা নেই। চির প্রগলভ নদীর ভাষা বুঝবার কত চেষ্টা করেছে সে, পারেনি। কিন্তু তবু কখনো-সখনো খেলা ফেলে, দুষ্টুমি ভুলে, খিদে চেপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদাস হয়ে বসে থেকেছে নদীর ধারে। যদি নদীর কথা বোঝা যায়। কত দূর থেকে কত গল্প বয়ে আনে নদী, কত শহরের প্রতিবিম্ব তার বুকে লুকিয়ে থাকে, কত মানুষের স্পর্শ।

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে রেলগাড়িতে চেপে একবার কোথাও যাচ্ছে রুণু। তখন ছোটো, তার মন ভালো করার জন্য জ্যাঠামশাই একটা রসগোল্লা কিনে দিয়েছেন তার হাতে। রসগোল্লার মতো কিছুই হয় না। পেটুক রুণু হাঁ করে সবে কামড় বসাতে যাবে, ঠিক সেইসময়ে আকাশ থেকে লটপট করতে করতে একটা মস্ত চিল এক ঝটকা মেরে রসগোল্লাটা কেড়ে নিয়ে গেল। আর তার ধারালো নখের আঁচড়ে ডান হাতের একটা আঙুল কেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল। জ্যাঠামশাই অপ্রস্তুত, রুমাল বেঁধে হাতের রক্ত সামাল দিচ্ছেন।

রুণু কাঁদেনি, খুব অবাক হয়েছিল। চিলের দুষ্টুমির কথা সে জানে, আগেও কতবার দোকান থেকে কচুরি বা জিলিপি আনার সময় চ্যাঙারি কেড়ে নিয়ে গেছে। নতুন তো নয়, কিন্তু এই যে রসগোল্লাটা হাতে এই ছিল—এই নেই হয়ে গেল। এই বিস্ময়টাই তার যেতে চায় না। ডান হাতের সেই হঠাৎ শূন্যতা সে অনেকদিন ধরে টের পেত।

কেনারাম

গিরিজাবাবু নাকি?

যে আজ্ঞে। আমি গিরিজা পুততুণ্ডই বটে। তা আপনি?

আমাকে চিনবেন না। আমার নাম করালী ঘোষ। ভীমপুরে সাত পুরুষের বাস।

অ, তা ভালো কথা। এখানে কী কাজে আগমন?

কাজে তেমন কিছু নয়। গোরু খুঁজতে বেরিয়েছি।

গোরু খুঁজতে এত দূর! ভীমপুর তো না হোক চোদ্দো-পনেরো মাইল দূর হবে। বাড়ির আশেপাশেই খুঁজে দেখুন, হারানো গোরু পেয়ে যাবেন।

গোরু হারালে তো হারানো গোরুর কথা ওঠে মশাই। আমার যে গোরু হারায়নি।

তা হলে যে বললেন, গোরু খুঁজতে বেরিয়েছেন।

তা অবশ্যি ঠিক। গোরু খুঁজতে বেরোনো বটে। তবে কিনা সেটা হারানো গোরু নয়।

তবে কি গোরু কিনতে বেরিয়েছেন নাকি?

আজ্ঞে না। আমাদের গোয়ালে বারোটা গোরু। গোশালায় আর তেমন জায়গাও নেই কিনা। গোরু খোঁজা আমার একটা নেশা বলতে পারেন।

গোরু খোঁজার নেশা। এরকম তো কখনো শুনিনি মশাই। ওরকম নেশা আবার হয় নাকি?

ঠিকই বলেছেন। গোরু খোঁজার অভ্যাসকে ঠিক নেশাও বলা যায় না বটে।

ভালো কথা, আপনি দেখছি আমার নাম জানেন। কিন্তু আমি তো তেমন কেষ্টুবিষ্টু মানুষ নই! নামটা জানলেন কী করে?

ওই পুবের মাঠে একটা বেশ নধরকান্তি সাদা রঙের গোরু দেখে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, গোরুটা কার।

তা একজন নস্করবাবু বললেন, গোরুটা গিরিজাবাবুর। সঙ্গে এও বললেন, চামার মশাই, চামার। আটটা গোরু দু-বেলা না হোক বিশ কিলো দুধ দিচ্ছে, তবু পঁচিশ টাকার এক পয়সা কমে দুধ বিক্রি করবে না।

বটে! নস্করের এতবড়ো সাহস!

চেনেন নাকি নস্করবাবুকে?

কে না চেনে নচ্ছারটাকে? মোটে আধসের করে দুধ নিত, তাও তিন মাসের টাকা বাকি। ছ-মাস ঘুরে তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তবে চার কিস্তিতে টাকা আদায় করা গেছে। ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

তা হতে পারে। তবে কিনা নস্করবাবু আমাকে বিশুর চায়ের দোকানে এক ভাঁড় চা খাইয়েছেন। সঙ্গে দুটো কুকিস বিস্কুট।

তাতে কী মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? চা আর বিস্কুটেই কাত হয়ে পড়বেন না যেন। কেনারাম নস্কর অতি ধুরন্ধর লোক। মতলবের বাইরে এক পয়সা খরচ করার পাত্র নয়। সেবার পাত্রপক্ষ ওর মেয়েকে দেখতে এসে ট্যারা বলেছিল বলে মিষ্টির প্লেট তুলে নিয়ে গিয়েছিল সামনে থেকে।

এঃ, এ তো মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। নাঃ, এ কাজটা কেনারাম নস্কর মোটেই ভালো করেননি। তা কেনারামবাবুর মেয়ে সত্যিই ট্যারা নাকি?

ট্যারা বলতে ট্যারা! বেজায় ট্যারা মশাই। তার ওপর বেঁটে, কালো, দাঁত উঁচু। ওই কেনারামের মতোই চেহারা।

বলেন কী মশাই! তা হলে কী আমি দিনে-দুপুরে ভুল দেখলুম! কেনারাম নস্করকে তো আমার দিব্যি ফরসা বলেই মনে হল! আর বেঁটে তো নন। দিব্যি লম্বা চেহারা! ট্যারা কিনা সেটা অবিশ্যি ভালো করে লক্ষ করিনি। নয় বলেই যেন মনে হচ্ছে।

তা সে যাই হোক, কেনারাম মানুষ মোটেই ভালো নয়। ওর সঙ্গে আপনি মোটেই মেলামেশা করতে যবেন না যেন! এই গাঁয়ে তো একঘরে।

গোরু খুঁজতে বেরিয়ে কী মুশকিলে পড়া গেল মশাই।

কেন, মুশকিলটা কীসের?

প্রথম মুশকিল হল, মানুষের খিদে-তেষ্টা বলে একটা ব্যাপার আছে। তারপর ধরুন, পেটপুরে খেলে দুপুরে আমার বড্ড ঘুম পায়, তার ওপর নরম বিছানা না হলে আমার মোটে ঘুমই আসে না। তা কেনারামবাবু পই-পই করে বলে দিয়েছেন আজ মধ্যাহ্নভোজনটা যেন আমি তাঁর বাড়িতেই সারি। কিন্তু আপনার কথা শুনে তো বড়ো দমে গেলুম মশাই। কেনারাম নস্কর যে এত খারাপ লোক তা জানা ছিল না আমার। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজটা কী তা হলে আজ উহ্য রাখতে হবে!

গিরিজাবাবু ফুঁসে উঠে বললেন, তার মানে! উহ্য রাখলেই হল? গাঁয়ের একটা মান-ইজ্জত নেই? বলি কেনারাম কী-ই বা খাওয়াত আপনাকে শুনি? মোটা চালের ভাত, পাতলা জলের মতো ডাল, পুঁটি মাছের ঝোল আর বড়োজোর একটুকরো লেবু।

এত খারাপ?

তবে আর বলছি কী। চলুন, আমার বাড়িতে চলুন। সরু চালের ভাত, গাওয়া ঘি, বেগুন ভাজা, সোনা মুগের ডাল, মাছের মুড়ো, পাঁঠার মাংস, একবাটি পায়েস, চলবে তো?

কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবে। তবে কিনা ডালের পাতে একটু ভাজাভুজি না হলে আমার চলে না।

খুব-খুব। গাছে বকফুল-কুমড়ো ফুল আছে। তাই দিয়ে বড়া। তারপর পটল আছে, কুমড়ো আছে, আর চাই কী আপনার? আসুন তো মশাই। লজ্জা করবেন না।

আহা, এত উতলা হবেন না। বেলাও বেশি হয়নি। মাত্র পৌনে বারোটা বাজে। মহাজনেরা কী বলেছেন জানেন তো! ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

আহা, কান জুড়িয়ে গেল। মহাপুরুষরা যে কত ভালো ভালো কথা বলেন তার হিসেব নেই। তা করালীবাবু, কথাটা উঠল কেন?

না, ভাবছিলাম কেনারাম নস্করের মতো একজন কেষ্টবিষ্টু মানুষকে চটানোটা উচিত হবে কিনা।

কেষ্টবিষ্টু! কেনারাম আবার কেষ্টবিষ্টু হল কবে?

এই যে কানাঘুষো শুনলুম তাঁর নাকি তিনতলা বাড়ি, বিরাট আমবাগান, তিনশো নারকেল গাছ, দুশো বিঘে ধানী জমি আর হিমঘর আছে।

ফোঁপরা মশাই ফোঁপরা। বেলুন দ্যাখেননি? লাল-নীল-সবুজ, দিব্যি নিটোল আকৃতি। হাওয়া বের করে দিলেই একটুখানি। কেনারামও তাই। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন গে, সব মর্টগেজে বাঁধা আছে।

আপনি তো মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। কেনারামবাবুর ছেলে সাতকড়ির সঙ্গে যে আমার মেয়ের বিয়েরও একটা প্রস্তাব আজ সকালে দিয়ে বসলেন উনি!

বলেন কী? ওই গিদধরের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন? মাথা খারাপ হল নাকি আপনার? তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দিন তাও ভালো।

তবে তো চিন্তার কথা হল মশাই!

তা তো বটেই। ভালো করে চিন্তা করুন। তবে বলে রাখি, মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে আমারও উপযুক্ত পুত্র আছে। বি.এ পাশ, স্কুলের মাস্টার, দিব্যি কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারা।

সে তো বুঝলুম। কিন্তু আরও একটু কথা আছে।

কী বলুন তো।

কেনারামবাবু বললেন, এক পয়সা পণ নেবেন না, দানসামগ্রী দিতে হবে না, শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দিলেই চলবে। শুনে তো আমার চোখে জল এল। এই কলিযুগেও এমন মানুষ আছে।

আছে মশাই আছে। কুমিরের চোখের জলকে বিশ্বাস করবেন না। কেনারাম নিশ্চয়ই অন্য মতলব এঁটে রেখেছে। আর পণের কথা বলছেন? পণকে তো আমি গো-মাংস বলে মনে করি। আর দানসামগ্রী! ছিঃ, ওসব কী ভদ্রলোকেরা নেয়?

গিরিজাবাবু আপনি আমাকে ছলনা করছেন না তো!

আরে না মশাই, না। কথা একেবারে পাকা। নড়চড় নেই। শুধু ওই কেনারামটার সঙ্গে মেলামেশা করবেন না যেন।

আজ্ঞে, সে আর বলতে! চলুন মধ্যাহ্নভোজটা সেরেই ফেলি। বেলা অনেক হয়েছে।

বশীকরণ

বিষ্ণুপদর বাড়িতে পাখির খাঁচাও নেই, দাঁড়ও নেই। সোজা কথা হল বিষ্ণুপদ পাখি পোষে না, তবু তার বাড়িতেই পাখির আনাগোনা সবচেয়ে বেশি। সারা দিনমান তার বাড়িতে শালিক, চড়াই, কাক থেকে শুরু করে ময়না, টিয়া, ছাতারে, বুলবুলি, কাঠঠোকরা, বউ কথা কও। পাখির ভিড় দেখলে তাজ্জব লেগে যায়। বাড়ির ছাদে খোপে-খোপে অন্তত শতখানেক পায়রার বসত। সারাদিন পাখিদের কিচির-মিচিরের চোটে কান ঝালাপালা।

বিষ্ণুপদ গরিব মানুষ। ভারী দীনদরিদ্র পৈতৃক বাড়িতে সে থাকে। বাড়ি বলতে দুটো টিনের চালের ঘর আর বাঁশের বেড়া। উঠোনে একখানা ত্রিপল টাঙিয়ে তার পাঠশালা বসে। ওই ছাত্র পড়িয়েই তার যা কিছু সামান্য রোজগারপাতি হয়। ভারী কষ্টেই সংসার চলে তার। তার বউ কাত্যায়নী ভারী মুখরা আর দজ্জাল মহিলা। বিষ্ণুপদ তেমন রোজগেরে নয় বলে সারাদিন মুখ করে। বিষ্ণুপদ তেমন কথা-টথা কইতে জানে না, ঝগড়াঝাঁটি তার আসেই না। পাঠশালার সময়টুকু বাদ দিয়ে সে বাকি সময়টা পাখিদের সঙ্গেই কাটায়। দানাপানি দেয়, ঘুরে-ঘুরে পাখিদের খোঁজখবর নেয়। পাখিরাও তাকে বিলক্ষণ চেনে। উড়ে এসে তার ঘাড়ে, মাথায় বসে, হাত থেকে দানা খায়, পায়ের কাছেও ঘুরঘুর করে। মোটকথা বিষ্ণুপদকে পাখিরাও ভারী ভালোবাসে।

কাত্যায়নী যতই অপছন্দ করুক, গাঁয়ের লোক কিন্তু বিষ্ণুকে ভগবানের অংশ বলেই মনে করে। বনের পাখি যার কাছে বশ মেনেছে, সে যে সোজা লোক নয় তা লোকে বোঝে। তাই গরিব হলেও গাঁয়ে বিষ্ণুর একটু খাতির আছে।

তবে শচীন ঘোষ বিষ্ণুপদকে হাড়ে-হাড়ে অপছন্দ করে। শচীনের বড় ব্যবসা আছে, মেলা টাকা, আশপাশের পাঁচটা গাঁয়ে তার মতো পয়সাওয়ালা লোক আর নেই। তার প্রতিপত্তিও খুব। যত স্কুল আর কলেজের গভর্নিং বডির সে চেয়ারম্যান বা মেম্বার, পঞ্চায়েতের মাথা, সব সভাসমিতির একচেটিয়া সভাপতি। তার ভাষণ শুনে লোকে খুব হাততালি দেয়। কিন্তু সেই শচীন ঘোষেরও বিষ্ণুপদর মতো এলেম নেই। পাখি দূরে থাক, তার নিজের পোষা কুকুরটাও তার চেয়ে বনমালীর বেশি ভক্ত। আর বনমালী হল কিনা শচীনের চাকর। পাখিগুলোর কাণ্ডজ্ঞান নেই। কী দেখে যে ওরা বিষ্ণুপদর অত ন্যাওটা হল কে জানে!

তা শচীন ঘোষও আজকাল সকালে উঠে ভোর-ভোর কাকপক্ষীদের বাসি রুটি, মাছ-মাংসের টুকরো, পাখির দানা উঠোনে ছড়িয়ে খেতে দেয়, আর তা পাখিরা নেচে নেচে মহানন্দে খায়ও। তা বলে তারা এসে কিন্তু শচীনের কাঁধেও বসে না, পায়ের কাছে ঘুরঘুরও করে না।

দুঃখের কথাটা শচীন একদিন তার পেয়ারের চাকর বনমালীকে বলেও ফেলেছিল। শুনে বনমালী বলল, কর্তামশাই, ওসব হল মন্তর-তন্তরের ব্যাপার। বিষ্ণুপদকে ন্যাংটো বয়স থেকে দেখছি, মোটেই কোনও অবতার-টবতার নয়। গোপীবাবার কৃপায় যত ওর জারিজুরি।

গোপীবাবাটা আবার কে?

ফিরোজপুরের ডাকসাইটে তান্ত্রিক। তার গায়ে তো গোখরো, কেউটে দিনরাত বেয়ে বেয়ে উঠছে আর নামছে, বনের বাঘ এসে কমণ্ডলুর জল খেয়ে যায়, খ্যাপা ষাঁড় তেড়ে এসে গোপীবাবার সামনে হেঁটমুন্ডু হয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে। মহাপুরুষ বললে বলতে হয় গোপী তান্ত্রিককে। বিষ্ণুপদ তো একসময় দিনরাত গোপীবাবার পদসেবা করত। গাঁজা সেজে দিত, জটার জট ছাড়াত, বিভূতি মাখাত।

শচীন সোৎসাহে বলে উঠল, বটে। তাহলে তো গোপীবাবার কাছেই যেতে হয়। লোকটার তো এলেম আছে দেখছি।

আজ্ঞে, এলেম বলবেন না, ওতে পাপ হয়। উনি সিদ্ধপুরুষ।

পরের শনিবার সন্ধেবেলাতেই ফিরোজপুরের শ্মশানের ধারে জঙ্গলে একটা বটগাছের তলায় গোপীবাবার আস্তানায় হাজির হয়ে গেল শচীন। সঙ্গে তার পেয়ারের চাকর বনমালী।

গোপীবাবা বুড়োমানুষ। পঞ্চমুণ্ডির বেদীতে বসে সামনে ধুনি জ্বেলে ঘ্যাঁষ-ঘ্যাঁষ করে দাড়ি চুলকোচ্ছিল। চেলা-চামুণ্ডাও বিশেষ কেউ নেই। শুধু একটা রোগামতো লোক সামনে বসে গাঁজা সাজছে।

তাদের দেখে গোপীবাবা খ্যানখ্যানে গলায় হাঁক ছাড়ল, কে র‍্যা?

বনমালী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে বলল, আজ্ঞে, ইনি হচ্ছেন গিয়ে শচীন ঘোষ। মস্ত মহাজন। এঁকে একটু কৃপা করতে হবে বাবা।

গোপীবাবা খ্যাঁক করে উঠল, কৃপা! কৃপা কি মাগনা নাকি?

আজ্ঞে না বাবা, শচীনবাবু মহাজন লোক।

শচীন গোপীবাবার গায়ে সাপখোপ দেখতে পাচ্ছিল না, জন্তু-জানোয়ারও নেই। একটু অবাক হয়ে বলে উঠল, ওরে বনমালী! গোপীবাবার গায়ে গোখরো সাপগুলো দেখছি না যে!

কথাটা কানে যেতেই গোপীবাবা তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে রক্তাম্বর ঝাড়তে ঝাড়তে বিকটগলায় চেঁচাতে লাগল, সাপ! কোথায় সাপ, অ্যাঁ? ওরে, কোথায় সাপ? কামড়ে দেবে যে রে....!

চেঁচাতে চেঁচাতে বুড়ো শরীরে গোপীবাবা এমন তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাগল যে, না দেখলে বিশ্বাসই হত না কোনও খুনখুনে বুড়ো অমন লাফঝাঁপ দিতে পারে।

চেলাটাও গাঁজার কলকে ফেলে একটা গাছে উঠে পড়ে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল, মেরে ফেলল রে! মেরে ফেলল রে.....।

শচীন রোষকষায়িত লোচনে বনমালীর দিকে চেয়ে বলে, এই তোর গোপীবাবার মহিমা? ছ্যাঃ-ছ্যাঃ! এ নাকি বিষ্ণুপদকে পক্ষীবিদ্যে শিখিয়েছে?

বিষ্ণুপদর নাম শুনে গোপীবাবা লাফঝাঁপ থামিয়ে আঁশটে মুখে বলল, কার কথা বলছ হে? অ্যাঁ! বিষ্ণুপদ নাকি? তাকে কত করে বললুম, ওরে তোকে হাজারটা টাকা দেব, আমাকে একটু পাখি বশ করার বিদ্যে শিখিয়ে দে। বুড়ো বয়সে একটু করে খাই। তা সে কী বলল জানো? বলল, ও বিদ্যে টাকা দিয়ে শেখা যায় না বাবা, ভালোবাসা লাগে। শোনো কথা! টাকা না হয় জোগাড় করা গেল, কিন্তু ভালোবাসা পাই কোথা বলো তো!

হতাশ হয়ে শচীন ফিরে এল। কিন্তু তার বাসনার কথা অনেকেই জানে। নবীন দাস এসে একদিন দুপুরে বলল, ও হে, বিষ্ণুপদর কথা ভাবছ তো! কিছু নয়। এই তো মাত্র দু-ক্রোশ দূরে রাঙামাটি গ্রাম। সেখানে রমেশ সামুই হল বশীকরণ বিদ্যের ওস্তাদ। পশুপাখি থেকে মানুষ যাকে বশ করতে চাও হেসে খেলে পারবে। বিষ্ণুপদ তো ওর কাছেই শিখেছে।

শচীন একদিন দুপুরবেলা গাড়ি হাঁকিয়ে রাঙামাটি গাঁয়ে বশীকরণবাজ রমেশ সামুইয়ের বাড়িতে হাজির হল। বাইরে সাইনবোর্ডও রয়েছে, এইখানে জ্যোতিষী, বশীকরণ, মারণ, উচাটন, বাণমারা, সম্মোহনবিদ্যা ইত্যাদি সযত্নে শেখানো হয়। দক্ষিণা নামমাত্র। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। তন্ত্রসিদ্ধ, কামাখ্যাফেরত, জ্যোতিষার্ণব শ্রীরমেশ সামুই।

একতলা জীর্ণ চেহারার বাড়িটা দেখে মোটেই ভক্তি হল না শচীনের। বাইরের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়া দিল সে। কিন্তু শুনতে পেল ভিতরে এক প্রবল নারীকণ্ঠই কাকে যেন চিৎকার করে বাপান্ত করছে, ভণ্ড কোথাকার! জোচ্চোর! লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাস! তোর গলায় দড়ি জোটে না কেন রে? কত পুয়ে-পুয়ে দু-চারটাকা করে জমিয়ে ঘট ভরেছিলুম তার ওপরেও তোর শকুনের নজর! মর-মর....।

বাসন আছড়ে ফেলার ঝনঝন শব্দ শুনে আঁতকে উঠল শচীন। পিছন থেকে কে যেন বলল, কাকে খুঁজছেন আজ্ঞে?

শচীন তাকিয়ে দেখল, একটা রোগা মতো লোক ফোকলা মুখে একটু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শচীন বলে, এই রমেশবাবুর কাছেই এসেছিলাম আর কি।

তবে ঘণ্টাটাক দাঁড়াতে হবে। ওদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হচ্ছে কিনা। একবার লাগলে ঘণ্টাখানেকের আগে থামে না।

কিন্তু এই যে শুনলুম উনি বশীকরণের ওস্তাদ?

সে আমরাও শুনেছি। কিন্তু কেউ কখনও নিজের বউকে বশীকরণ করতে পেরেছে কি?

উনি তো বাণ-টানও মারেন দেখছি। তাতে কাজ হয়?

তা কি আর হয় না? নিশ্চয়ই হয়। তবে একটু সময় লাগে, এই যা।

সেটা আবার কীরকম?

এই ধরুন, আজ হয়তো একজনকে বাণ মারল, তাতে সে হয়তো মরল গিয়ে আশি বছর পর। সেটাও কি কম কথা?

ভারী হতাশ হয়ে ফিরে এল শচীন। দেশটা কি জালি লোকে ভরে গেল?

অবশেষে কানাই মণ্ডল হদিস দিয়ে বলল, ওহে, তুমি একবার জরিবুটিওয়ালা নজর আলির কাছে যাও। এই তো তিন ক্রোশ দূরে দাশুরহাট! যাকে জিগ্যেস করবে বলে দেবে।

তাও গেল শচীন। নজর আলি খুব বাবু মানুষ। দাড়িতে মেহেন্দি, চুলে বাবরি, চোখে সুর্মা, গা থেকে আতরের গন্ধ ছড়াচ্ছে। গায়ে চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি, পরনে চেক লুঙ্গি। উঠোনে খাটিয়ায় বসে পোষা পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছিল।

শচীনের আবদার শুনে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, সে আর বেশি কথা কি? কাজ হয়ে যাবে। একটা মলম দিচ্ছি, সারা গায়ে লাগিয়ে বাইরে বসে থেকো। আড়াইশো টাকা দাম।

ছোট বয়ামে মলম নিয়ে বাড়ি ফিরল শচীন। মনে ভারী ফুর্তি।

পরদিন সকালেই মলম লাগাল সারা গায়ে। গন্ধটা একটু বিটকেল আর ভারী আঠালো। উঠোনে একটা জলচৌকি পেতে বসতেই আশ্চর্য কাজ হতে লাগল।

কোথা থেকে হুস করে একটা কাক এসে প্রথমেই তার বাঁ কাঁধে বসে তারস্বরে 'কা কা' বলে চেঁচাতে লাগল। একটু বাদেই ডান কাঁধে এসে বসল পেল্লায় সাইজের চিল। বসেই সে রাম ঠোক্কর দিতে শুরু করল শচীনের মাথায়। গোটা দুই শালিক এসে বাঁ-হাতে বসেই রীতিমতো ঝগড়াঝাঁটি করতে লাগল। আর ডান হাতে এসে বসল একটা ঘুঘু। মুশকিল হল, পাখিগুলো যে এসে বসল, আর উড়ে যাবার নাম নেই। ফলে শচীনের প্রাণান্তকর অবস্থা।

কাকের কা কা চিৎকার এবং ঠোক্কর, চিলের নখে কাঁধে ক্ষত, ঠোক্করে মাথায় রক্তপাত, শালিক আর ঘুঘুর চেঁচামেচি সব মিলিয়ে শচীন যায়-যায়।

সে উঠে যন্ত্রণায় লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগল, ওরে! তোরা কে কোথায় আছিস! আমাকে রক্ষে কর এসে....!

লোকজন দৌড়ে এসে পাখিদের টানাহেঁচড়া করে ছাড়িয়ে উড়িয়ে দিল। তারপর গায়ে আঠা ছাড়াতে দু' ঘণ্টা পুকুরে চোবানো হল শচীনকে। ঝামা ঘষে গায়ের আঠা তুলতে হল।

অবশেষে দিন সাতেক বাদে সে গিয়ে গুটি গুটি বিষ্ণুপদর বাড়িতে হাজির হয়ে খুব নরম গলায় বলল, বাপু হে বিষ্ণুপদ। তোমাকে গুরু বলে মানছি। বিদ্যেটা আমাকে শেখাবে?

বিষ্ণু অবাক হয়ে বলে, বিদ্যে তো কিছু জানিনে মশাই শুধু ভালোবাসতে জানি।

শচীন ভারী ভাবনায় পড়ল। বিদ্যে-টিদ্যে শেখা বরং সহজ। কিন্তু ভালোবাসা! সেটা কি বেজায় শক্ত জিনিস নয়? তা কী আর করা যাবে! সে বলল, তবে তাই শেখাও বাপু! রোজ এসে তোমার কাছে বসে ওইটেই না হয় শিখব।

শাক-ভাতের দাম

কুঁড়োরাম গরিব মানুষ। কচুঘেঁচু বেচে কোনওক্রমে তার খাওয়াটা-পরাটা জোটে। তার বড় কষ্ট। যে জমিতে কচুঘেঁচু ফলায় তাও তার নিজের নয়, পতিতপাবন ঘোষ মশাইয়ের।

পতিতবাবুর জমি অর্থাৎ বাগানে কুঁড়োরামের বাবা হরিরাম মালির কাজ করতেন। তাঁর মাইনে ছিল তেরো টাকা। বাপের কাজটাই করে আসছে কুঁড়োরাম। তার মাইনে ছিল দেড়শো টাকা।

তা পতিতবাবু গত বছরেই গত হয়েছেন। তাঁর তিন কুলে কেউ নেই বলে বড়সড় বাড়ি আর পাঁচ বিঘের বাগানখানা বেওয়ারিশ পড়ে আছে। কুঁড়োরামের বেতনও বন্ধ। এখন কুঁড়োরাম খায়ই বা কী, পরেই বা কী?

ওদিকে গাঁয়ের মাতব্বররা তাকে এত্তেলা দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে সাফ বলে দিয়েছে, ওই জমি আর বাড়ি এখন সরকার বাহাদুরের, সরকার বাহাদুর সম্পত্তি নিলামে তুলে বেচে দেবে, সুতরাং কুঁড়োরাম যেন অন্য পন্থা দেখে।

কুঁড়োরামের মাথায় বজ্রাঘাত, বাগানের ফলপাকুড়, কচুঘেঁচু বেচে যাও বা দিন চলছিল, এবার সে গুড়েও বালি। যতদিন নিলামে না উঠছে ততদিনই যা একটু মাথা গোঁজার জায়গা, এরপর গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

ভেবে ভেবে কুড়োরাম ভারী দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভাগ্য ভালো তার সংসারে কেউ নেই। বাপ-মা গত হওয়ার পর সে একাবোকা পড়ে আছে। সংসার করার ইচ্ছে যে হয়নি, তা নয়। তবে সংসার পাতলে আরও দুর্ভোগে পড়তে হত।

কুঁড়োরাম একদিন সকালে দেখতে পেল, একজন উলোঝুলো লোক বাগানে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ বাড়ির কোথাও পাহারাদার নেই। কুঁড়োরামই মালি, সেই যা কিছু দেখেশুনে রাখে, তবে কি না তেমন রোখাচোখা লোক নয়। নিরীহ মানুষ। গরিবরা যেমন হয় আর কী!

কুঁড়োরাম লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কী খুঁজছেন বাবামশাই?'

লোকটার পরনে ছেঁড়া পাতলুন, গায়ে একটা জড়ানো তেলচিটে কালো কোট। বোধহয় একসময়ে উকিলের কোটই ছিল। লোকটার সাদা দাড়ি-গোঁফ, সাদা একমাথা এলোমেলো চুল। বলল, 'কুড়োনোই আমার স্বভাব, বুঝলে? এই দ্যাখো দুটো পাথরের টুকরো, একটা পুরোনো পেরেক আর পুরোনো কাগজ কুড়িয়ে পেয়েছি।'

'তা এগুলো কোন কাজে লাগবে?'

লোকটা উদাস গলায় বলে, 'কোনটা কোন কাজে লেগে যায় কে বলতে পারে। আমার বাপু কোনও জিনিস ফ্যালনা বলে মনে হয় না।'

কুঁড়োরাম ভাবল, লোকটা পাগলই হবে। এ গাঁয়ের লোক নয়। হলে সে চিনতে পারত। কুঁড়োরাম তাই নিজের কাজে গেল। একটা বড় মানকচু, কিছু শাক, কয়েকটা ডাঁশা পেয়ারা নিয়ে বাজারের ধারে গিয়ে একটা চট পেতে বিক্রি করতে বসল।

বিক্রিবাটা শেষ করে যখন ফিরল, তখন দুপুর। এসে দেখল বুড়ো মানুষটা তারই দাওয়ায় বসে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখে বড় কষ্ট হল তার। নরম গলায় ডেকে বলল, 'বাবামশাই। কিছু খাওয়া হয়েছে?'

বুড়ো একটা হাই তুলে বলে, 'না বাবা। খেতে তো কেউ আর ডাকে না। তাই চৌপর দিন আমার খাওয়াই হয় না।'

'তা আমার তো বড্ড গরিব ঘর। দুটি ভাত রাঁধি?'

'তা সে তো বেশ কথা।'

কুঁড়োরাম কাঠকুটো জ্বেলে মোটা চালের ভাত, একটু লাউশাক রান্না করল। এর বেশি সাধ্য তার নেই।

বুড়ো মানুষটা তাই খেল তৃপ্তি করে। মুখখানা হাসিতে আর খুশিতে একেবারে মাখামাখি। ভাতের পর এক ঘটি জল খেয়ে ঢেকুর তুলে বলল, 'ওঃ। একেবারে ভোজবাড়ির খাওয়া হয়ে গেল। আজ তাহলে আসি বাপু?'

'তা আসুন গিয়ে।'

লোকটা চলে যাওয়ার পর কুঁড়োরাম দেখতে পেল, দাওয়ার এককোণে কুড়োনো জিনিসগুলো ফেলে রেখে গেছে লোকটা। কোনও কাজের জিনিস নয়, কয়েকটা কাগজ, একটা পেরেক, দুটো পাথর।

কাগজগুলো উলটে-পালটে একটু দেখল কুঁড়োরাম। পতিতবাবু তাকে অবসর সময়ে একটু-আধটু পড়াতেন। অক্ষরজ্ঞানটা তার আছে। দেখল, কাগজে বাংলা হরফেই কিছু যেন লেখা আছে। আর কাগজগুলোয় সরকারি সিলমোহরও রয়েছে।

বহু কষ্টে খানিকটা মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে কুঁড়োরামের চোখ কপালে উঠল। সর্বনাশ! এ তো রীতিমতো একটি দানপত্র বলেই মনে হচ্ছে। পতিতপাবন ঘোষ তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু যে স্বয়ং এই কুঁড়োরাম বিশ্বাসকে দিয়ে গেছেন!

কুঁড়োরামের ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস হল না। হয় সে স্বপ্ন দেখছে, নইলে কেউ তার সঙ্গে রসিকতা করেছে। এ কি আর সত্যি হতে পারে? শুনলে যে লোকে তাকে ঢিল মারবে!

ভয়ে ভয়ে কুঁড়োরাম কাগজগুলো ঘরের কুলুঙ্গিতে লুকিয়ে রেখে দিল। মোড়ল-মাতব্বররা টের পেলে তার কপালে কষ্ট আছে।

বাকি দিনটা কুঁড়োরামের ভারী আনমনে গেল। রাতেও তেমন ঘুম হল না। শেষ রাতে হঠাৎ তার মনে হল, আচ্ছা, একবার রাধেশ্যাম রায় মশাইয়ের কাছে গেলে হয় না?

রাধেশ্যাম বড় ন্যায়নিষ্ঠ লোক। পুজোপাট না করে জলগ্রহণ করেন না। দানধ্যানও যথেষ্ট, তিনি পতিতবাবুর বন্ধুও ছিলেন।

সকালবেলাতেই কাগজগুলো নিয়ে খুব ভয়ে-ভয়ে সে গিয়ে রাধেশ্যামবাবুর বাড়িতে হাজির হয়ে সাষ্টাঙ্গে একটা প্রণাম করল।

রাধুবাবু বারান্দায় বসে পাখিদের দানা দিচ্ছিলেন। তাকে দেখে বললেন, 'কী খবর রে?'

'আজ্ঞে। বড় আতান্তরে পড়ে আসা। যদি কষ্ট করে এই কাগজগুলো একটু দেখেন!'

রাধুবাবু কাগজগুলো নিয়ে চোখে চশমা এঁটে বেশ মন দিয়েই দেখলেন, তারপর অবাক হয়ে বললেন, 'এ যে অবাক কাণ্ড রে।'

কুঁড়োরাম হাতজোড় করে বলে, 'আজ্ঞে। কাণ্ডখানা বুঝতেই আপনার কাছে আসা। মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কেউ রসিকতা করেছে।'

রাধুবাবু মাথা নেড়ে বলেন, 'তোর মতো লোকের সঙ্গে রসিকতা করার জন্য কেউ এত কাঠখড় পোড়ায়নি, তবে আমার কাছে এসে ভালো কাজ করেছিস। এ কাগজ মোড়ল-মুরুব্বিদের হাতে পড়লে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিত।'

পরদিনই চণ্ডীমণ্ডপে গাঁয়ের মাথারা সব জড়ো হল। প্রথমে খুব চেঁচামেচি হল, 'এ কাগজ জাল। কুঁড়োরাম সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ওই অত বড় সম্পত্তি গাপ করতে চাইছে। লোকটা বরাবরের মিটমিটে শয়তান।...ইত্যাদি।'

রাধুবাবু বিচলিত হলেন না। বললেন, 'এই উইলে দুজন জবরদস্ত সাক্ষীও আছে। একজন কমলেশ্বর গাঙ্গুলি, অন্যজন বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী। তাদের ডাকা হোক।'

কমলেশ্বর গাঙ্গুলি প্রাচীন জমিদার বংশের উত্তরপুরুষ। লেখাপড়া জানা লোক আর ভারিক্কি স্বভাবের। বিষ্ণুপদবাবু নিজেই একজন উকিল। ইদানীং শরীর ভালো নয় বলে প্র্যাকটিস ছেড়ে গাঁয়ে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

দুজনেই এত্তেলা পেয়ে এসে বললেন, 'হ্যাঁ তো! এই উইলের আমরাই সাক্ষী। পতিতবাবু সজ্ঞানে এই দানপত্র আমাদের সামনে সই করেছেন, তবে কথাটা প্রকাশ করতে নিষেধ করে গেছেন। পাছে কুঁড়োরামের ওপর সবাই খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে।'

এতেও মজলিশি সভা সহজে ঠান্ডা হল না। অনেক বাকবিতণ্ডা চলল। কেউ-কেউ এমন বলল, 'কুঁড়োরামের মতো অপদার্থকে অত টাকার সম্পত্তি দেওয়া ঠিক হবে না। ওকে দু-চার হাজার টাকা দিয়ে বিদেয় করে দেওয়া হোক।'

কিন্তু রাধুবাবু, কমলবাবু আর বিষ্ণুবাবু বেঁকে বসলেন। তাঁরা বললেন, অন্যায্য বিচার কিছু হলে তাঁরা ছেড়ে কথা কইবেন না।

কুঁড়োরাম আগাগোড়া হাতজোড় করে টালুমালু চোখে চেয়ে এই বিতণ্ডা শুনছিল। মাতব্বররা যা বলেন, তার বিরুদ্ধে কথা কওয়ার আস্পদ্দাই তো তার নেই। শেষ অবধি, সভা রায় দিল, 'নাঃ। ন্যায্য বিচারে ওই সম্পত্তি কুঁড়োরামেরই প্রাপ্য। তাকে বঞ্চিত করলে মহা অধর্ম হবে।'

বিষ্ণুবাবু অগ্রণী হয়ে বললেন, 'এই দানপত্রের প্রবেট বের করে সম্পত্তি ন্যায্য অধিকারীর হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আমিই নিলাম, নইলে দুর্বলের পক্ষে এত দায়িত্ব সামাল দেওয়া মুশকিল।'

কুঁড়োরাম বাড়িতে ফিরে হাউহাউ করে একা-একাই অনেকক্ষণ কাঁদল, সেই বুড়ো মানুষটা যেখানে বসে ছিল সেখানে গড় হয়ে প্রণাম করে বলল, 'দুটো শাকভাতের যে এত দাম, তা কে জানত বাবামশাই?'

আকাশ গঙ্গা

লোকের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করতে নরহরি খুবই ভালোবাসে। ভাব জমানোর নানা ফন্দি-ফিকিরও জানা আছে তার। শনিবার রাতে ডাউন বর্ধমান-কলকাতা লোকালে উঠে সে দেখল কামরাটা বড়ই ফাঁকা। জনমনিষ্যি নেই। এধার-ওধার খুঁজে সে দেখল জানালার ধারে একজন মাত্র বসে বসে ঝিমোচ্ছে। অগত্যা নরহরি গিয়ে তার পাশটিতেই বসল।

একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলল, মুখখানা খুব চেনা-চেনা ঠেকছে যে!

লোকটা নিমীলিত চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, চেনা লোককে তো চেনা-চেনা দ্যাখবারই কথা!

নরহরি কস্মিনকালেও এই মুশকো চেহারার ফোগলা, ভুড়ো গোঁফওয়ালা লোকটাকে দ্যাখেনি। তবু খুশি হয়ে বলল, তা যা বলেছেন। কতকাল পরে দ্যাখা!

কিছু বলতে হয় বলেই বলা। কথা না কইলে নরহরির বড়ো হাঁসফাঁস লাগে। তবে ভাব জমাতে হলে ভুল-ভাল, সত্যি-মিথ্যে যা হোক কিছু বললেই হল।

লোকটা ঝিমোতে ঝিমোতে বলল, হ্যাঁ, একবছর তিনমাস সতেরো দিন পর।

নরহরি এ কথায় একটু হাঁ হল। ও বাবা! এ যে একেবারে দিনক্ষণ অবধি বলছে!

তবু নরহরি বেশ অমায়িকভাবেই বলল, হ্যাঁ, তা হবে। তা বাড়ির সবাই ভালো তো!

লোকটা ফের নিমীলিত চোখে একবার নরহরিকে দেখে নিয়ে বলল, বাড়ি? বাড়ির কথা আর বলবেন না মশাই। তাদের হাল কী হয়েছে তা ভগবানই জানেন।

বাড়ির খবর পাচ্ছেন না বুঝি! তা গিয়ে ঘুরে আসুন না একবার। বাড়ি দূর তো আর নয়।

দূর! না, দূর আর এমন কি? আসলে ফুরসৎ পাচ্ছি কোথায় বলুন?

তা অবশ্যি ঠিক। আপনি তো কাজের লোক। তা সেই পুরনো চাকরিই করছেন তো এখানো?

তাছাড়া আর কী? চাকরিটা তেমন খারাপ ছিল না মশাই। তবে এই বুড়ো মা-বাবা, বউ-বাচ্চাদের ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে থাকাটাই বড্ড খারাপ লাগে।

একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই একটা চাওলা ছোকরা উঠল।

নরহরি বলল, একটু চা ইচ্ছে করবেন নাকি? ভাদ্র মাসের শেষে এবার একটু ঠান্ডাই পড়ে গেছে।

তা নিন একটু চা।

চা খেতে খেতে নরহরি বলল, তা কতকাল বাড়ি যাওয়া হয়নি আপনার?

তা বেশ অনেকদিনই হয়ে গেল। দু-আড়াইশো বছর হবে।

সে কী? দু-আড়াইশো না দু-আড়াই?

চা খেয়ে লোকটির ঝিমুনি কেটেছে। হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, দু-আড়াই বছর হলে তো কথাই ছিল না মশাই। সে তো নস্যি। আমি কি তাই বললুম আপনাকে?

তাহলে?

দু-আড়াইশো বছরের কথাই বলছি। এতদিনে মা-বাবা আরও একটু বুড়ো হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ছোটো মেয়েটা তখন হামা দিয়ে বেড়াত, এখন নিশ্চয়ই হেঁটে চলে বেড়ায়। রাঙি গাইটার বিয়োনোর কথা ছিল, তা তার বাছুরটাও বোধহয় এতদিনে বড়ো হয়ে গেছে। গোয়ালঘরের পিছনে কলমের গাছটা ছোটো ছিল, এখন নিশ্চয়ই ফল দিতে শুরু করেছে।

লোকটা পাগলই হবে। তবে ভয়ংকর পাগলকেই যা ভয়। অল্পস্বল্প পাগলকে নরহরি সামাল দিতে পারবে। তাই সে ভারি বিনয়ের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, অনেকদিনের পাল্লা তো, ওরকম হতেই পারে। তা আপনার গ্রামটি কি বাঁকড়ো না মেদিনীপুরে?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, কোনোটাই নয়, আমার জেলা হল হরেকেষ্টপুর, থানা শিকরগাছা, গাঁয়ের নাম কালীতলা।

হরেকেষ্টপুর! এরকম জেলার নাম তো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।

খুব বড়ো জেলা মশাই। আড়ে-দীঘে এতই বড়ো যে আপনাদের এগারোটা বর্ধমান জেলা তাতে অনায়াসে ঢুকে যাবে।

নরহরি হতবাক হয়ে বলে, ওরে বাবা! তা কোন লাইনে যেতে হয় বলুন তো! একবার না হয় ঘুরেই আসা যাবে।

কাজটা শক্ত হবে। পরাণ মাঝির খেয়া ছয়মাসে একবার করে এখানে খেপ মারে। তা সে খেয়ায় সবসময়ে জায়গা পাওয়া যায় না। মোটে বারোশো লোক বসবার জায়গা আছে।

চোখ কপালে তুলে নরহরি বলল, খেয়া নৌকোয় বারোশো লোক! সেটা কি নৌকো, না জাহাজ?

আদর করে খেয়া বলে বটে সবাই। তবে সেখানা বেশ বড়োসড়ো ব্যাপারই বটে।

তা মশাই, খেয়া নৌকো তো আমাদের দামোদরেও খেপ মারে। দিনে অগুনতিবার এপার-ওপার করছে। কিন্তু আপনাদের পরাণ মাঝি ছ'মাসে একবার খেপ মারে কেন?

পাল্লাটাও তো দেখতে হবে। ধরুন এ মুড়ো ও মুড়ো ধরলে লক্ষ-কোটি মাইলের তফাৎ।

এ যে দুনিয়াজোড়া কথা মশাই।

যে আজ্ঞে। দুনিয়াজোড়া কথাই তো।

নদীটার নাম কী বলুন তো?

আমরা তো বলি আকাশ গঙ্গা।

আকাশ গঙ্গা! না দাদা, এরকম নদীর নাম শুনিনি।

না শুনলে দেখেছেন তো বটেই।

দেখেছি নাকি?

না দ্যাখার কী আছে বলুন। চোখের সামনেই বুক চিতিয়ে পড়ে আছে জলটল নেই অবশ্য, শুধু খাত।

বলেন কি, জলছাড়া নদী! তা তাতে আবার খেয়া! না দাদা, আমার মাথায় সেঁধোচ্ছে না।

লোকটা ভারি হাঃ হাঃ করে হাসল। বলল, আকাশ গঙ্গা কি যে সে নদী! তার দেমাকই আলাদা।

নদীটা কি আমাদের বর্ধমানের লাইনেই পড়বে মশাই?

তা পড়বে না কেন? আকাশ গঙ্গার ঘাট সর্বত্র। ওপর পানে তাকালেই তো আকাশ গঙ্গা মশাই। একেবারে ভগবানের রাজ্যে। ও নদীর কোনো কূলকিনারা নেই। কোথাও শুরু হয় না, কোথাও শেষ হয় না।

আপনি বোধহয় ঠাট্টা করছেন।

আমি ঠাট্টা করার কে? ঠাট্টা যদি বলেন তো সেটা ভগবানেরই ঠাট্টা। অত বড়ো আকাশখানা আমাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় বলুন! আমরা ছোটোখাটো মানুষ সব, আকাশখানার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ারই তো কথা।

নরহরি এবার খুব সন্তর্পণে বলল, আপনার আকাশ গঙ্গা কি তাহলে আকাশের নদী মশাই?

তাই বটে।

সেটাকেই কি আকাশকুসুম বলে?

তাও বলতে পারেন। সন্ধেরাতের দিকে পুবমুখে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে কোনাকুনি যে লালচে তারাটাকে দেখতে পাবেন, ওরই কাছেপিঠে আমার গাঁ। ভারি ভালো গ্রাম মশাই। হপ্তায় তিন দিন হাট বসে। শিবরাত্তির, চড়ক, রথ, আরও সব পালে-পার্বণে বিরাট মেলা বসে। জাগ্রত রক্ষাকালীর থান আছে। লাগোয়া দ্বাদশ শিবের মন্দির। রথযাত্রায় দুশো ফুট উঁচু রথ বেরোয়।

নরহরির বাক্য শেষ হয়ে গেল। এ পাগলের সঙ্গে কথা কওয়ার মানেই হয় না। সে পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ফেলল। মাথাটা ঘুরছে।

মশাই কি ঘুমোলেন?

আজ্ঞে একটু ঝিমুনি আসছে বটে।

তাহলে ঘুমোন। আমি পরের স্টেশন মশাগ্রামেই নেবে যাব।

তা বেশ।

শুধু নামবার আগে একটা কথা।

কী বলুন তো?

একবছর তিনমাস সতেরো দিন আগে এই ট্রেনেই এমনি রাতের বেলা আপনি আমার ঘুম ভাঙিয়ে খেজুরে আলাপ জুড়েছিলেন মনে আছে?

নরহরি শশব্যস্তে বলল, তাই নাকি?

যে আজ্ঞে। তাই তক্কে তক্কে ছিলাম। আর সুযোগ পেয়ে একটু পালটি দিয়ে গেলাম আর কি। ভবিষ্যতে আর বোধহয় আপনি আমার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করবেন না।

নরহরি ভারি খুশি হয়ে হাত কচলে বলল, আজ্ঞে না। কস্মিনকালেও না।

ব্রহ্মজ্ঞান

উদ্ধব বাবাজি সকালবেলা উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি, জপতপ এবং চা আর বিস্কুট দিয়ে পারণ করার পর দু-হাতের আঙুলে লম্বা কাঁচাপাকা দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন, ওরে নেতাই, আমার যে ডাক এসেছে রে!

নেতাই উঠোনের উত্তর কোণে তার সাদা গরুটার দুধ দোয়াচ্ছিল, কথাটা শুনে শশব্যস্তে বালতিহাতে উঠে পড়ে ভারী দুশ্চিন্তার গলায় বলল, সে কী বাবাজি, আপনি এত তাড়াতাড়ি পরলোকে পাড়ি দিলে আমাদের মতো পাপীতাপীর হবেটা কী?

উদ্ভব বাবাজি একটু গরম হয়ে বলে উঠলেন, পরলোকে পাড়ি দেওয়ার কথা বললুম নাকি রে আহাম্মক? আমি যে ভক্তদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি। কাতর গলায় ডাকছে, বাবাজি, তোমার বিহনে আর তো প্রাণরক্ষে হয় না। গাছে মর্তমান কলার কাঁদি ঝুলছে, আম পেকেছে, জাম পেকেছে, কাঁঠালও পাকল বলে, তোমাকে ভোগ না দিয়ে আমরা যে সেসব মুখে তুলতে পারছি না বাবা। তা কী করি বল, ভক্তদের আকুল ডাক তো ফেলতে পারি না।

আজ্ঞে, ডাকটা আসছে কোত্থেকে বাবাজি?

কাল ধ্যানে বসেই দেখতে পেলাম, ডাকটা আসছে ডালখোলা থেকে। কালকের দিনটা যাত্রার পক্ষে শুভ নয়। তবে পরশু সকালেই রওনা হয়ে পড়ব। তাই ভাবছি, যাওয়ার আগে তোকে ব্রহ্মজ্ঞানটা দিয়ে যাই।

নেতাইয়ের চোখ কপালে, বলেন কী বাবাজি? ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে ফেলবেন?

দিয়েই ফেলি। আর কবে আসা হয় না হয়। ডালখেলায় গেলুম, তা বলে সেখানেই বসে থাকলে হবে না। আমার অগণিত ভক্ত চারদিক থেকে, দূরদূরান্ত থেকে ডাকাডাকি করছে। শৈলেনের এক ভক্ত তো সেই কবে থেকে আমার জন্য সোনার খড়ম তৈরি করে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। গিয়ে হাজির হলেই অগুরু-দেওয়া জলে পা ধুইয়ে সোনার খড়ম পরিয়ে দেবে। চকবেড়ের সীতারামের বউ নন্দরানি মুক্তোর মালা পরিয়ে চরণপূজা করবে বলে কবে থেকে পথ চেয়ে বসে আছে। হিঙ্গলগঞ্জের রাখোহরি তার জমিজমা আমার নামে দেবোত্তর করে দিয়ে বসে আছে। দখল নেওয়াটাই যা বাকি। তোর কাছে পড়ে থাকলে কি আমার চলে রে? তারপর ধর হিমালয়েও তো আমার একটা ঠেক রয়েছে! দুটো নেকড়ে বাঘ আমার সেই ঠেক সামলে রাখে।

বুঝেছি বাবাজি, এবার আপনি গতর তুলবেন। তা ব্রহ্মজ্ঞান পেলে কী হবে মশাই? হাওয়াতে উড়তে পারব?

তা পারবিনি কেন? ইচ্ছে হলে হাওয়ায় উড়তে পারবি, জলের ওপর দিব্যি হাঁটতে পারবি। জলে ডুববি না, আগুনে পুড়বি না।

তাহলে তো খুব সুবিধেই হবে মশাই। তাহলে দিয়েই দ্যান ব্রহ্মজ্ঞান।

তাই তো বলছি, তবে অত বড় জিনিস, তার খরচাপাতি আছে। পাঁচ সের চাল, পাঁচ সের ডাল, আস্ত মাছ, পাঁচশো ঘি আর পাঁচটা মোহর।

নিতাই হাঁ হয়ে গেল, মুখে বাক্যি সরল না। কিছুক্ষণ পর বলল, বাপরে, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞানের দরকার নেই বাবাজি।

উদ্ধব বাবাজি গম্ভীর হয়ে বললেন, যে জিনিস পাচ্ছিস তার দাম যে হিসেবের বাইরে রে। ব্রহ্মজ্ঞানী হলে যে হাত ঝাড়লেই পর্বত। তখন কত খাবি আর কত বিলোবি? তা না হয় তোর খাতিরে একটু কমসম করেই ধরছি।

অনেক দর কষাকষির পর যা রফা দাঁড়াল তাতে উদ্ধব বাবাজির মুখখানা তোম্বা হয়ে রইল। দু-সের চাল, দু-সের ডাল, এক পো ঘি আর মোহরের বদলে নিতাইয়ের বউয়ের একখানা ফঙ্গবেনে নথ, ব্রহ্মজ্ঞান যে এত সস্তা নয় তা বিস্তর বুঝিয়েও কিন্তু লাভ হল না।

পরদিন সকালেই বাবাজি ব্রহ্মজ্ঞানটা দিলেন। নিতাই চান করে একখানা শুদ্ধবস্ত্র পরে হাঁটু গেড়ে দাওয়ার কাছ ঘেঁষে উঠানে বসা, বাবাজি দাওয়ার ওপরে একখানা কুটকুটে কম্বলের আসনে বসে খানিকক্ষণ চোখ বুজে সমাধিস্থ হলেন। তারপর বিরাট একখানা হাই তুলে গালবাদ্য করার পর বিদঘুটে সব মন্তর গুন গুন করতে করতে নিতাইয়ের কপালে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরলেন, বেশ অনেকক্ষণ ঠেসে ধরার পর বললেন, কিছু টের পেলি?

নিতাই আমতা আমতা করে বলল, আজ্ঞে তেমন কিছু নয়। একটু যেন গরম লাগছিল।

হুঁ। বলে খুব গম্ভীর মুখ করে কিছুক্ষণ আনমনে চেয়ে থেকে বললেন, তোর ভিতরে তো গলা অবধি চকচক করছে, ওর মধ্যে কি আর ব্রহ্মজ্ঞান সেঁধোতে চায়। ক্রিয়া হতে সময় লাগবে। পাপের চাপে ব্রহ্মজ্ঞানটা গুটলি পাকিয়ে ভিতরে বসে আছে। জপতপ চালিয়ে যা, একসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান দুম করে ফাটবে। তখন আর তোকে পায় কে?

নিতাই একটু হাত-পা ঝাড়া দিল, নিজের মাথা একটু চাপড়াল, চোখ কচলে চারদিকে ভালো করে চাইল। তেমন কিছু হেলদোল বুঝতে পারল না। বলল, বাবাজি, ব্রহ্মজ্ঞানটা কবে নাগাদ ফাটবে বলে মনে হয়?

ওর কি আর ঠিক আছে? কালও ফাটতে পারে, আবার দু-চার মাস কী দু-চার বছরও লেগে যেতে পারে। তবে ও হল মোক্ষম জিনিস। একবার যখন ছুঁচ হয়ে ঢুকেছে তখন ফাল হয়ে বেরোবেই।

দ্বিপ্রহরে আহারাদি ও বিশ্রামের পর উদ্ধব বাবাজি ডালখোলা রওনা হয়ে গেলেন।

নিতাইয়ের বউ সরস্বতী বলল, ব্রহ্মজ্ঞান না ছাই, তোমাকে তো সেই চোরের মতোই দেখাচ্ছে, মিছিমিছি আমার নথটা গেল। পাঁচরতি সোনা ছিল ওতে।

নিতাইয়ের মনটা একটু কিন্তু কিন্তু করছিল। ব্রহ্মজ্ঞান বলে কথা। সেটা ভেতরে ঢুকলে তো আর কিছু না হোক, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসুক, বা ভেদবমি হোক কি পিত্তশূলের ব্যথা হোক, কিছু তো একটা হবে। তা তো হচ্ছে না।

তারণ গাঙ্গুলির বাড়িতে নতুন জামাই এসেছে অষ্টমঙ্গলায়। যে সে জামাই নয়, রীতিমতো মালদার মানুষ। হাতে হিরে, মুক্তো আর পান্নার আংটি। গলায় তিনভরির সোনার চেন, দামি ঘড়ি। এসেই খুব টাকা ওড়াচ্ছে। তিন শালিকে তিনখানা বেনারসি, শাশুড়িকে গরদ, শ্বশুরকে মুগার পাঞ্জাবি আর কাঁচি ধুতি, শালাকে প্যান্ট আর শার্ট, সবাই ধন্যি ধন্যি করছে। নিতাই জামাইটিকে দেগে রেখেছিল, গতকালই হয়ে যেত, শুধু ওই ব্রহ্মজ্ঞানের ফেরে পড়ে হয়নি।

নতুন বর-বউয়ের ঘরে নিশুত রাতে গিয়ে সুবিধে নেই। তার বকবকম অনেক রাত অবধি চলে। তাই নিতাই রাত দুটো অবধি মড়ার মতো ঘুমোল। তারপর যন্ত্রপাতির থলিটা নিয়ে বিষয়কর্মে বেরিয়ে পড়ল।

তাদের সমাজে নিতাইয়ের তেমন নামডাক নেই। লোকে আড়ালে বলে, নিতাই এখনও দুধের শিশু, আড় ভাঙেনি। কথাটাও মিথ্যে নয়। বড় গোছের দাঁও সে আজ অবধি মারতে পারেনি। তবে কোনওরকমে খাওয়াপরাটা চালিয়ে নেয় আর কী।

সমস্যা হল, নতুন বর-বউ তো ঘুমোবে দেরিতে, কিন্তু গাঙ্গুলিখুড়োর আবার ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগের অভ্যাস। কাজেই একেবারে ঘড়ি ধরে মাঝখানের সময়ের ফাঁকটুকুতে কাজ হাসিল করতে হবে।

তারণ গাঙ্গুলির বাড়িখানা দিব্যি। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে বড় উঠোন, তার চারদিকে চারটে দালান। বাগান-টাগান আছে। আজ শেষরাতে একটু কুয়াশাও পড়েছে। জমাটি শীত। গাছ বেয়ে দেওয়াল টপকে নিতাই বাড়ির হাতায় ঢুকে পড়ল। থলিখানা ঝোপের আড়ালে নামিয়ে শিক কাটার যন্ত্র আর প্লায়ার নিয়ে গুটি গুটি এগোতে লাগল। বাড়ির হালহদিশ তার মুখস্থ। বরাতে দুর্গতি লেখা না থাকলে আজ কপাল খোলার কথা।

মেয়ে-জামাইয়ের ঘরের পিছন দিকটায় পৌঁছে সবে জানলার পাল্লার খিলে হাত বাড়িয়েছে—আর ঠিক সেই সময়ে—কী আশ্চর্য, পাল্লাটা সড়াক করে খুলে গেল। থতমত খেয়ে দু-পা পিছিয়ে এল নিতাই। লক্ষণ তো ভালো ঠেকছে না। কেউ দেখে ফেলল নাকি তাকে? সটকাবার উদ্যোগ নিয়েও নিতাই একটু থমকাল। দেখতে পেলে গেরস্ত চেঁচায়, লোক ডাকে। তেমনটা তো হচ্ছে না।

নিতাই আরও চার পা পিছিয়ে দাঁড়াল। আচমকাই জানলা দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে এসে একটা অ্যাটাচি কেস গোছের কিছু বাইরে ছুড়ে দিল। আর বাক্সটা ছিটকে এসে পড়বি তো পড় নিতাইয়ের একেবারে পায়ের গোড়ায়। নিতাই টপ করে অ্যাটাচিটা তুলে নিতেই ঘরের ভিতর থেকে হঠাৎ বিকট চিৎকার উঠল, চোর! চোর! চোর! ওই যে পালাচ্ছে! ধর...ধর...

তার পরই ভিতরে ধুপধাপ শব্দ, আর বাড়ির লোকজনের চিৎকার, দরজা খোলার শব্দ আর টর্চের আলোয় ধুন্ধুমার বেঁধে গেল।

নিতাই নিজের থলিখানা তুলে নিয়ে টক করে দেওয়াল ঘেঁষা আমগাছটায় উঠে দেওয়াল ডিঙিয়ে এক লহমায় বাইরে লাফিয়ে পড়ল। অ্যাটাচিটা বড্ড ভারী।

সরস্বতী অ্যাটাচিটা খুলে হাঁ, ওমা গো! এ তো গয়না। আর এক গোছা নোটও যে রয়েছে গো! এক রাতে এত রোজগার! মা গো! আমি কোথায় যাব? মা কালী, কার্তিক ঠাকুর বুঝি এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন!

নিতাই গ্যালগ্যাল করে হাসছিল। নাঃ, ব্রহ্মজ্ঞানটায় যেন কাজ হচ্ছে মশাই, বেশ কাজ হচ্ছে!

কানু স্যাঁকরা বনাম যুধিষ্ঠির বাজপাই

ফুটবলে হেড করতে গিয়ে কানুবাবুর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে বলে যে রটনাটি হয়েছে তা কিন্তু মোটেই ঠিক কথা নয়। কানুচরণ সারা জীবনে কখনও ফুটবল কেন, কোনও খেলাই খেলেননি। এমনকী তিনি ফুটবল আর ক্রিকেট বলের পার্থক্য কী তাও জানেন বলে মনে হয় না। বড়লোক বাপের আদুরে ছেলে অতিশয় অলস ও আরামপ্রিয়। বাবাকেলে একটা সোনারুপোর ব্যবসা আছে বলে তাঁর দিব্যি স্বচ্ছন্দে জীবন কেটে যাচ্ছে। জীবনে কোনও পরিশ্রমের কাজ করেননি।

তা হয়েছে কী, সেদিন তিনি দুপুরবেলা দোকান থেকে রিক্সায় চেপে বাড়িতে আসছিলেন ভাত খেতে। সেইসময়ে পাড়ার মাঠে স্কুলের ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। হঠাৎই কার একটা জোরালো শট সোজা এসে কানুবাবুর মাথায় লাগল। কানুবাবু চোখে অন্ধকার দেখলেন এবং মূর্ছাও গেলেন। পাড়ার লোক ছুটে এসে চোখেমুখে জলের ছিটে দেওয়ার পর তাঁর মূর্ছা ভাঙল বটে, কিন্তু তিনি তখন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। নিজের নামটা পর্যন্ত মনে নেই।

চারদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে! আমি এখানে কেন? এখন তো আমার চাঁদপাড়া থানায় ডিউটিতে থাকার কথা!

শুনে সবাই অবাক। পল্টু বলল, ও কাকু, চাঁদপাড়া তো এখান থেকে অনেক দূর! আর থানার ডিউটি কী বলছেন! আপনি তো কানু স্যাঁকরা।

কানুবাবু মুখটা বিকৃত করে বলেন, কানু স্যাঁকরা? সে আবার কে? নামটাই তো বিচ্ছিরি। আমার নাম হল যুধিষ্ঠির বাজপাই। আমি হলুম গে চাঁদপাড়া থানার ওসি।

চারদিকে হাসির লহর উঠল। তাতে কানুবাবু ভারী রেগে গেলেন। তিনি যে কানুবাবু নন একথা কেউ বিশ্বাসই করল না। সবাই তাঁকে একরকম চ্যাংদোলা করে বাড়িতে নিয়ে গেল। নিজের বাড়িতে এসে তিনি প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। এসব কী হচ্ছে? এ কার না কার বাড়িতে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল? এদের তো আমি জন্মেও চিনি না? ছিঃ ছিঃ, আমাকে এরকম ধরে-বেঁধে অন্যের পরিবারে আটকে রাখা ভীষণ অন্যায়।

বাড়ির লোক প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়ে ডাক্তার বৈদ্যনাথ বৈদ্যকে ডেকে আনল। বৈদ্যনাথ পাড়ার ডাক্তার। কানুবাবুর সঙ্গে তাঁর ভালোই পরিচয়। কিন্তু এখন কানুবাবু তাঁকে একদম চিনতে পারলেন না। বরং খ্যাঁক করে উঠলেন। আপনি আবার কে?

আমি বৈদ্যনাথ ডাক্তার। চিনতে পারছো না?

ডাক্তার! ডাক্তার কেন? আমি তো ডাক্তার ডাকিনি! দেখুন মশাই, আমার কোনও অসুখ-টসুখ হয়নি। আমি আপনাকে ডাকিওনি। ভিজিট-টিজিট কিন্তু আমি দেব না।

বৈদ্যনাথ হেসে বলেন, তা বললে কি হয়? ভিজিট দিতেই হবে।

অ্যাঁ! এটা কি মগের মুলুক নাকি? আমার অসুখ হয়নি, ডাক্তার ডাকিনি, ডাক্তার নিজের গরজে বাড়ি বয়ে এসে জুলুম করলেই হল?

ওহে, সংবিধানের সাতানব্বই ক ধারাটি পড়ে দেখো। ডাক্তার তোমার বাড়িতে এলেই ভিজিট দিতে হবে। এমনকী, অন্নপ্রাশন, বিয়ে, বা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে এলেও ডাক্তারকে ভিজিট দেওয়ার নিয়ম।

এঃ, মামাবাড়ির আব্দার আর কী! এরপর তো বলবেন, রাস্তায়ঘাটে দেখা হলেও ভিজিট লাগবে।

তা তো বটেই। ডিকশানারিটা দেখলেই তো হয়। ভিজিট মানেই তো দেখা করা বা দেখা হওয়া। সংবিধানের সাতানব্বই ক ধারাটা ভালো করে পড়ে দেখো। রাস্তাঘাটে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যাবে তার উপায় নেই। আইনত ডাক্তারকে ভিজিট গুনে দিয়ে তবে রেহাই।

কানুবাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, তাহলে তো বড় বিপদেই পড়া গেল মশাই! এখন দেখছি ডাক্তার দেখলেই গা-ঢাকা দিতে হবে।

তা তো বটেই। তাই বলছি ডাক্তারের সঙ্গে বেয়াদপি করতে নেই। এখন বলো তো, তোমার কী হয়েছে? শুনলুম তুমি নাকি ফুটবলে হেড করে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছ।

কে বলল আমি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছি?

ঠিক আছে, তোমার নাম কী?

আমার নাম যুধিষ্ঠির বাজপাই। চাঁদপাড়া থানার ওসি।

বুঝলুম। তোমার স্মৃতিভ্রমই হয়েছে। কানু স্যাঁকরা জীবনে ফুটবল খেলেছে বলে শুনিনি।

কে কানু স্যাঁকরা? যুধিষ্ঠির বাজপাই একসময়ে পুলিশ টিমের ক্যাপ্টেন ছিল তা জানেন?

শুধু ডিমেনশিয়া নয়, পারসোনালিটিই চেঞ্জ হয়ে গেছে।

স্মৃতিভ্রম আপনাদের হয়েছে। একটু আগে একটা ছোকরা এসে বলল, বাবা, দই আনব, পয়সা দাও। বুঝুন কাণ্ড। জীবনে বিয়েই করলুম না, এদিকে বাবা হয়ে গেলুম। এক ভদ্রমহিলা এসে তো মাথায় ঘোমটা টেনে অনেকক্ষণ গর্জন করে গেলেন। তিনি নাকি আমার বউ। এসব তো খুবই ষড়যন্ত্রমূলক ব্যাপার! আমিও পুলিশের লোক, সবাইকে যদি কোমরে দড়ি না পরাই তাহলে আমার নাম যুধিষ্ঠিরই নয়।

নয়ই তো! তোমার নাম কস্মিনকালে যুধিষ্ঠির ছিল না। তুমি হলে কানু স্যাঁকরা। প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে যাচ্ছি। ওষুধ খেয়ে ঘুমোও।

একটা অচেনা বাড়িতে অচেনা লোকজনের মধ্যে ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলেন কানুবাবু। একজন বুড়োমানুষ এসে বললেন, আমি তোর বড় কাকা। একজন প্রবীণা এসে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মাকে কি ভুলে যেতে হয় বাবা?

বিকেলে জটাজূটধারী পেল্লায় চেহারার এক ওঝা এল। এসে কটমট করে কিছুক্ষণ কানুবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুই কে?

কানুবাবু ভয় পেয়ে বললেন, আজ্ঞে মাইরি বলছি, আমি হলুম চাঁদপুর থানার দারোগা যুধিষ্ঠির বাজপাই।

ওঝা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তবে রে, যুধিষ্ঠিরের ভূত! ঝেঁটিয়ে আজ তোর ভূত ছাড়াব।

কানুবাবু ওঝার রক্তচক্ষু, হাতে শলার ঝাঁটার আস্ফালন আর তর্জন-গর্জন শুনে কাতর গলায় বললেন, দারোগার গায়ে হাত তুললে যে দশ বছরের জেল হয়, তা জানো?

ওঝা হুংকার দিয়ে বলল, তুই দারোগা নোস, দারোগার ভূত।

কানুবাবু ব্যবসায়ী মানুষ। লেনদেন ভালোই বোঝেন। তিনি একটু চোখের ইশারা করে চাপা গলায় বললেন, ওহে বাপু, মারধর না করে একটা বোঝাপড়ায় এলে হয় না?

লোকটাও ঘোড়েল। চাপা গলায় বলল, কত?

এই ধরো, একশো টাকা!

পাগল নাকি, আজকাল একশোতে কি হয়?

আহা, তোমার দর কত?

হাজার টাকা।

একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

ওর নীচে হবে না বাবু।

তাই সই। কিন্তু টাকাটা যে হস্তান্তর করবেন তার উপায় নেই। উঠোনের চারদিকে পাড়ার লোক জমা হয়েছে। টাকা পাচার করার চেষ্টা দেখলেই লোক ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন, তাঁর কাছে টাকাও নেই। কারও কাছে যে ধার করে দেবেন সেও সম্ভব নয়। লোকটা কিছুক্ষণ রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে থেকে কীসব মন্তর পড়ে ঝাঁটাটা দিয়ে তাঁকে বেদম পেটাতে লাগল। কানুবাবু আয়েশি মানুষ, আরাম-আয়েশের শরীর। ঝাঁটাপেটা খেয়ে ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগলেন। তারপর চোখ উলটে গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন সর্বাঙ্গে ব্যথা এবং পুলটিশ। এসব কী হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। তাঁর এরকম হেনস্থা করতে পাবলিক সাহস পায় কী করে? গুম হয়ে বসে কিছুক্ষণ অপমানটার কথা ভাবলেন তিনি। এবং ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথাটা আগুন আর গা গরম হয়ে উঠল। তিনি হঠাৎ একটা হুংকার দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর একটা হুংকার দিয়ে উঠোনে লাফ দিয়ে নামলেন। বাড়ির লোকজন ছুটে এসে তাঁর পথ আটকাল।

কিন্তু রাগের চোটে কানুবাবুর গায়ে দুনো জোর এসে গেছে। তিনি পেল্লায় ধাক্কায় লোকজনকে সরিয়ে চোঁ চাঁ দৌড়োতে লাগলেন। লোকজন পিছনে ধাওয়া করল।

কানুবাবু বিপদ বুঝে রাস্তার পাশে ফুটবলের মাঠে ঢুকে পড়লেন। একটা সুবিধেও ছিল। মাঠে ফুটবল খেলা চলছে। বাইশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে ফেললে কেউ সহজে বুঝতে পারবে না।

কানুবাবুর কৌশলটা কাজেও দিল। তিনি দিব্যি ফুটবল খেলুড়েদের মধ্যে মিশে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে পালাবেন। এটাই মতলব।

ঠিক এই সময়ে কার একটা শট এসে দুম করে তাঁর মাথায় লাগল। তিনি জ্ঞান হারালেন। তবে জ্ঞান হারানোর আগে শুনতে পেলেন মাঠে সবাই 'গোল, গোল' বলে হর্ষধ্বনি করছে।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন মাথাটা ঝিমঝিম করছিল বটে, কিন্তু তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে তিনি হলেন কানুচরণ শানা। তাঁর ছোট ছেলে ঘরে ঢুকে তাঁকে বসে থাকতে দেখে বেজায় খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ওঃ বাবা, কাল যে রাসমণি ক্লাবকে হেডে গোলটা দিয়েছ না, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস!

ভালোমানুষের বিপদ

লোচন দাস হাড় হাভাতে বটে, কিন্তু পঞ্চমুখী গাঁয়ে বা তার আশেপাশে লোচনের কোনও নিন্দে নেই। নিন্দে বলতে ওই একটাই কথা, লোচনকে নিয়ে কথা উঠলেই সবাই একবাক্যে বলে, আহা রে, লোচনটার কিছু হল না।

একথা সত্যি যে লোচনের অনেক কিছু হয়নি। তার না আছে জোত জমি, না আছে পয়সাকড়ি, না আছে বাসযোগ্য তেমন বাড়িঘর। পেটে তেমন বিদ্যেও নেই লোচনের, ইস্কুলে কিছুদিন পড়েছিল মাত্র। তবে তার দেবদ্বিজে খুব ভক্তি আছে। কারও কাছে হাত পাতার অভ্যেস নেই। সে মিছে কথা কয় না, কারও সঙ্গে ঝগড়া-কাজিয়া বাঁধায় না, ভারী নরমসরম লোক। ভাগ চাষ করে তার গ্রাসাচ্ছাদন কোনওক্রমে হয়ে যায়। তার বউ ধলেশ্বরী চ্যাটাই বোনে, কাঁথা সেলাই করে দু-পাঁচ টাকা আয় করে। তাদের তেমন সুখও নেই, তেমন দুঃখও নেই।

গাঁয়ের বড় মানুষ কেষ্ট ঘোষ মেলা কারবারের মালিক, তার টাকাপয়সার লেখাজোখা নেই। তা বলে কেষ্ট খারাপ লোকও নয়। সে গাঁয়ের জন্য মেলা কাজ করেছে। পুকুর কাটিয়ে দিয়েছে, টিউবওয়েল বসিয়েছে, স্কুলের বাড়িটার দোতলা তুলে দিয়েছে, নিয়মিত কাঙালীভোজন করায়, তার বাড়িতে ভিখিরি ফেরে না। দানধ্যানের বেশ খ্যাতিও আছে কেষ্টর।

একদিন কেষ্ট সকালবেলায় লোচনকে ডেকে বলল, ওরে, দেশটা যে পাপীতাপীতে ভরে গেল রে লোচন। সকালবেলায় যে একটা ভালো মানুষের মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠবো তার উপায় নেই। রোজই তাই আমার দিন খারাপ যায়। যেদিকে তাকাই, যার দিকেই তাকাই দেখি সব পাপীতাপী। সব ঘোর পাপীতাপী। কলিকাল বলে কথা। তা একটা উপায় করতে পারিস?

লোচন ভারী ভাবনায় পড়ে গিয়ে বলল, তাই তো কেষ্টকর্তা, এ তো ভাবনার কথাই বটে। তাহলে কি কাশী-বৃন্দাবন গিয়ে কিছুদিন বাস করে আসবেন?

দূর বোকা! কাশী-বৃন্দাবনে তো পাপীতাপীদের মচ্ছব। যে সব পাপীতাপীর কোথাও ঠাঁই হয় না, তারাই গিয়ে ওসব জায়গায় জোটে। না রে লোচন, ব্যবস্থা তোকেই করতে হবে।

লোচন খানিক চোখ বুজে ভেবে বলল, তাহলে কি কোনও একজন সাধু মহাত্মাকে ধরে বেঁধে এনে আপনার শোওয়ার ঘরের বাইরে বহাল করতে হবে?

সাধু মহাত্মা চিনবি কী করে? ওসব ভেক ধরা মানুষ কি ভালো হয় রে? সব ভেজাল মাল, কলিকালে সাধু মহাত্মার বড়ই আকাল, বুঝলি? জটাজূট গেরুয়ার আড়ালে সব ঘোর পাপী ঘাপটি মেরে আছে।

তাহলে তো বড় মুশকিলেই পড়া গেল কেষ্টকর্তা!

ওরে শোন, আমার মনে হয় তোর মতো একটা ভালো লোক পেলেই আমার হয়ে যায়। তোকে তো প্রায় তোর জন্ম থেকে চিনি, পাপীতাপী নোস, নির্মল ভালো লোক। আমার ইচ্ছে রোজ তোর মুখ দেখেই ঘুম থেকে উঠি।

লজ্জা পেয়ে বিঘৎ খানেক জিব কেটে লোচন বলে, বলেন কি কেষ্টকর্তা! আমি আবার ভালো লোক হলুম কোন সুবাদে? লোকে বলে আমি হলুম হাড়হাভাতে লক্ষ্মীছাড়া মানুষ। আমার মুখ দেখলে যে আপনার পাপ হয়ে যাবে কর্তা।

কেষ্ট ঘোষ বলে, সে তুই যা-ই বলিস, আমি তোকে ভালো লোক বলেই বিশ্বাস করি। হাতটান নেই, মিছে কথা নেই, মতলববাজ নোস, লোভটোভ নেই। তুই তো একটা বেশ লোক। তা রোজ সকাল ছ'টা নাগাদ এসে আমার বাড়ির মালঞ্চতলায় দাঁড়িয়ে থাকবি, আমি রোজ তোর মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠব। এ কথার আর নড়চড় নেই।

অগত্যা লোচন আর কী করে। বউকে এসে বলল, ও গো, তুমি তো রোজই আমার মুখ দেখে ঘুম থেকে ওঠো, তাতে তোমার দিন কি খারাপ যায়, না ভালো?

ধলেশ্বরী বলে, ওমা! আমি আবার কবে তোমার মুখ দেখে উঠি, তুমি তো সেই সাতসকালে উঠে কাজে বেরোও। আমি তো রোজ উঠে কেষ্টঠাকুরের পটের মুখ দেখি। কেন, হঠাৎ এসব কথা উঠছে কেন বলো তো!

আর বোলো না, কেষ্টকর্তার মনে হয়েছে আমি নাকি একটা ভালো লোক। রোজ সকালে তাই আমার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠবেন।

ধলেশ্বরী একটু ভেবে বলল, কেষ্ট ঘোষ বড়মানুষ। বড়মানুষের কতরকম খেয়াল হয়। তোমার অত সাতপাঁচ ভাবার দরকার কী? রাজি হয়ে গেলেই তো হয়। বড়মানুষকে খুশি করতে পারলে দায়ে-দফায় উপকার হতে পারে।

লোচন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ওসব লোভ করতে নেই, বুঝলে! কেষ্টকর্তা বড়মানুষ আছেন তো কী! ভগবান আমাদের তো খারাপ রাখেননি।

তবে লোচনের দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও সে কেষ্ট ঘোষকে হতাশ করল না। রোজ সাতসকালে গিয়ে কেষ্ট ঘোষের মালঞ্চতলায় শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। আর মনে মনে বলে, আমি মোটেই ভালো লোক নয় ঠাকুর, আমাকে এর জন্য যেন পাপ দিও না।

কয়েকদিন পর কেষ্ট ঘোষ তাকে জড়িয়ে নিয়ে বলল, তুই যে বলিস তুই তেমন ভালো লোক নোস!

আরে কর্তা, ঠিকই তো বলি, আমি মোটেই সুবিধের লোক নই।

তাই যদি হবে তাহলে আমার গত পনেরোটা দিন এত ভালো কাটল কী করে? সকালে কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে, গায়ে জোরবল ফিরে এসেছে, ব্যবসাতে হু-হু করে বিক্রিবাটা আর লাভ বাড়ছে, গিন্নির মুখনাড়া বন্ধ হয়েছে, তিনটে গরু বেশি বেশি দুধ দিচ্ছে, ধারবাকি আদায় হয়ে যাচ্ছে ঝটাপট। আমার অম্বলের অসুখ আর বাতের ব্যথা গায়েব হয়েছে, মেজো মেয়ের জন্য একটা ভালো পাত্র পেয়ে গেছি। এতসব গত পনেরো দিনে হল কি করে?

মাথা চুলকে লোচন বলে, ঠিক বুঝতে পারছি না কর্তা, তবে এসব বোধহয় ঝড়ে বক মরছে বলে হচ্ছে।

আচ্ছা বেকুব লোক তুই! যাকগে, সকালে যেমন এসে হাজিরা দিচ্ছিস তেমন দিয়ে যা। তোকে মাসে পঞ্চাশটা টাকা দেবো।

হাতজোড় করে লোচন বলে, আজ্ঞে, তাহলে তো হাজিরাটা চাকরি হয়ে যাবে কর্তা। ধর্মের মধ্যে ব্যবসা ঢুকে পড়বে।

তাও তো ঠিক! কিন্তু তোরও তো কষ্ট করে আসতে হয় রোজ।

আজ্ঞে না কর্তা, কষ্ট কিসের? আপনার যদি উপকার বলে মনে হয় তাহলেই আমার যথেষ্ট।

এইজন্যই তো সবাইকে বলি, ওরে, গাঁয়ে ওই একটাই বড্ড ভালো লোক আছে। আমাদের লোচন।

লোচন লজ্জায় সরমে মরে যায়। সে নাকি ভালো লোক! শোনো কথা! সে তো আকাশ-পাতাল ভেবেও বুঝতে পারে না যে ভালো কিসে! পেটে বিদ্যে নেই, শাস্ত্রজ্ঞান নেই সাধনা-তপস্যা

নেই, দানধ্যান নেই, তেমন পরোপকার নেই, কিছুই তো নেই তার! এমনকি মা লক্ষ্মী বা মা সরস্বতীর কোনও কৃপাও তো সে পায়নি। তবে সে ভালো লোক হল কোন সুবাদে?

দুপুরবেলা ভাত খেতে বসে সে ধলেশ্বরীকে বলল, আচ্ছা ধলেশ্বরী, আমি লোকটা কেমন বলে তোমার মনে হয়?

ধলেশ্বরী অবাক হয়ে বলে, ও আবার কি কথা?

না, এই বলছিলাম কী, কেষ্টকর্তার কি উচিত হয়েছে আমাকে একজন ভালো লোক বলে বিবেচনা করা? কেষ্টকর্তার কি বেজায় ভুল হচ্ছে না?

আমি বাপু অতশত বুঝি না, আমি বলি কী, তুমি ভালো হও আর মন্দই হও, কেষ্ট ঘোষের চোখে যখন পড়েছো তখন একটু সুবিধে করে নিলেই তো পারো।

তোমার বড় বিপরীত বুদ্ধি ধলেশ্বরী, আমরা তো বেশ আছি।

রামগোপাল রায় গাঁয়ের মুরুব্বি মানুষ। একদিন বাজারের রাস্তায় খপ করে লোচনের হাত চেপে ধরে বললেন, ওরে লোচন, তোকেই খুঁজছি। তুই নাকি বড্ড পয়া মানুষ শুনতে পাই। আমার সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে। কাল প্রাতঃকালে সাড়ে ছ'টার সময় আমার শোওয়ার ঘরের জানলার বাইরে একটু দাঁড়িয়ে থাকবি বাপু? ঘুম ভেঙেই যেন তোর মুখটা দেখতে পাই!

লোচন আমতা আমতা করে বলে, পয়াটয়া নই কর্তা। কেষ্টবাবু ভালোবেসে বলেন ওসব কথা।

ওরে, তুই যে বর্ণচোরা আম। এ আর কেউ না জানুক আমি জানি, নইলে আমার দেড় ভরির সোনার কবচখানা কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিতি না।

লোচন আর কী করে, রাজি হতে হল। আর পরদিন থেকে রামগোপালেরও সময় ভালো হতে শুরু করল।

এরপর তাকে ধরল পঞ্চানন ঘোষাল, ও বাবা লোচন, কাল থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমার বাড়িতে হাজির থাকিস বাপ।

কেন খুড়ো, কী ব্যাপার?

তোর চাঁদমুখখানা দেখে ঘুম থেকে উঠব বাপ। সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে।

লোচন মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। এসব কী কাণ্ড রে বাবা! এরকম চললে তো তার নাভিশ্বাস উঠবে!

তা তাই উঠল লোচনের। মাসখানেকের মধ্যে আরও দশ-বারোজন একই আব্দার করে বসল।

লোচন অগত্যা একদিন ধলেশ্বরীকে এসে বলল, আমাদের তল্পিতল্পা যা আছে গুছিয়ে নাও তো!

ও মা! কেন গো?

এ গাঁয়ের বাস ওঠাতে হচ্ছে ধলেশ্বরী। নইলে আমাকে মারা পড়তে হবে।

পরদিন ভোরভোরই দুজন পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল।

একটু বেলার দিকে লোচনের খোঁজে বিস্তর লোক এসে তার কুঁড়েঘরের সামনে জড়ো হয়ে গেল। কোথায় লোচন? অ্যাঁ! কোথায় লোচন? তাদের খোঁজে চারদিকে লোকজন বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

চোখ

আমি একজন ছাপোষা মানুষ মশাই, কারও সাতে-পাঁচে থাকি না, কোনও ঝুট-ঝামেলায় যাই না। দিনকাল যা পড়েছে তাতে কোনও সোয়াস্তি নেই মশাই।

আমি যেটা বুঝতে পারছি আপনি একজন গোবেচারা মানুষ। সাহসী বা ডাকাবুকো নন, কোথাও ঝামেলা দেখলেই সরে আসেন।

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কিন্তু কথাটা কী জানেন, এই আপনার মতো যারা নিজেকে অ্যাসার্ট করতে পারে না অর্থাৎ যারা জোরের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে না, যারা ভীতু এবং সাবধানী তারা অনেক সময়ে খুব ভালো অবজার্ভার হয়।

তার মানে?

অর্থাৎ সবাই না হলেও, এইসব চুপচাপ মানুষদের মধ্যে অনেকেরই পর্যবেক্ষণ শক্তি খুব ভালো। তার কারণ ভীতু, নিরীহ, মুখচোরা লোকেরা সাবধানীও হয়। তারা সহজে হোঁচট খায় না, খানাখন্দে পড়ে যায় না, সাবধানে রাস্তা পেরোয়। সোজা কথায় তারা চারদিকটাকে খুব ভালো করে লক্ষ করে। কিন্তু শুধু লক্ষই করে, রিঅ্যাক্ট করে না।

একটু বুঝিয়ে বললে হয় না?

আপনি বুদ্ধিমান। তবু বলছি, এ ধরনের লোক চোখের সামনে কোনও ক্রাইম ঘটলে চুপচাপ অকুস্থল থেকে সরে পড়ে, কাউকে কিছু বলে না, কিন্তু তারা ক্রাইমটাকে খুব ভালো করেই অবজার্ভ করে। বাসে কারও পকেটমার হচ্ছে দেখলেও এরা উচ্চবাচ্য করে না বটে, কিন্তু পকেটমারকে চিনে রাখে।

এবার বুঝলাম।

কী বুঝলেন?

আপনি আমাকে ঠিকই চিনেছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আমার মোটে এই প্রথম দেখা হল, আমি কীরকম তা এত অল্প সময়ে বুঝলেন কী করে?

আপনার চোখ দুটো তো আর আপনি দেখতে পান না, আমি পাই। মানুষের চোখ লক্ষ করা আমার একটা স্বভাব। আর তা থেকেই আমি অনেক সময়েই নির্ভুল অনুমান করতে পারি।

হুঁ। সেটা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষের চোখ দেখে অনেক কিছু বোঝা যায় বটে। তাহলেও বলব আমাকে স্টাডি করতে আপনি খুবই কম সময় নিয়েছেন।

কম সময় নয়।

তার মানে? মাত্র আধঘণ্টার পরিচয়। সেটা কি যথেষ্ট সময়?

আমি গত তিন দিন ধরে আপনাকে ফলো করছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনিও সেটা টের পেয়েছেন। ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে পাকড়াও করতে পারতেন। কিন্তু নিরীহ মানুষ বলে ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করেছেন। ঠিক বলছি কি?

আপনি বোধহয় খুব একটা ভুল-টুল বলেন না। পুলিশের লোক বোধ হয়?

আপনি কি পুলিশ ভয় পান?

আমি আরশোলা, টিকটিকি সবকিছুকেই ভয় পাই, পুলিশ তো অনেক বড় ব্যাপার।

আমি পুলিশ তা ঠিকই অনুমান করেছেন, গত বুধবার রাত দশটায় আপনি টিউশনি করে ফিরছিলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর ঝড় ছিল সেদিন। গাঁজা পার্কের কাছে একটা সরু রাস্তায় আপনি একটা ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে আমার অনুমান।

ঘটনা! কোন ঘটনা?

দুটো ছেলে খুব কাছাকাছি পাশাপাশি ওই বৃষ্টিতে গলির মধ্যে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

ওরকম তো কতই থাকে।

সে তো বটেই। আপনি লক্ষ করেছিলেন কি?

অন্ধকারে আবছা দেখা। ভালো করে বুঝতে পারিনি।

আমি জানতে চাই, তাদের সঙ্গে আপনার কোনও কথাবার্তা হয়েছিল কি না।

কী যে বলেন স্যার! ওই ঝড়বৃষ্টিতে ছাতা উল্টে, ভিজে সপসপে হয়ে মাথা বাঁচানোর জন্যই ব্যস্ত, কথা হবে কী করে?

সেদিন আপনি অফিসের বেতন পেয়েছিলেন, টিউশনির টাকাও। আপনার পকেটে সেদিন বেশ কয়েক হাজার টাকা ছিল। আর ওই ছেলে দুটো মার্কামারা ছিনতাইবাজ, তারা ওই মওকায় আপনাকে একা পেয়েও ছেড়ে দিল?

আমি কেমন লোক তা তো আপনি ভালোই জানেন। সাতে-পাঁচে নেই, গুন্ডা-বদমাশদের বড্ড ভয় পাই।

আমার কিন্তু বিশ্বাস ওরা আপনার ওপর চড়াও হয়েছিল।

না না, ওরা বোধহয় অন্য কোনও টার্গেটের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সে যাকগে। ছেলে দুটোকে ওই গলিতেই পরে পাওয়া যায়। দুজনেই ইনজিওরড। একজনের ঘাড়ের হাড় সরে গেছে, বাঁচার কথা নয়। তবু ভাগ্যক্রমে বেঁচেছে। অন্যজনের মাথা ফেটেছে, কনকাসন্।

ও বাবা!

অবাক হচ্ছেন? নাকি ভয় পাচ্ছেন?

ভয় পাচ্ছি স্যার, ভয় পাচ্ছি। শহরটার দিন দিন কী যে হচ্ছে!

ছেলে দুটো কী বলেছে জানেন? বলেছে, তারা ছিনতাই করার মতলবেই আপনার জন্য ওত পেতে ছিল। কিন্তু তারা কিছু বুঝে ওঠার আগে নাকি আপনিই হঠাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর পর তাদের আর কিছু মনে নেই।

কী যে বলেন স্যার!

আপনার অবজার্ভেশনটার কথাই বলছি। ওরা যে ছিনতাই করার মতলবেই অপেক্ষা করছিল তা আপনি আগেই বুঝতে পারেন, তাই না? আচ্ছা, চলি।

ফকিরচাঁদ

ফকিরচাঁদ যে একজন অতি সন্দেহজনক লোক তাতে কারও কোনও সন্দেহ নেই। গঙ্গানগর গাঁয়ের শেষপ্রান্তে যে খালটা রয়েছে তার ধার ঘেঁষেই ফকিরের বাড়ি। বাড়ি বলতে যা ঠিক সেরকম নয়। বাঁশ-বাঁখারি দিয়ে বানানো ঘর, গোলপাতার ছাউনি, নিতান্তই হতদরিদ্র অবস্থা। সেখানেই ফকিরচাঁদ দিব্যি আপনমনে থাকে। মুখভর্তি কালো কুচকুচে দাড়ি-গোঁফ, পরনে আলখাল্লার মতো একটা বেঢপ পোশাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লোকে তাকে সাধু ভেবে নিয়ে অনেক সময়ে জোটে, অনেকে হাত দেখাতে চায়, তাবিজ-কবচ চায়। ফকিরচাঁদ তাদের সটান তাড়িয়ে দেয়। সে বলে, আমি সাধু, সিদ্ধাই নই বাপু, আমি একজন বৈজ্ঞানিক।

তা ফকিরচাঁদ বৈজ্ঞানিকই বটে। সকালবেলা আলো ফুটবার আগেই সে একখানা থলি নিয়ে বেরিয়ে খালের ওধারে জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে। সেখান থেকে রাজ্যের পাতা, ফল, শেকড়বাকড় তুলে নিয়ে আসে। তারপর হামানদিস্তায় থেঁতো করে তাতে কীসব মেশায় কে জানে! তার ঘরে কাঠের তাকে সারি সারি শিশিতে সেইসব পাতার তৈরি তরল ওষুধ, বড়ি, গুঁড়ো ভরা। সেগুলো কার কোন কাজে লাগবে তা কেউ জানে না। ফকিরও কাউকে ডেকে কখনও বলেনি যে, আমার ওষুধ খেয়ে দেখো। সে কারও কাছ থেকে কিছু চায়ও না। তবু যে তার পেট চলে তার কারণ হল, চাষিবাসিরা তাকে একটু ভয়-ভক্তি করে বলে প্রায় রোজই কিছু না কিছু সিধে দিয়ে যায়। কিন্তু ফকিরচাঁদের তাতে কোনও হেলদোল নেই। ভারী নির্বিকার মানুষ।

সনাতন বিশ্বাসের বড় পাজি হাঁফানি আছে। বহু চিকিৎসাতেও কোনও কাজ হয়নি। গাঁয়ের ডাক্তার-কবিরাজ ফেল করাতে সনাতন বড় গঞ্জ শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে এসেছে। বিস্তর ওষুধেও কোনও কাজ হয়নি বলে সনাতনের জীবনের ওপর মায়াটাই চলে গেছে। এই রোগ নিয়ে বেঁচে থাকাটাই তো কষ্টকর। অনেক ভেবেচিন্তে সনাতন একদিন বিকেলে গিয়ে ফকিরের ঘরে হানা দিল।

ফকির আছিস নাকি?

ফকির হাঁক শুনে বেরিয়ে এল। মুখে বিরক্তি, ভ্রু কোঁচকানো। বাজখাঁই গলায় বলল, কী চাই?

ওরে আমি তো হাঁফানিতে মরতে বসেছি। কোনও ওষুধেই কাজ হচ্ছে না। বলি তুই কি হাঁফানির ওষুধ জানিস?

জবাব না দিয়ে ফকির ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা শিশি নিয়ে এসে সনাতনের হাতে দিয়ে বলল, এটা সকালবেলা এক ছিপি খেয়ে নেবেন। রোজ।

শিশির গায়ে কোনো লেবেল নেই। খুব ভয়ের চোখে শিশিটার দিকে চেয়ে সনাতন বলল, ওরে, এতে কোনও বিষ-টিষ নেই তো! খেলে কিছু খারাপ যদি হয়?

ফকির নির্বিকার মুখে বলে, সে আমি জানি না। খারাপও হতে পারে। কোনও গ্যারান্টি নেই।

এটার দাম কত?

তাও জানা নেই মশাই।

সনাতন দোলাচল মন নিয়ে বাড়ি ফিরল।

ফকিরচাঁদের ওষুধের কথা শুনে বাড়ির সবাই 'রে রে' করে উঠল, খবর্দার, ওই পাগলের ওষুধ খেও না। মারা পড়বে।

সনাতনও ভয় পেয়ে খেল না। তবে শিশিটি রেখে দিল। কিন্তু হাঁফানির কষ্ট মাঝে মাঝে এমন তুঙ্গে ওঠে যখন মনে হয় এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

তাই দিন তিনেক পরে একদিন মাঝরাতে উঠে মরিয়া হয়ে সে এক ছিপি ওষুধ খেয়ে নিল। স্বাদ একটু তেতো-তেতো, আর গন্ধটাও খুব একটা ভালো নয়। খেয়ে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে রইল। বিষক্রিয়া হয়েছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু তেমন কিছু খারাপ প্রতিক্রিয়া হল না দেখে সে একটু নিশ্চিন্ত হল। একটু ঘুমিয়েও পড়ল।

সকালে যেন মনে হল হাঁফের টানটা একটু কম। তবে সেটা মনের ভুলও হতে পারে। কিন্তু সকালে আর এক ছিপি ওষুধও খেয়ে নিল সে। সারাদিন আর কিছুই ঘটল না। কিন্তু রাতে সনাতনের ভারী সুনিদ্রা হল। হাঁফানির জন্য ঘুমোতেই পারত না এতদিন।

সকালে উঠে সে অবাক হয়ে বুঝতে পারল, তার হাঁফের টান এক্কেবারে নেই। নেই তো নেই। কোনও দিন যে ছিল সেটাই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

এই ঘটনার পর গাঁয়ে একটা মৃদু শোরগোল পড়ে গেল। তবে কি পাগলটার সত্যিই কোনও বিদ্যে জানা আছে?

ডাক্তার নগেন সরকার শুনে বলল, হুঁ, হাতিঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল! ফকরেটা তো লেখাপড়াই জানে না!

সনাতন ফুঁসে উঠে বলে, দেখো ডাক্তার, হাঁফানি সারাতে তোমার পিছনে আমি কয়েক হাজার টাকা ঢেলেছি। লাভ হয়েছে লবডঙ্কা। ফকরে তো তার ওষুধের জন্য একটা পয়সাও নেয়নি।

নগেন বলল, ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ঠিক আছে, আমার মায়ের তো পেটে টিউমার ধরা পড়েছে। সামনের মাসেই অপারেশন। খরচের ধাক্কাও কম নয়। সারাক দেখি আপনার ফকিরচাঁদ আমার মায়ের টিউমার!

ফকিরকে পরদিনই দুপুরবেলা ধরে বেঁধে নিয়ে আসা হল। ফকির সব শুনে তার ঝোলা থেকে একটা শিশি বের করে দিয়ে বলল, রোজ সকালে এক ছিপি করে।

তাতে সারবে তো!

তা কে জানে। ওসব আমি জানি না। ওষুধ চেয়েছ, দিয়েছি।

যদি ওষুধ খেয়ে রুগি মারা যায়?

যেতেও পারে। ভয় পেলে খাইও না। তোমাদের ইচ্ছে।

নগেনের মা বললেন, না বাবা, তোমাকে আমার বিশ্বাস হয়। আমি খাব।

তিনদিন ওষুধ খাওয়ার পর মা বললেন, ওরে নগেন, আমার পেটের ভিতর সেই চাকাটা যেন নেই বলে মনে হচ্ছে!

নগেন ডাক্তারও পেট টিপে দেখল, নেই। সন্দেহভঞ্জনের জন্য শহরে নিয়ে এক্স-রে, ইউএসজি করে দেখা গেল, সত্যিই নেই।

পরদিন সকালেই ফকিরের ঘরের দরজায় গিয়ে হামলে পড়ল নগেন ডাক্তার, ও ফকির, তোমার টিউমার সারানোর ফরমুলাটা আমাকে দাও ভাই, আমি তোমাকে হাজার টাকা দিচ্ছি।

ফকির খ্যাঁক করে উঠল, কীসের ফরমুলা? কীসের টিউমার? যাও যাও, ঘ্যানঘ্যান কোরো না।

আচ্ছা, না হয় পাঁচ—না, দশ হাজার টাকাই দেব।

তোমার টাকা বেশি হয়ে থাকলে গরিব-দুঃখীর বিনা পয়সায় চিকিৎসা করো না কেন? এখন বিদেয় হও তো!

ভজহরি গুণের কর্কট রোগ। ডাক্তার জবাব দিয়েই রেখেছে। বড়জোর আর ছ'মাস আয়ু। অথচ তার বয়স বেশি নয়, মাত্র বত্রিশ। এ বয়সে কে মরতে চায়! তাই হাল ছেড়ে ভজহরি শেষের দিন গুনছিল। এমন সময় তার বাবা বলল, ফকির পাগলার ওষুধে নাকি শক্ত ব্যামো সেরে যাচ্ছে। আমাদের ভজুর জন্য একটা শেষ চেষ্টা করে দেখলে হয় না? এখন তো দৈব ছাড়া উপায় নেই।

ফকিরকে বাবা-বাছা বলে একদিন ধরে আনল ভজহরির বাবা। ফকির রুগি ভালো করে দেখল না, পরীক্ষা করল না, প্রশ্নও করল না। শুধু একটা শিশি বের করে দিয়ে বলল, রোজ সকালে দুটো করে বড়ি।

আর কিছু করতে হবে না? শুধু দুটো করে বড়ি খেলেই হবে?

হ্যাঁ। এর বেশি আমার কিছু জানা নেই।

ও বাবা ফকির, একটু ভরসা দিয়ে যাও, এই ওষুধে ব্যাধি সারবে তো!

সারবে কিনা তা আমিও জানি না। ইচ্ছে হলে খাওয়াবেন।

কারোরই ওষুধে তেমন ভরসা হল না। তবে ভজহরি ওষুধটা নিয়মিত খেতে লাগল। দিন সাতেক পরে সে টের পেল, রোজ তার পেট আর পিঠ জুড়ে যে তীব্র ব্যথাটা মাঝে মাঝে হচ্ছিল সেটা আর হচ্ছে না। আরও সাতদিন দেখল সে। পেট শান্ত। ব্যথা নেই। ভজহরিকে নিয়ে তার বাবা ছুটল শহরে। ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। ভ্রু কোঁচকালেন। আরও কয়েকটা টেস্ট করতে বললেন। রেজাল্ট দেখে ফের ভ্রু কুঁচকে চিন্তিত মুখে বললেন, আশ্চর্য! কোনও কারসিনোমিক ট্রেস নেই! কী করে হল বলুন তো! এরকম তো হয় না!

ভজহরি আর তার বাবা ফকিরচাঁদের কথা বিশদ বর্ণনা করল। ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, জরিবুটি! তাতে সেরেছে! চলুন তো, আমিও লোকটার কাছে যাব।

এইভাবেই রোজ ফকিরচাঁদের ঘরের সামনে ভিড় বাড়তে লাগল। প্রথম অল্প অল্প ভিড়। তারপর বেসামাল ভিড়।

মিটিমিটি চোখে চেয়ে ফকিরচাঁদ ভিড় দেখে, আর ভাবে। কী ভাবে তা বোঝা যায় না। মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই।

কিন্তু হঠাৎ এক ঝড়বৃষ্টির রাতে ফকিরচাঁদ উধাও হয়ে গেল। পরদিন লোকজন গিয়ে দেখে, ফকিরচাঁদ তো নেই-ই, ঘরটাও কেতরে হেলে পড়েছে।

সেই থেকে আর ফকিরচাঁদের কোনও খোঁজ নেই।

লাটুর ঘরবাড়ি

লাটু নস্কর মোটেই তেজালো লোক নয়। তাকে মেনিমুখো বললেও বেশি বলা হয় না। চেহারাখানা লম্বা-চওড়া বটে, কিন্তু ভিতুর ডিম। তার তিন কুলে কেউ নেই। জমিজমা নেই, বাড়ি-ঘর নেই। বদন ঘোষের জমিতে খেতমজুরি করে পেট চলে তার। আর খালধারে যে খাপড়ার ঘরটায় সে থাকে তাও নাকি কে একজন গিরিবাবুর জমিতে।

বছর চারেক আগে তার বাবা গত হয়। তার আগে বাবার মুখেই শুনেছে, গিরিবাবু নাকি তার বাবাকে বলে গেছে জমিটা দেখেশুনে রাখিস, আমি ফিরে এসে দখল নেব। তা গিরিবাবু এসে যদি কান ধরে লাটুকে তুলে দেয় তাহলে লাটুর চারদিক একদম ফর্সা। গিরিবাবু না এলেও তার ছেলেমেয়েরাও তো এসে দখল নিতে পারে! তাই লাটু বড়ো ভয়ে ভয়ে থাকে।

আর ঘরখানারই বা কী বাহার। খাপড়ার ছাউনি আর হোগলার বেড়া। বর্ষাকালে সাপখোপ, বিছে, ব্যাঙ, কেঁচোর অবিরল যাতায়াত। তাদের সঙ্গেই মিলেমিশে থাকা। তেমন বাদলা হলে খালের জল এক লম্ফে ঘরে উঠে আসে। আর খাপড়ার ফাঁক দিয়ে জল পড়া তো আছেই। একটা বাঁশের মাচায় বস্তা পেতে তার বিছানা। খাওয়ার কোনো ঠিক- ঠিকানা নেই। রাতে মেটে হাঁড়িতে ভাত রেঁধে নুন-লঙ্কা দিয়ে ফ্যানা ভাত খায়, খানিকটা ভিজিয়ে রেখে পরদিন পান্তা খেয়ে কাজে যায়। অসুরের মতো খাটুনি।

তাও তার চেহারাখানা বেশ তাগড়াই। তার কারণ, যে মাঠপুকুরের জঙ্গলে আর ঝোপঝাড়ে ঘুরে যখন যেমন ফলপাকড় পায় তা গোগ্রাসে খেয়ে নেয়। কখনো ফলসা, কখনো ডাঁশা পেয়ারা, করমচা, বুনো কুল, ডেউয়া, আঁশফল, যা পায়।

এক-একদিন আস্ত মৌচাক পেয়ে গেলে তাকে আর পায় কে? ভেজা খড়ে আগুন দিয়ে ধোঁয়া তৈরি করে মৌমাছিদের তাড়িয়ে আস্ত চাকটা নামিয়ে আনে।

এক-একদিন মেটে আলু বা মানকচু পেয়ে গেলে সেটা কোটালপুরের হাটে নিয়ে বেচে দেয়। ইটাগঞ্জের গোপাল কবিরাজমশাইয়ের জন্য মাঝে মাঝে ঘৃতকুমারী, নিমগুলঞ্চ, বিশল্যকরণী, অর্জুনছাল এনে দেয়। গাছপালা সে খুব ভালো চেনে। কবরেজমশাই দু-চার টাকা দেন মাত্র। তবে বড্ড স্নেহ করেন।

তা এইভাবেই টিকে আছে লাটু। খুব খারাপ আছে, এমন কথা তার মনে হয় না। শুধু এখন একটাই ভয়, গিরিবাবু কবে এসে ঘর থেকে তাকে তাড়ান। তবে এটাও সত্যি কথা যে, এই ঘর আর জমিটুকু থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলেও তার অবস্থার খুব একটা হেরফের হওয়ার নয়। তখন হয়তো হাটখোলার চালার নীচে বা কারও গোয়ালঘরে, নিদেন গাছতলায় গিয়ে জুটতে হবে। তার মতো মনিষ্যির আর এর চেয়ে বেশি কিই বা হবে!

কানু মণ্ডলের স্যাঙাৎ চিকুর ম্যালেরিয়া। তাই কানু এসে লাটুকে ধরল বড়োখালে তার সঙ্গে নৌকোয় মাছ ধরতে যেতে। লাটুর আপত্তি নেই। সে সব কাজেই রাজি। সারারাত বৃষ্টি, নৌকো খানিক বেয়ে, খানিক ঠেলে খাল তোলপাড় করে কানু মাছ ধরল মন্দ নয়। দুটো মাঝারি বোয়াল, কিছু পাঙাস, মৃগেলের বাচ্চা আর চুনো মাছ মিলে চার-পাঁচ কিলো

হবে। কানু হিসেবি লোক। লাটুকে একখানা বোয়াল আর কিছু চুনোপুঁটি দিয়ে বিদেয় করল। অবিশ্যি তাতে লাটুর তেমন আপত্তি হল না, তার কিছু হলেই হয়।

ভোরবেলা ঘাটে নেমেই সোজা আশু পালের বাড়ি গিয়ে পালগিন্নিকে মাছ গছাল সে। কুড়িটা টাকা পেল। তার মনে হল, এই তো যথেষ্ট।

বাড়ি এসে ঘরের ঝাঁপটা খুলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে কে যেন সাড়া দিল, বলি গয়েশ নস্কর বাড়ি আছে?

লাটু ফিরে দেখে ছাতা হাতে এক আধবুড়ো বাবুমতো লোক দাঁড়িয়ে আছে। এ বাড়িতে এমন মানুষের আসার কথাই নয়।

সে বলল, আজ্ঞে গয়েশ নস্কর আমার বাবা। তিনি তো গত হয়েছেন, তা তিন-চার বছর হল বোধহয়।

অ! তা এখানে তুমিই থাকো বুঝি?

যে আজ্ঞে, আমি হলুম গে লাটু নস্কর।

লোকটার পরনে একটা কালো পাতলুন, গায়ে হাফহাতা সাদা শার্ট। বলল, হ্যাঁ, বাবা বলেছিল বটে এ জমির দেখভাল করার জন্য যাকে বহাল করে গিয়েছিল সেই গয়েশ নস্করের একটা কচি ছেলেও আছে। আমি হলুম গিরি নায়েকের ছেলে যদু নায়েক। বুঝলে কিছু?

বুকটা একটু ধক করে উঠল লাটুর। না বুঝবার কথাও তো নয়। বৃত্তান্ত তো জানাই। গিরিবাবুর জমির দখল নিতে তার ছেলে এসে গেছে। লাটু ঘাড় কাত করে বলল, যে আজ্ঞে। বুঝেছি। তা আমাকে কবে ভিটে ছাড়তে হবে?

লোকটা একটু চিন্তিত ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বলল, এখানে কতটা জমি আছে বলো তো?

লাটু মাথা চুলকে বলে, আজ্ঞে কাঠার হিসেব তো ঠিক জানা নেই। তবে উত্তরে ওই যে কাঁঠালগাছটা দেখছেন এখান থেকে দক্ষিণের খালধার পর্যন্ত, আর পুবের ওই বাঁশঝাড়টা থেকে পশ্চিমের কাছে মিয়ার বাড়ির কাঁটাতারের বেড়া অবধি।

তাহলে তো বেশ অনেকটাই জমি, কী বলো হে!

তা মন্দ নয়। আমার আন্দাজ বিঘে দুই হবে।

জমিটা চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখল যদু নায়েক। তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, তা জমিটি খামোখা পড়ে আছে কেন? একটু চাষ-বাস করতে পারলে না?

আজ্ঞে, আমি অন্যের জমিতে খাটতে যাই তো, তাই আর ফাঁক পাই না। তারপর ধরুন, আমার হালগোরু নেই, চাষের পয়সা নেই। গিরিবাবু এলেই জমি ছেড়ে দিতে হবে বলে বাবা বুঝিয়ে গেছে। তাই আর হাঙ্গামা করিনি। তা আমাকে কী আজই উঠে যেতে হবে?

কেন, তুমি কি আরও সময় চাও?

লাটু মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে না, সময় নিয়ে হবেই বা কী! আমার তো গেরস্থালি নেই, জিনিসপত্রও নেই। আজ বললে আজই বেরিয়ে পড়ব।

যদু নায়েক গম্ভীর হয়ে বলে, হুঁ!

তা বাবু, আপনি কি এখন গাঁয়েই থাকবেন?

ভাবছি। হেতালডুবিতে আমাদের খানিকটা চাষের জমিও আছে। বহুকাল আদায় উসুল হয় না।

যে আজ্ঞে! বারো বিঘে জমি। পরশুরাম হেলা চাষ করে। আপনার বাবার আমলের বর্গা, পরশুরাম খুব টেঁটিয়া লোক।

হ্যাঁ। তাই ভাবছি গাঁয়ে আমাদের এত কিছু থাকতে গঞ্জ শহরে পচে মরি কেন? ও জায়গা আমাদের সয় না।

যে আজ্ঞে। তা আমার তো বাঁধাছাঁদার কিছুই নেই। সামান্যই জিনিস। বেরিয়ে গেলেই হয়।

তুমি তো আচ্ছা লোক হে বাপু! একজন উটকো লোক এসে বলল, আমি গিরিবাবুর ছেলে, এ জমি আমার, আর অমনি তুমি ভিটে ছেড়ে চলে যেতে পা বাড়িয়েছ!

লাটু খুব ভাবনায় পড়ে গেল। তাই তো! সে না চেনে গিরিবাবুকে, না চেনে তার ছেলেকে, এ জমির দলিল-দস্তাবেজ কোথায় তাও সে জানে না। শুধু তার বাবা বলেছিল, এ হল গিরিবাবুর জমি, একদিন ছেড়ে দিতে হবে।

মাথা-টাথা চুলকে লাটু বলে, আজ্ঞে, সে কথা ঠিক, তবে বাবু মানুষেরা তো আর ভুল কথা বলেন না।

তুমি তো দেখছি মানুষ বড়ো জব্বর চিনেছ! বাবুদের বুদ্ধি বেশি বলে তারা বদমাইশিও খুব মাথা খাটিয়ে করে।

বাবু, তাহলে কি আপনি গিরিবাবুর ব্যাটা নন?

হলেই বা। প্রমাণ ছাড়া আমাকে জমি ছেড়ে দিতে যাবে কেন?

লাটু শুকনো মুখে বলে, আজ্ঞে ধরা-ছাড়ার কথাই তো ওঠে না। জমি যে মোটেই আমার নয় মশাই!

দখলি স্বত্ব বলে একটা কথা আছে, জানো! জমি যখন যার দখলে থাকে, তখন তাকে পট করে উচ্ছেদ করা যায় না।

লাটু বলে, আমি কী আইনের মারপ্যাঁচ জানি বাবু? হুড়ো দিলেই আমরা ভয় খেয়ে যাই। নিজের জমিই রাখতে পারে না কতজন! আর এ তো পরের জমি।

পেটে বিদ্যে আর মগজে বুদ্ধি না থাকলে ওরকমই হয়।

লাটু হেসে মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে ও বড়ো জব্বর কথা! আমি কী আর মনিষ্যির মধ্যে পড়ি!

তা বাপু, তোমার চলে কীসে? ঘরদোরের যা লক্ষ্মীছাড়া দশা দেখছি তাতে তো মনে হয় তোমার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

লাটু একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, সে তো ঠিক কথা বাবু। তবে কিনা এভাবেই তো এতটা বয়স অবধি কেটে গেল।

বলি, তোমার বয়স কত?

বছর কুড়ি-বাইশ হবে বোধহয়। দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে।

তা বেশ কথা। এখন এ ঘর যদি ছেড়ে দাও তাহলে যাবে কোথা? বলি যাওয়ার কোনো জায়গা আছে?

লাটু একগাল হেসে বলে, তা দু-একটা খোঁজ যে নেই তা নয়। একজনের গোয়ালে একটু থাকার বন্দোবস্ত করে নেওয়া যাবে। নইলে শেষ অবধি গাছতলা তো আছেই।

ভারি অবাক চোখে তার দিকে চেয়ে যদু নায়েক বলে, তুমি একজন তাজ্জব লোক হে। কিছুতেই কোনো হেলদোল নেই দেখছি।

লাটু একটা শ্বাস ফেলে বলে, আজ্ঞে, মনটা খারাপ লাগছে ঠিকই। বাবার আমল থেকেই এই ঘরে আছি কিনা। এখানেই জন্ম। কিন্তু তা বলে তো আর অধর্ম করতে পারি না।

যদু নায়েক গম্ভীর হয়ে বলে, হুম, তোমার ঘরে একটু উঁকি মেরে দেখলাম, তুমি সত্যিকারের দিগম্বর মানুষ। বিষয়বুদ্ধিতে লবডঙ্কা।

লাটু হতাশ হয়ে বলে, আজ্ঞে বিষয়ই তো নেই, বুদ্ধি থাকবে কী করে?

যদু নায়েক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এবার সত্যি কথাটা বলেই ফেলি বাপু। মন দিয়ে শোনো।

লাটু একটু তটস্থ হয়ে বলে, যে আজ্ঞে।

গিরিধারী নায়েকের কোনো ছেলেপুলে ছিল না। তার আসল ওয়ারিশানও কেউ নেই। বুঝলে! আমার নাম যদু নায়েক হলেও আমি কিন্তু গিরি নায়েকের ছেলেও নই, ভাতিজাও নই। সোজা কথা হল, গিরি নায়েকের বিষয়-সম্পত্তি সবই এখন বেওয়ারিশ। ইচ্ছে করলে সরকার বাহাদুর এসব দখল করলেও করতে পারে। কিন্তু একটা বিপদ হল, অনেকেই গিরি নায়েকের ওয়ারিশান সেজে হাজির হতে পারে। তেমন তোড়জোড় হচ্ছে বলেই শুনেছি আর আমি তাই ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখে যেতে এসেছি।

চোখ গোল গোল করে লাটু যদু নায়েকের কথাগুলো শুনছিল। সে বুদ্ধিতে খাটো হলেও একথাগুলো বেশ বুঝতে পারল। খুব চিন্তিত মুখে বলল, তাহলে এখন কী হবে বাবু?

সেটাই বুঝতে আসা। কিন্তু তুমি তো দেখছি বড্ড বোকাসোকা লোক। যে-কেউ এসে তোমাকে তাড়িয়ে জমি দখল করতে পারে। আর একবার দখল নিয়ে গেড়ে বসলে সরানো ভারি কঠিন।

কাঁচুমাচু মুখে লাটু বলে, আজ্ঞে, তা তো বটেই।

তুমি উচ্ছেদ হয়ে যাও, এটাও আমার ইচ্ছে নয়।

কিন্তু কেউ এসে হুড়ো দিলে?

তুমি কি খুব ভিতু লোক?

যে আজ্ঞে।

চেহারাটা তো বেশ তাগড়া, তবে অমন মেনিমুখো কেন?

আজ্ঞে আমি এমনধারাই। নিজেকে আমার নিজেরও তেমন পছন্দ হয় না।

যদু নায়েক বলে, বলি ঘরে লাঠিসোটা কিছু আছে?

লাটু একগাল হেসে বলে, তা আর নেই! সাপখোপ, শেয়াল-বাগডাঁশার সঙ্গে ঘর করতে হয় তো! তাই একখানা পাকা বাঁশের লাঠি আছে বটে। বাবা বলেছিল, ঠাকুরদার জিনিস। তিনি মস্ত লেঠেল ছিলেন। আর আগাছা কাটবার একখানা হেঁসো আছে। একখানা দা-ও আছে।

বাঃ! তাহলে আর চিন্তা কী? কেউ যদি এসে জমি-বাড়ি দখলের কথা বলে তাহলে তুমি বাপু নেড়ি কুকুরের মতো লেজ দেখিয়ো না। লাঠি হাতে নিয়ে একখানা হাঁকাড় ছেড়ে বাইরে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে। তাহলেই দেখবে কাম ফর্সা।

লাটু মিটমিট করে চেয়ে বলল, সে কী আমি পারব? আস্পদ্দা হয়ে যাবে না।

তাহলে বাপু, তোমার পাততাড়ি গোটানোই ভালো। তোমার দ্বারা এ কাজ হওয়ার নয়। ভগবান তোমাকে একখানা দিব্যি লম্বা-চওড়া শরীর দিয়েছেন। এ জিনিস ক-জনার আছে বলো তো! তা ভগবান যখন দিয়েছেনই তখন তার একটা দাম তো দিতে হয় বাপু! এরকম একখানা ডাকাতে চেহারা নিয়ে ভেড়ার মতো হাবভাব করলে যে স্বয়ং ভগবানও খুশি হবেন না! যা ভালো বোঝো বাপু তাই করো। আমার যা বলার বলেছি, এখন তোমার কপাল।

যদু নায়েক চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবল লাটু। যদু নায়েকের কথাগুলো তার যেন ন্যায্য বলেই মনে হচ্ছে। ভগবান যখন চেহারাখানা দিয়েছেন, তখন সেটা কাজে না লাগানোর মানে হয় না। তবে তার বুকের জোর কম। সাহস মোটেই নেই।

দিন তিন-চার পরের কথা। লাটু কাজে বেরোবে বলে পান্তা খাচ্ছিল। এমন সময় বাইরে জনাকয়েক লোকের আগমন টের পেল সে। কারা যেন বাইরে নিজেদের মধ্যে কথা কইছে। লাটু শেষ দুটো গরাস গোগ্রাসে গিলে জল খেয়ে উঠে পড়ল।

বাইরে বেরিয়ে দেখল, জনা চারেক মানুষ। ভদ্রলোকের মতোই চেহারা। সবচেয়ে বয়স্ক

গুঁফো লোকটা তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, তুই কে রে? এ জমিতে বেআইনি ঘর তুলে রয়েছিস যে বড়ো?

লাটু অন্যসময়ে হলে ভয় খেয়ে গুটিয়ে যেত। মিউ মিউ করত। কিন্তু যদু নায়েক যেমন শিখিয়ে দিয়েছে, সে তেমনটাই করল। হঠাৎ বুক টান করে দাঁড়িয়ে বলল, তাতে আপনার কী দরকার? আপনি কে?

এ জমি আমাদের। এক ঘণ্টার মধ্যে জমি ছেড়ে পালা। নইলে পুলিশ এসে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাবে।

লাটু ঘরে ঢুকে পাকা বাঁশের লম্বা লাঠিটা হাতে করে বেরিয়ে এসে বাঘা গলায় বলল, এটা দেখেছ? সব ক-টাকে এ জমিতে পুঁতে ফেলব! বেরোও! বেরোও...

মাত্র দু-পা এগিয়ে গিয়েছিল লাটু।

আর তাইতেই ভয় খেয়ে লোকগুলো এমন দুদ্দাড় পালাল যে লাটু হাসি চাপতে পারল না। এই কায়দায় যে ভালো কাজ হয় তা বুঝতে তার একটুও দেরি হল না।

আরও দিন দুয়েক পর লাটু যখন খেতে কাজ করছিল, তখন কালী স্যাঁকরার ছেলে বিশু দৌড়ে এসে তাকে খবর দিল, ও লাটু। কারা যেন তোর ঘর ভাঙছে! শিগগির যা।

লাটুর আজকাল সঙ্গেই লাঠিগাছ থাকে। গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো ছিল। লাঠিগাছ নিয়ে সে কয়েক লম্ফে তার ঠেক-এ পৌঁছে দেখে চার-পাঁচজন মুনিশ লোক তার ঘরের অর্ধেক ভেঙে ফেলেছে। একজন মুরুব্বি গোছের লোক কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো।

লাটুর দোষ নেই। ঘরখানা গেলে তার কিছুই থাকে না। সুতরাং আগুপিছু চিন্তা তার মাথায় এল না। সে সোজা লাঠি চালিয়ে চারজন মুনিশকে এমন ঘায়েল করল যে তারা 'বাপ রে, মা রে' বলে দৌড়। মুরুব্বি লোকটা 'অ্যাই, অ্যাই' বলে চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসতেই লাটু লাঠিটা আপ্‌সে বলল, জমি দখল করতে এসেছ? এই জমিতেই তোমাকে শুইয়ে দেব, বুঝলে!

কেন, দেশে থানা-পুলিশ নেই? গুন্ডামি করে পার পাবে ভেবেছ?

গুন্ডামিটা কে করল বলো তো বাবু? আমি না তুমি? কোন আইনে তুমি আমার ঘর ভেঙেছ? তোমার বাপের জমি?

আমার দলিল আছে।

আমারও আছে। এখন বিদেয় হও। আর কখনো যেন আমার জমির ত্রিসীমানায় না দেখি!

লোকটা গায়েব হয়ে গেল।

দু-দিন পর যদু নায়েক সকালবেলায় এসে বলল, সাবাস! এটাই তো চেয়েছিলুম। এখন গতরে খেটে বাঁশ বাখারি ডালপালা দিয়ে জমিটি ঘিরে ফেলো। সীমানা থাকা দরকার। আর সেই সঙ্গে একজন পাহারাদারও যে চাই। সবচেয়ে ভালো পাহারাদার হল বউ। একটা বউ নিয়ে এসো হে।

লাটু লজ্জায় অধোবদন।

যদু নায়েক বলল, গিরি নায়েকের কাছে আমার কিছু টাকা দেনা ছিল। হাজার দশেক। সুদ সমেত পনেরো হাজার হয়েছে। শোধ না দিতে পারায় মনস্তাপে ভুগছি। টাকাটা তুমি রাখো। এও একরকম শোধ দেওয়াই হল। কী বলো?

লাটু হঠাৎ মুখ তুলে বলে, বাবু, আপনি আসলে ছদ্মবেশে ভগবান নন তো?

তা কে জানে বাপু।

সংবর্ধনা

'এই যে বিশুবাবু, নমস্কার। শুনলাম আপনার মামাশ্বশুর নাকি লটারি পেয়েছেন?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'তা কত টাকা পেলেন তিনি?'

'ভালোই পেয়ে থাকবেন। পাঁচ-দশ লাখ পেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'তাহলে বিশুবাবু, এ তো বেশ গৌরবের কথাই, কী বলেন? লটারি ক-জন পায় বলুন। লটারি পাওয়া মানে তো দশজনের একজন হয়ে ওঠা। এই গৌরবজনক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে কি আপনার কিছু করা উচিত নয়? মামাশ্বশুর তো আর পর নয়। আমাদের সকলেরই তো মামাশ্বশুর আছে, কেউ তো এমন বিরল কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। আমার মামাশ্বশুর তো হাড়হাভাতে। আপনার কি মনে হয় না যে লটারি জেতার জন্য ওঁকে প্রথমে একটা গণ ও পরে একটা নাগরিক ও তারও পরে একটা পুর সংবর্ধনা দেওয়া উচিত!'

'তা তো বটেই।'

'এ বিষয়ে একটা কমিটিও কি অবিলম্বে গঠন করা উচিত নয়? লটারিতে জয় তো চাট্টিখানি কথা নয়। লাখ লাখ লোক প্রতিদিন লটারি খেলছে, কিন্তু প্রাইজ পায় ক-জন বলুন!'

'অতি ঠিক কথা।'

'এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা প্রায় ত্রিশ বছরের। ত্রিশ বছরে মোট সাতশো একত্রিশজনকে নানারকম কৃতিত্বের জন্য সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা আমিই করেছি। ব্যায়ামবীর বলরাম শীল, নৃত্যশিল্পী কল্লোলিনী কয়াল, জাদুকর পি পাল, সাঁতারু বিপ্লব বসুর মতো বিখ্যাত লোকেরা তো আছেই। তা ছাড়া ধরুন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্বের জন্য আমরা পাঁচু চোর, পরেশ পকেটমার, গুল মারার জন্য গয়েশ গায়েন—এদেরও বাদ দিইনি। সংবর্ধনায় আমার খুব হাতযশ।'

'শুনে বড্ড খুশি হলাম। আপনি করিতকর্মা লোক।'

'আজ্ঞে সবাই তাই বলে, তবে এটাকে আমি দেশ বা দশের সেবা বলেই মনে করি। অনেকেই বলে বটে, নিতাইবাবুর মতো এরকম আত্মত্যাগ, এরকম কর্মোদ্যোগী এতবড়ো সংগঠক বড়ো একটা দেখা যায় না, কিন্তু আমি ভাবি, এটা তো আমার পবিত্র কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কী বলেন?'

'না না, তা বললে হবে কেন? আপনি বিনয়ী মানুষ বলেই কৃতিত্ব স্বীকার করতে চাইছেন না। কিন্তু আত্মত্যাগ ক-টা লোক আর করছে বলুন।'

'সে অবশ্য ঠিক কথা। সেদিন নবীনবাবু তো বলেই ফেললেন, নিতাইবাবু, আপনি দেশের যুবসমাজের কাছে এক জ্বলন্ত উদাহরণ।'

'নবীনবাবু ঠিকই বলেছেন।'

'আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে এভাবে জনগণের সেবা যেন আজীবন করে যেতে পারি।'

'সে তো বটেই। সেবাটা চালিয়ে যাওয়াই উচিত।'

'তবে কিনা সেবা করতে করতেই জীবনটা কেটে যাচ্ছে, নিজের দিকে আর তাকাতে পারলাম কই বলুন।'

'দেশসেবকরা, জনগণের সেবার্তরা নিজের দিকে তো তাকায় না। তাকাতে নেইও।'

'এই আপনার মামাশ্বশুরের কথাই ধরুন, আমরা পাঁচজন তাঁর কৃতিত্বের কথা সর্বসমক্ষে তুলে না ধরলে একটা জাতীয় কর্তব্যকেই কি অবহেলা করা হবে না? আগামী রোববারই আমরা সংবর্ধনা কমিটি তৈরি করছি। লোকের অনুরোধে আমি সভাপতি হতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়েছি।'

'আপনার মতো কৃতী লোক থাকতে অন্য কাউকে সভাপতি করা হবেই বা কেন বলুন। সেটা যে গুরুতর অন্যায় হবে।'

'হেঁঃ হেঁঃ, সেইজন্যই রাজি হতে হল। সংবর্ধনা তো চাট্টিখানি কথা নয়। হল ভাড়া করা, ফুলের তোড়া, মালা ইত্যাদির জোগাড়, তারপর ধরুন উদ্‌বোধনী সংগীতের আর্টিস্ট, এসব তো লাগবেই। সংবর্ধনার পর জনগণের মনোরঞ্জনেরও তো একটু ব্যবস্থা রাখতে হবে না কী? তার জন্য কিশোরকণ্ঠী, মুকেশকণ্ঠী, হেমন্তকণ্ঠী কয়েকজন আর্টিস্টকে আনা, একটা মূকাভিনয়, একটু ম্যাজিক-ট্যাজিক, তারপরে একখানা নাটক, হরবোলা, অর্কেস্ট্রা কোনটা না হলে চলে বলুন। মাইকের ভাড়া, জলযোগের ব্যবস্থা এসবও তো না করলেই নয়।'

'যে আজ্ঞে। এসব তো সংবর্ধনার চিরকালীন অঙ্গ, বাদ দিলে অঙ্গহানি হবে।'

'খরচাপাতিও আছে, তা ধরুন গিয়ে হাজার বিশেক টাকা হলে ম্যানেজ করে নেওয়া যায়।'

'বিশ হাজার তো আজকালকার বাজারে কিছুই নয়! আপনি ভালো সংগঠক বলেই হয়তো ম্যানেজ করতে পারবেন।'

'যে আজ্ঞে, তবে ওটা জনগণের চাঁদা থেকেই তুলে নিতে হবে। আর বাকি হাজার বিশেক টাকা যদি আপনার মামাশ্বশুরকে বলে একটা ডোনেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আর ভাবনা থাকে না। লটারিটা তো হেলায় জয় করেছেন, ওই সামান্য টাকা ওঁর গায়েই লাগবে না।'

'সে আর বেশি কথা কী? যিনি লটারি মেরেছেন তাঁর তো আর টাকার অভাব নেই। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

'নিশ্চিন্ত হতে পারি তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে মামাশ্বশুরকে বলে টাকা আদায় করতে একটু সময় লাগবে।'

'কেন বলুন তো, উনি কি খুব ব্যস্ত?'

'তা ব্যস্তই বোধ হয়। লটারি পেলে সকলেই তো খুব ভিআইপি হয়ে ওঠে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। আপনি বরং আমাকে একবার তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।'

'সেটাও শক্ত নয়, তবে দেরি হবে।'

'আচ্ছা, এই দেরিটার কথা বারবার বলছেন কেন বলুন তো। নিজের মামাশ্বশুরের সঙ্গে কি আপনার সদ্ভাব নেই?'

'আজ্ঞে সদ্ভাব থাকারই তো কথা ছিল।'

'তবে দেরি হবে কেন?'

'লজ্জার কথা হল তাঁকে খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগবে।'

'বলেন কী? তিনি কি লটারি পেয়ে সাধু বা পাগল বা বিবাগি হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন? লটারি পাওয়ার শক অবশ্য অনেকে ঠিক সামলাতে পারে না।'

'সেরকম হতে পারে। আমার কাছে সঠিক তথ্য নেই। তবে সময় দিলে আমি তাকে ঠিকই খুঁজে বের করব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সাক্ষাৎ মামাশ্বশুর বলে কথা। তার ওপর শাঁসালো মানুষ। এরকম মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে আমাদের কাজকারবারই চলবে কীসে?'

'ঠিক কথাই, তবে আপনার অনুরোধ আমার মনে থাকবে। আমি তাকে খুঁজে বের করবই।'

'কত দেরি হবে বলতে পারেন?'

'তা দু-চার বছর ধরে রাখুন।'

'অ্যাঁ! সর্বনাশ! দু-চার বছর কী বলছেন মশাই? তাহলে সংবর্ধনার কী হবে? পাড়ার ক্লাবের ছোকরারা যে আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। বলি পুলিশে খবর দিয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে না, পুলিশকে এখনও জানানো হয়নি অবশ্য। তবে ঘটককে বলা হয়েছে বলে শুনলাম।'

'ঘটক! এর মধ্যে ঘটক আসছে কেন? লটারি পেয়ে আপনার মামাশ্বশুর কি আরও বিয়ে করতে চান নাকি?'

'তা চাইতেও পারেন। আমার ঠিক জানা নেই, তবে ঘটক ছাড়া তাকে খুঁজে বার করা মুশকিল।'

'কেন বলুন তো! ঘটকের ভূমিকাটা কী?'

'উনিই খুঁজে আনবেন কিনা, অবশ্যি মামাশ্বশুরের আগে তার ভাগনিকেই খুঁজে পাওয়া দরকার।'

'ভাগনি! আচ্ছা মশাই, ভাগনির কথা উঠছে কেন?'

'যার ভাগনি নেই তার যে মামাশ্বশুর হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতাই নেই, এটা তো মানবেন!'

'সে তো ঠিকই, কিন্তু আপনার মামাশ্বশুরের অসুবিধাটা কী?'

'সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করা যেতে পারত যদি তিনি বিধিমতো আমার মামাশ্বশুর হতেন।'

'বাধাটা কোথায়?'

'মামাশ্বশুর হননি বলেই বাধা, যার মামাশ্বশুর থাকে না সে যে অতি হতভাগ্য তা আজ আপনার কথা শুনেই বুঝলাম। ব্যাপারটা হল আপনার কথামতো লটারি জেতা মামাশ্বশুর খুঁজতে হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'সবই যে গুলিয়ে দিচ্ছেন মশাই।'

'ব্যাপারটা গোলমেলে ঠিকই, কথাটা হল মামাশ্বশুর বা নিদেন তার ভাগনিটিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে সমস্যাটা জটিলই থেকে যাবে। প্রথম তার ভাগনিকে খুঁজে বার করা, পাত্রী দেখা, বিয়ের জোগাড়যন্তর করা, বিয়ে হওয়া—এই এতসব কাণ্ডের পর তবে না আপনি আমার মামাশ্বশুরের নাগাল পাবেন?'

'তার মানে কী আপনার মামাশ্বশুরই নেই বিশুবাবু?'

'আজ্ঞে না। মামাশ্বশুর নেই, তার ভাগনির সঙ্গে আমার বিয়েটাই যে হয়নি এখনও, আর আমি বিশুবাবুও নই।'

'তাহলে তো মুশকিলে ফেললেন মশাই। সংবর্ধনাটা কি ভেস্তে যাবে তাহলে? সংবর্ধনার জন্য যে পাড়ার ছেলেগুলো খেপে উঠেছে।'

'আহা, তাতে আটকাচ্ছে কেন? আপনার মতো একজন কৃতী মানুষকেও তো জনগণের সংবর্ধনা দেওয়া উচিত।'

'তা অবশ্য খুব একটা খারাপ বলেননি, তাহলে দিন তো মশাই, শতখানেক টাকা চাঁদা দিন, নিজের সংবর্ধনাটা সেরে ফেলি।'

'সেই ভালো, কিন্তু ওই যাঃ, অত টাকা যে সঙ্গে নেই!'

'কত আছে?'

'দাঁড়ান, বোধ হয় টাকা পাঁচেক হতে পারে।'

'তাই বা মন্দ কী! কাটছাঁট করে ওতেও সংবর্ধনা দেওয়া যাবে। দিন, পাঁচ টাকাই দিন।'

জাম্বোর নামডাক

কালীপদ সেন হলেন গিয়ে তারানাথ মেমোরিয়াল স্কুলে ইংরিজির মাস্টারমশাই। মেলা ইংরিজি জানেন বলে পাঁচটা গাঁয়ে তাঁকে সবাই মান্যগণ্য করে। তা সাহস করে এক সন্ধেবেলায় তাঁর কাছে হাজির হয়ে জাম্বো হাতজোড় করে বলে, প্রাতঃপেন্নাম হই কালীবাবু। অধমের আপনার শ্রীচরণে একটু নিবেদন ছিল।

গ্রীষ্মকাল, কালীমাস্টার দাওয়ায় মোড়া পেতে বসে হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছেন। বললেন, বলে ফেল বাপু।

আজ্ঞে, জাম্বো কথাটার মানে কী একটু বলবেন?

কালীপদবাবু ভ্রু কুঁচকে বলেন, সে কি হে! নিজের নামের মানে নিজেই জানো না! অথচ নামটা দিব্যি বয়ে বেড়াচ্ছো!

আজ্ঞে, আমার মা-বাপের তো মোটে বিদ্যে নেই, তারা নাম রেখেই খালাস। কিন্তু নামটার একটা দায় তো আছে, ঠিক কিনা বলুন!

তা বটে, আমি যতদূর জানি, জাম্বো হল বড়সড় জিনিস। এই যেমন জাম্বো হাওয়াই জাহাজ, জাম্বো আইসক্রিম, জাম্বো সাইজের কলা।

তার মানে তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে আমি একজন বড়সড় লোক?

তাই দাঁড়ায় বটে।

কালীমাস্টারকে একটা পেন্নাম ঠুকে জাম্বো খুশি মনে বাড়ি ফিরে এল। যাক এতদিনে নামটার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেল।

সকালে ঘাটের পৈঠায় পা ঘষছিল খগেন মান্না। আর জাম্বো পুকুরঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল। নামের বৃত্তান্ত শুনে খগেন বলে, আহা, নাম জম্পেশ হলেই কী হয় রে? নামে মাঞ্জা না দিলে জেল্লা কি ফোটে?

জাম্বো একটু ফাঁপরে পড়ে বলে, ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা হয় জানি, নামের মাঞ্জা ব্যাপারটা কী একটু খোলসা করে বলো তো!

গিরিধারী পল্যেকে চিনিস তো? তারা মা অপেরার মায়ের কান্না পালায় কানা বৈরাগীর পার্ট করে যেমন কাণ্ডটা করল। এখন দশটা গাঁয়ে শহরে গঞ্জে লোকের মুখে শুধু গিরিধারীর নাম। তারপর ধর ভোলা মণ্ডল। হাল বলদ নিয়ে খেতের কাজে নাকাল হচ্ছিল। কেউ চিনত তাকে? সন্ধেবেলা ঢোল বাজিয়ে একটু গানবাজনা করত। একদিন সেই ঢোলের চাঁটি শুনে এক ভদ্রলোক গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন। আর ভোলাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। এখন ঢোলকদার হিসেবে সারা দেশে ভোলা মণ্ডলের নাম। এবার বুঝলি নামে মাঞ্জা দেওয়া কাকে বলে!

শুনে জাম্বো একটু ভাবনায় পড়ে গেল। তাই তো! কথাটা তো ভাববার মতোই কথা। শুধু জাম্বো হয়ে থাকলে তো পেখমছাড়া ময়ূর। তার আর দামটা কী?

গাঁয়ের মাতব্বর নবীন দাসের একটা সম্পত্তির মামলায় গতবার সাক্ষী দিয়েছিল জাম্বো। সেই থেকে নবীনের সঙ্গে তার একটু খাতির। তা নবীন সব শুনে-টুনে বলল, বুঝেছি, তোর

শুধু নাম হলেই চলছে না, সঙ্গে একটা ডাকও চাই। মানে তুই নামডাকওলা একজন হতে চাস তো।

হলে মন্দ হত না দাদা।

তা সে আর বেশি কথা কি? সজনেহাটি গাঁ তো বেশিদূর নয়। মেরেকেটে মাইল তিনেক হবে। সেখানকার মা শীতলা ক্লাব সামনের রোববার কদলী ভক্ষণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। পাঁচ টাকা এন্ট্রি ফি। যা গিয়ে নাম লিখিয়ে আয়। যদি জিততে পারিস তাহলে বেশ নামডাক হবে'খন। পাঁচটা টাকার তো মামলা, আর তুই বেশ তাগড়াইও আছিস। দুগ্গা বলে লেগে যা।

জাম্বো ব্যাপার শুনে মোটেই খুশি হল না। গাঁয়ের নিমাই সাধু গতবারই কদলী ভক্ষণ জিতে একটা রুপোর মেডেল পেয়েছিল। কিন্তু নিমাইকে তো পোঁছেও না কেউ। সাইকেল সারাইয়ের দোকানে সে এখন লিক সারায়। মেডেলটা বেচতে নিয়ে গিয়েছিল, স্যাকরা বলেছে, ও মোটে রুপোই নয়, হোয়াইট মেটাল।

গাঁয়ের জ্ঞানী মানুষ হলেন পতিতপাবন ঘোষ। শোনা যায় বেদ-বেদান্ত গুলে খেয়েছেন। তিথিনক্ষত্র, খনার বচন, শুভঙ্করী সব ঠোঁটস্থ। লোকে বেশ মানে-গোনে। তা তিনিও সকালবেলা বসে পঞ্জিকা দেখছিলেন, এমন সময় জাম্বো গিয়ে পেন্নাম ঠুকে সামনেই বসে পড়ল। সমস্যাটা শুনে বললেন, ডান হাতটা একটু চ্যাটালো করে পাত তো। কররেখাটা একটু দেখি।

তা দেখলেন। মন দিয়েই দেখলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, নাম না হওয়ার তো কারণ দেখছি না।

জাম্বো উজ্জ্বল হয়ে বলে, তাহলে হবে বলছেন পণ্ডিতমশাই?

হবে বলিনি। বলেছি না হওয়ার তো কারণ দেখছি না। লেগে থাকলে হতে পারে।

তাহলে একটু উপায় বাতলে দিন।

ওরে, নাম করার উপায়ের অভাব কী? লোকে খুন-খারাপি, চুরি-ডাকাতি করেও নাম কিনে ফেলছে। তুই ভালো করে ভেবে দ্যাখ তোর কোন দিকে ঝোঁক। যেদিকে হাতযশ আছে বুঝবি তাইতেই লেগে যাবি। পট করে নাম হয়ে যাবে।

কথাটা তেমন ভরসার কথা নয়। তবু জাম্বো মিনমিন করে বললে, ভাবনা-চিন্তাটাই যে আমার আসতে চায় না পণ্ডিতমশাই। মাথাটা বড্ড নিরেট।

রোজ ব্রাহ্মী শাক খা। মাথায় ভাবনা-চিন্তার এমন ভাসাভাসি হবে যে, ভেবে কূল পাবি না।

ব্রাহ্মী শাকও সোনা হেন মুখ করে খেতে লেগে পড়ল জাম্বো। কিন্তু তেমন সুবিধে কিছু হল বলে টের পেল না।

নরহরি গুঁই মেলা তুকতাক জানে, মড়ার খুলিতে করে রোজ চা খায়, মাটিতে দাগ কেটে অব্যর্থ বাণ মারতে পারে, মারণ উচাটন জানে, বশীকরণ তার কাছে জলভাত। জাম্বোর সমস্যার কথা নরহরিও খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর মুখ খোলার আগে পঞ্চাশ টাকা চেয়ে বসল। বলে, ওরে, দক্ষিণা না দিলে যে আমার মুখ থেকে লাগসই কথা বেরোতেই চায় না।

জাম্বো হাতে-পায়ে ধরে কুড়ি টাকায় রফা করল। নরহরি বলল, তোর সবই তো ভালো দেখছি, তবে রাহু ব্যাটা বক্রী হয়ে বসে আছে। সেটাকে ফিট করতে হলে তো একটা যজ্ঞ না করলেই নয়। খরচাপাতি আছে কিন্তু।

তা জাম্বো ফের হাতে-পায়ে ধরে কম খরচেই যজ্ঞ করাল। কিন্তু বাঁকা রাহু সটান হল কিনা তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

তবে সে যে একটা নামডাকওলা লোক হতে চায় সেটা গাঁয়ে বেশ চাউর হয়ে গেল। সবাই ডেকে ডেকে জিগ্যেস করে, হ্যাঁ রে জাম্বো, তুই নাকি নামকরা লোক হতে চাস?

জাম্বো কাঁচুমাচু হয়ে বলে, তা ইচ্ছে তো যায় মশাই, কিন্তু তেমন সুবিধে হয়ে উঠছে না।

নানা লোক নানা পরামর্শ দেয়। তার কিছু কিছু করেও দেখেছে জাম্বো কিন্তু তাতে তার নাম তেমন ফাটছে বলে মনে হচ্ছে না তো!

মনটা বড্ড খিঁচড়ে আছে জাম্বোর। তা সেদিন বিষয়কর্মে নসীবপুরে যেতে হয়েছিল জাম্বোর। ফকির শা-র পাইকারি দোকান থেকে মাল কিনতে হবে। ফকির শা-র দোকানে বেজায় ভিড় থাকে। তা সে ভিড়ের পিছন দিকটায় দাঁড়াতেই সামনের লোকটা বলে উঠল, আরে, তুমি সেই কুসুমপুরের নামডাকওলা জাম্বো না? তা কি খবর হে, নামডাক হল?

জাম্বো লোকটাকে চেনে না। তেতো মুখে বলল, কই আর হল মশাই!

আর একটা লোকও সামনে থেকে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমারও কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকছিল বটে। তাই তো, এ হল গে কুসুমপুরের নামডাকের জাম্বো। তা পিছনে কেন ভাই, সামনে এসো, জায়গা করে দিচ্ছি।

কপালটা ভালোই বলতে হবে। অত বড় কারবারী ফকির শা অবধি চিনতে পারল তাকে। দূর থেকেই বলল, ওরে, ওই দ্যাখ নামডাকওলা জাম্বো এসেছে, তোরা ওকে মালপত্র দিয়ে ছেড়ে দে তাড়াতাড়ি।

জাম্বো তাজ্জব।

এখানেই ব্যাপারটার ইতি হল না। মিঠিপুরের হাটে গেছে সেদিন পাটের গুছি কিনতে সে ঢুকতেই হাটে একটা ঢেউ উঠে গেল। 'ওরে ওই দ্যাখ নামডাকওলা জাম্বো এসেছে।' ব্যাপারীরা অবধি ভারি খাতির করে মালপত্র গস্ত করে দিল।

এখন যেখানেই যায় জাম্বো, লোকজন তাকায়, তাকে নিয়ে বলাবলি করে, হাসাহাসিও করে বটে। তা করুক, তবু নামটা তো ফেটেছে!

তার বাপ কালোহরি একদিন বলেই ফেলল, ওরে জাম্বো, বাপ আমার নামডাকের জন্য হেঁদিয়ে মরছিলি, এখন দ্যাখ তোর কেমন নামডাক হয়েছে।

ভূতনাথের বাড়ি

'আচ্ছা মশাই, এদিকটাতেই কি ভূতনাথবাবুর বাড়ি?'

'না না, এ পাড়ায় ভূতনাথ বলে কেউ থাকে না।'

'কী আশ্চর্য! কিন্তু আমার কাছে যে ঠিকানাটা দেওয়া আছে তাতে স্পষ্ট লেখা অশ্বিনী মিত্র রোড, হাকিমপাড়া, তা এটা কি হাকিমপাড়া নয়?'

'তা হবে না কেন? এটা হাকিমপাড়া হতে বাধাটা কীসের? আটকাচ্ছে কে?'

'তাহলে অশ্বিনী মিত্র রোডটা?'

'এটা অশ্বিনী মিত্র রোডও বটে।'

'কিন্তু তাহলে ভূতনাথবাবুর বাড়িও তো এখানেই হওয়া উচিত।'

'না মশাই, কক্ষনো এখানে ভূতনাথবাবুর বাড়ি হওয়া উচিত নয়।'

'বলছেন! কিন্তু তা হয় কী করে? ভূতনাথবাবু নিজেই এই ঠিকানা দিলেন যে!'

'আর আপনিও অমনি ফস করে বিশ্বাস করে ফেললেন তো?'

'যে আজ্ঞে। ভূতনাথবাবুকে বিশ্বাস করা কী উচিত হয়নি মশাই?'

'বিশ্বাস করা না করা আপনার দায়। আমার তো নয়। তবে একথাও বলতে ইচ্ছে করে, কেউটে সাপ বা সোঁদরবনের বাঘকেও কী বিশ্বাস করা উচিত?'

'আজ্ঞে না। তাদের কথা আলাদা। বন্যপ্রাণী আর মানুষে তফাত আছে।'

'তফাতটা কী? তফাতটা কোথায়? ভূতনাথ বিশ্বাসকে যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে কেউটে সাপ বা সোঁদরবনের বাঘের দোষ কী বলুন!'

'আপনি বলতে চান ভূতনাথ বিশ্বাস সাপ বা বাঘের মতোই বিশ্বাসের অযোগ্য।'

'অতটা বলতে চাই না। তাছাড়া আমি তো বলেই দিয়েছি, ভূতনাথ বিশ্বাস নামে কেউ এ পাড়ায় থাকে না।'

'তবে তিনি থাকেন কোথায়? সম্প্রতি কি বাসা বদল করেছেন?'

'করাই উচিত। বাসা বদলালে বহু মানুষের উপকারই হত। তবে ওসব আমি বলতে চাইছি না। তা আপনি আসছেন কোথা থেকে?'

'আমি আসছি নিশিগঞ্জ থানা থেকে।'

'অ্যাঁ! বলেন কী? থানা থেকে? আরে, তা আগে বলতে হয়। তা সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছেন তো!'

'তা আর আনিনি! সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে, আদালতের সমন আছে। আমার কাছে সবকিছু পাবেন।'

'বাঃ, বাঃ! এ তো খুব ভালো কথা মশাই! তা আসুন না, এই গরিবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন। কাছেই আমার বাড়ি। ওই যে সামনের লাল বাড়িটা।'

'তা মন্দ কী? পথ তো আর কম নয়। দুপুরের এই রোদে এতটা পথ আসতে বড়ো হাঁপসে পড়েছি মশাই।'

'আহা, আমারই দোষ। মান্যগণ্য লোক আপনি, এভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখাটা আমার ঠিক হয়নি। আসুন আসুন।'

'বাঃ, আপনার বাড়িটি তো বেশ!'

'সবাই তা বলে বটে। তবে এ আর এমন কী বলুন। হারু ঘোষের বাড়ি আরও পেল্লায়।'

'তা আপনার বাড়িই বা কম কীসে? ক-বিঘে জমি নিয়ে বাগানখানা করেছেন বলুন তো!'

'না না, জমি কোথায়! বাড়িখানাই তো অর্ধেক জমি গিলে খেল। এখন মোটে বিঘে দশেক পড়ে আছে।'

'বাপ রে! দশ বিঘে জমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মতো জিনিস! তা মার্বেল বসিয়েছেন বুঝি মেঝেতে?'

'মার্বেলই বটে। তবে এক নম্বর সরেস জিনিসটা তো আর পেলাম না। তাই বাধ্য হয়ে ইটালিয়ান মার্বেলই বসাতে হল।'

'ইটালিয়ান মার্বেল! সে তো অনেক দাম মশাই। তার চেয়ে সরেস মার্বেল পাবেন কোথায়?'

'লোকে তাই বলে বটে। তবে এই অখাদ্য জায়গায় ভালো জিনিসের সমঝদারই বা কোথায় বলুন। বসুন তো, এই সোফায় বসুন। আমি বরং ঠান্ডা মেশিনটা চালিয়ে দিই। আপনার তো বেশ ঘাম হচ্ছে দেখছি।'

'ঠান্ডা মেশিনও লাগিয়েছেন? বাঃ, আপনার নজর তো খুব উঁচু।'

'কী যে বলেন! ওসব আজকাল হ্যাতাপ্যাতাদের ঘরেও থাকে। তা এই গরমে কী একটু লেবুর শরবত খাবেন?'

'না না, এসব ঝামেলা করতে হবে না। অন ডিউটি আমাদের এসব খেতে-টেতে নেই।'

'আহা ডিউটি করতে করতেই খাবেন। এক গেলাস শরবত বই তো নয়। দাঁড়ান, ভিতরে বলে আসছি।...হ্যাঁ, তারপর বলুন তো, ভূতনাথের কেসটা কী?'

'খুব খারাপ কেস মশাই, খুব খারাপ কেস।'

'কত ধারায় মামলাটা ঠুকছেন?'

'ধারা-টারা উকিলের ব্যাপার, তারা বুঝবে। আমরা চার্জশিট দাখিল করব, তারপর কেস কোর্টে যাবে।'

'বাঃ, বাঃ, এ তো খুব ভালো খবর মশাই। মা কালীকে জোড়া পাঁঠা মানত করা ছিল।'

'আচ্ছা, জোড়া পাঁঠা কেন মানত করেছিলেন বলুন তো!'

'অতি দুঃখেই মানত করতে হয়েছিল মশাই।'

'কিন্তু দুঃখটা কীসের?'

'সে আর বলবেন না। দুঃখ কী একটা? ভূতনাথের জ্বালায় এ পাড়ার সবাই অতিষ্ঠ। ধরুন কেউ হয়তো শীতলা পুজোয় একটু মাইক-টাইক লাগিয়েছে। তা পুজো-টুজোয় ও তো লোকে লাগিয়েই থাকে। ভূতনাথ তার দলবল নিয়ে এসে সব চোঙা-টোঙা খুলে নিয়ে যায়। তারপর ধরুন কেউ হয়তো রাস্তার ধারে একটু তরকারির খোসা বা মাছের আঁশ ফেলেছে, অমনি ভূতনাথ এসে কী হম্বিতম্বি! তারপর অধরবাবুর খিটখিটে বুড়ো বাপটা সারাদিন খাই খাই করে পেট নামিয়ে ফেলে, তাই অধরবাবুর বউ শ্বশুরকে বলেছিল, অত খাওয়া কী ভালো? হয়তো একটু ঝাঁঝের গলাতেই বলেছিল, তাইতে ভূতনাথ এসে চড়াও হয়ে মানবাধিকার কমিশনের ভয় আর সামাজিক বয়কটের জুজু দেখিয়ে কী অত্যাচারটাই না করে গেল। ওই যে নবকুমার, তার দোষ হয়েছিল, বাগানের পাঁচিলটা তোলার সময় মাপজোকের ভুলে রাস্তার খানিকটা সীমানায় ঢুকে যায়। ভূতনাথ সেই দেয়াল ভাঙিয়ে তবে ছাড়ল।'

'এ তো ভূতনাথের খুব অন্যায়!'

'অন্যায় নয়? আমাকেই কী কম জ্বালাতন হতে হচ্ছে মশাই? শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে কোনোমতে বাড়িটা খাড়া করেছি, ভূতনাথ এসে রোজ দলিল দেখতে চায়, ভয় দেখায়। আমি নাকি সরলাবালা নামে এক বিধবার জমি চালাকি করে লিখিয়ে নিয়েছি।'

'লিখিয়ে নেননি তো!'

'তা লিখিয়ে নেব না কেন? নিয়েছি বই কী। কিন্তু তার জন্য তিন কিস্তিতে ন্যায্য দামও সরলাবালাকে মিটিয়ে দিয়েছি। রসিদও আমার কাছে আছে। কিন্তু কলিকাল তো, ভালো মানুষদের বড়ো দুর্দিন। ভূতনাথ আমার বিরুদ্ধে লোককে খেপিয়ে তুলছে।'

'না-না, এসব তো ভালো কথা নয়।'

'আপনারা পাঁচজন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এসে দেখুন কতবড়ো অবিচার এবং অনাচার চলছে এখানে। ওই যে, মিষ্টিটুকু মুখে দিয়ে ঠান্ডা ঘোলটা একচুমুকে মেরে দিন তো, শরীর ঠান্ডা হবে।'

'ও বাবা! এত আয়োজন! না মশাই, আমার পক্ষে দশ-বারোটা মিষ্টি খাওয়া সম্ভব নয়। আমি পেটরোগা মানুষ।'

'আহা, আপনি তো ইয়ংম্যান। কতটা হেঁটে আসতে হয়েছে। লজ্জা করবেন না, খেয়ে নিন।'

'তাহলে ভূতনাথবাবুর জন্য আপনারা শান্তিতে নেই?'

'না মশাই, সে বিদেয় হলে বাঁচি। তা তার বিরুদ্ধে কীসের মামলা বলুন তো! খুন-জখম-রাহাজানি, নাকি চারশো বিশ ধারা, নাকি ট্যাক্স ফাঁকি?'

'কেসটা আমি খুব ভালো জানি না। তবে তার নামে সরকারি চিঠি আছে।'

'সেই চিঠিতে কী আছে মশাই? যাবজ্জীবন হলে খুব ভালো হয়, ফাঁসি হলে তো চমৎকার, নিদেন আট-দশ বছরের কয়েদ তো বোধ হয় হচ্ছেই। কী বলেন?'

'তাও হতে পারে। সবই সম্ভব। আচ্ছা, আপনার কি একটা দশ লাখ টাকার ব্যাঙ্ক লোন আছে?'

'অ্যাঁ! ব্যাঙ্ক লোন! দাঁড়ান, মনে করে দেখি! আচ্ছা আচ্ছা মনে পড়ছে, একটা লোন যেন ছিল! তা তো এতদিনে শোধ করে যাওয়ার কথা! গেছেই বোধ হয়। তা এ খবর কে দিল আপনাকে? ভূতনাথ নাকি?'

'জয়কৃষ্ণ সরখেল তাঁর বাড়িঘর আপনার কাছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বাঁধা রেখেছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর কি আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকার দাবিতে তাঁর নাবালক পুত্র-কন্যাকে বের করে দিয়ে জমি-বাড়ি দখল করেছেন?'

'এই দ্যাখো কাণ্ড! তাই বলেছে বুঝি ভূতনাথ? একদম বিশ্বাস করবেন না মশাই, আমার বড্ড নরম মন। পাঁচ হাজার নয়, অনেক বেশিই নিয়েছিল জয়কৃষ্ণ। কাগজপত্র সব পরিষ্কার।'

'না, আপনি যে ভালো লোক তা যেন বুঝতে পারছি। তবে কিনা সেটা প্রমাণ করা বেশ শক্ত হবে। কলিকাল তো। এই কলিকালে ভালোমানুষদের যে কষ্ট পেতেই হয়। চলুন মশাই, কষ্ট করে একটু থানায় চলুন। বড়োবাবু আপনার জন্য বসে আছেন।'

'সে কী? আর ভূতনাথ?'

'তাকে তো সরকারি কী খেতাব-টেতাব দেবে বলে শুনছি। সেই চিঠিও আমার সঙ্গেই আছে।'

বলাইবাবু

'বাঃ, আপনার কুকুরটি কিন্তু ভারি সুন্দর বলাইবাবু।'

'কুকুর, কোথায় কুকুর!'

'ওই তো, আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে।'

'অ! না মশাই, ওটা আমার কুকুর নয়।'

'অ! ইস দেখুন তো, আপনার কুকুর মনে করে গতকালও যে ওকে আমি লেড়ো বিস্কুট কিনে খাইয়েছি! বিস্কুটের আজকাল যা দাম হয়েছে, কহতব্য নয়। পয়সাটা কি তবে জলে গেল?'

'কিন্তু মশাই, আমার কুকুর মনে করে ওকে লেড়ো বিস্কুট খাওয়াতে গেলেন কেন? আমার কুকুরকে লেড়ো বিস্কুট খাওয়ানোয় আপনার লাভ কী?'

'আছে, ও আপনি বুঝবেন না। সামান্য একটা লেড়ো বিস্কুটই তো! তবে ও কিন্তু গতকালও আপনার পিছু পিছু বাজার অবধি গিয়েছিল। পরশুদিনও। এমনকী তার আগের দিনও।'

'অবাক কাণ্ড! কুকুরটা রোজ আমার পিছু নেয়, আমি তো তা জানতাম না।'

'আমার যতদূর মনে হয় কুকুরটা লোক চেনে। আপনি যে একজন মহান লোক তা কুকুরটা বুঝতে পেরেছে।'

'আমি মহান লোক! তা মশাই, মহান কথাটার মানে কী দাঁড়াচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারেন? জীবনে কখনো কেউ আমাকে মহান বলেনি। শুনে বড়ো অবাক লাগছে।'

'কী যে বলেন বলাইবাবু। মহান কথাটার জন্মই তো হল আপনার জন্য। ও কথাটা আর কারও গায়ে তেমন ফিট করে না, কিন্তু আপনার গায়ে একদম মাপে মাপে বসে যায়।'

'বটে!'

'তা নয়! সবাই জানে আপনার মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদে, আপনি দু-হাতে গরিব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেন, আপনি মানুষের বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়েন, নিতান্ত সামান্য মানুষকেও সম্মান দিয়ে কথা বলেন, জীবজন্তুর প্রতি আপনার প্রেম তো সর্বজনবিদিত।'

'চিন্তায় ফেলে দিলেন মশাই। আমি মানুষকে নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না। বাড়িতে ভিক্ষুক এলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কারণ অধিকাংশ ভিক্ষুকই প্রফেশনাল নিষ্কর্মা। মানুষ নিজের দোষে বিপদে পড়ে বলে আমি কারও বিপদ-আপদে বোকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি না আর অধিকাংশ মানুষই সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয় বলে তাদের আমি পোকামাকড়ের বেশি মনে করি না। আরও একটা কথা, কুকুর-বেড়াল ইত্যাদি নানা রোগজীবাণু বহন করে বলে আমি তাদের সযত্নে এড়িয়ে চলি।'

'আহা বলাইবাবু, এসবও তো বিবেচকের মতোই কাজ। আর তাতে আপনার মহান হতে আটকাচ্ছে কীসে?'

'তাতেও আটকাচ্ছে না! তাজ্জব করলেন মশাই!'

'আজ্ঞে, দু-চারটে গুণ বাদ গেলেও ক্ষতি নেই। গান্ধীজি কি ফুটবল খেলতে পারতেন?'

'বোধ হয় না। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন?'

'আচ্ছা, বিদ্যাসাগরমশাই কি গান জানতেন?'

'জানি না তো!'

'রবিঠাকুর কি ক্যালকুলাস জানতেন?'

'না জানাই সম্ভব।'

'তা বলে কি তাঁরা মহান নন?'

'তা বটে। তাহলে আপনি আমাকে মহান বানিয়েই ছাড়বেন।'

'আজ্ঞে না! আমি বলতে চাইছিলাম যে, আপনি মহান হয়েই জন্মেছেন। তা আপনি যতই নিজেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুন। আর এটাও আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মহানদেরই লক্ষণ।'

'আমি মশাই, নিজেকে মোটেই তুচ্ছ জ্ঞান করি না। আমি বিলক্ষণ জানি যে, আমি একটি বড়ো কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সেজন্য আমার যথেষ্ট অহংকারও আছে।'

'বলাইবাবু, ওই অহংকারও আপনাকে মানায়।'

'আচ্ছা মশাই, আপনি তো গায়ে পড়ে অনেক কথা বলছেন। কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না! আপনি কে বলুন তো!'

'কী যে বলেন, আমাকে চিনতে যাবেন কোন দুঃখে? উঁচু সার্কেলের লোকদের কাছে দেওয়ার মতো পরিচয় তো নয়।'

'সে তো আপনার হাড়হাভাতে চেহারা আর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তবু নামধাম জেনে রাখা ভালো।'

'নাম হল ধর্মদাস ঘোষ।'

'কী করা হয়-টয়?'

'ওই সামান্য একটু ডাক্তারি করে থাকি। হোমিয়োপ্যাথি।'

'তা মন্দ কী? হোমিয়োপ্যাথদের তো আজকাল বেশ পসার শুনেছি।'

'তা আজ্ঞে কিছু কিছু মানুষ ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। তারা যাতে হাত দেয় তাতেই সোনা ফলে। তবে কিনা হোমিয়োপ্যাথিতে আমি তেমন সুবিধে করে উঠতে পারিনি। তাই ওর সঙ্গে একটু জ্যোতিষচর্চাও করে থাকি।'

'ওরে বাবা, আপনি জ্যোতিষীও?'

'ওই যে বললাম, কপাল ভালো থাকলে সবকিছুতেই হাতযশ হয়। কিন্তু আমার জ্যোতিষবিদ্যারও তেমন কদর হয়নি।'

'এবার বলুন তো ধর্মদাসবাবু, আজ গায়ে পড়ে এই খেজুর করার উদ্দেশ্যটা কী?'

'আজ্ঞে, গত কয়েকদিন ধরেই আপনাকে আমি ফলো করছি।'

'ফলো করছেন! আশ্চর্য ব্যাপার! ফলো করছেন কেন?'

'আজ্ঞে পদাঙ্ক অনুসরণও বলতে পারেন। ভাবলাম কৃতবিদ্য লোক আপনি, বিশাল ডিগ্রি, বিশাল চাকরি, বিশাল নামডাক, তা আপনার হাওয়া-বাতাস গায়ে লাগলেও উপকার আছে। তাই রোজই, আপনি যখন আর পাঁচজনের মতো বাজার করতে বেরোন, তখন আমি আপনার পিছু নিই।'

'কারও পিছু নেওয়া যে অভদ্রতা সেটা নিশ্চয়ই জানেন।'

'যে আজ্ঞে।'

'এরজন্য আপনাকে আমি পুলিশে দিতে পারি তা জানেন?'

'পারেন বই কী। মান্যগণ্য লোক আপনি, পুলিশকে ডাকলে তারা ধেয়ে আসবে। উটকো লোক আমি, কী উদ্দেশ্যে ফলো করছি এটাও তো ভাববার কথা।'

'যাকগে, আমি পুলিশ ডাকছি না। আপনিও আর ফলো করবেন না।'

'আজ্ঞে। তবে কিনা ওই কুকুরটাও কিন্তু রোজই আপনাকে ফলো করে।'

'কুকুরটা কেন ফলো করে তা আমি জানি না, তবে তার উদ্দেশ্য ততটা সন্দেহজনক না-ও হতে পারে।'

'যে আজ্ঞে। আপনি বিবেচক মানুষ।'

'আপনার কি আর কিছু বলার আছে?'

'তেমন কিছু নয়। না বললেও চলে। আপনার হাতে হয়তো এত সময়ও নেই। ব্যস্ত মানুষ আপনি, বাজার করে এসে চাট্টি খেয়েই হয়তো অফিসে রওনা হবেন। আজ অবশ্য শনিবার, আপনার ছুটি। তা হলেও হয়তো বিকেলের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর বা লন্ডন যাওয়ার আছে, কিংবা নিদেন দিল্লি-টিল্লি।'

'সিঙ্গাপুর। খবর-টবর রাখেন দেখছি।'

'কী যে বলেন! হোমরাচোমরা মানুষরা যা করেন তাই খবর। এমনকী হেমন্ত আগরওয়ালের সঙ্গে পার্টিতে একটু আবডাল হয়ে কথা বললেও খবর, কিংবা দুবাইয়ের নটবরলালের সঙ্গে চোখাচোখি হলেও খবর।'

'অ্যাঁ! কী, কী বললেন?'

'আজ্ঞে, ও কিছু নয়। বড্ড বেশি কথা বলে ফেলি বলে আমার গিন্নিও আমাকে প্রায়ই বকাঝকা করেন। আমাদের কথার দামই বা কী বলুন।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, বেশি কথা বলেন বটে, কিন্তু হেমন্ত আগরওয়াল বা নটবরলালের নাম তো আপনার জানার কথা নয়!'

'বলেন কী বলাইবাবু! এ নামে কি সত্যিকারের কেউ আছে নাকি? আমি তো জিভের ডগায় যা এল বলে ফেললাম।'

'না মশাই না! ব্যাপারটা এখন আমার কাছে অতটা সোজা মনে হচ্ছে না! ধর্মদাসবাবু একটু ঝেড়ে কাশুন তো!'

'এই দ্যাখো ফ্যাসাদ। কী বলতে কী বলে ফেলেছি, আপনি হয়তো আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। বড়ো মানুষরা রেগে গেলে যে আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের ঘোর বিপদ!'

'ধর্মদাসবাবু, ব্যাপারটা একটু সিরিয়াস কিন্তু।'

'না না বলাইবাবু, আমি আসলে আপনার ভালোর জন্যই বলতে এসেছিলাম যে, আপনি একজন গণ্যমান্য লোক, আপনার কোনো অসোয়াস্তির কারণ ঘটুক এটা আমি চাই না।'

'অসোয়াস্তিটা কীসের?'

'এই যে ওই কুকুরটা আর আমি আপনাকে রোজ ফলো করি, কিন্তু আপনি তা টের পান না এটা যেমন অসোয়াস্তি তেমনি এই আমাদের মতো আরও জনা দুই আপনার পিছু নেয় রোজ। একজন ওই যে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে, মোটামতো, ধুতি আর শার্ট পরা। আর একজন ওই যে, দেওয়ালে পোস্টার পড়ছে, লম্বা রোগামতো।'

'আশ্চর্য! ওরা আমাকে রোজ ফলো করে, ঠিক জানেন?'

'আজ্ঞে। তবে হয়তো ওরা চাকরির উমেদার, কিংবা টেন্ডার দিতে চায়, কিংবা হয়তো কোনো ধান্দা আছে। কিংবা এও হতে পারে ওদের কোনো উদ্দেশ্যই নেই।'

'না মশাই, ভাবিয়ে তুললেন।'

'আপনাদের তো এমনিতেই ভাবনাচিন্তার অবধি নেই। সর্বদাই নানারকম সমস্যার মোকাবিলা করছেন। বড়ো কোম্পানি হলে যা হয় আর কী। তাই আমি ভাবলাম, বলাইবাবুর মতো একজন মহান মানুষকে সবদিক দিয়ে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। বিশেষ করে এখন হয়তো আপনি ত্রিশ-বত্রিশ কোটি টাকার একটা ডিল নিয়ে ভারি ভাবনায় আছেন, হয়তো বড়ো বড়ো নানা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন, হয়তো দু-তিনটে শত্রু কোম্পানি আপনাকে নানাভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সবসময়ে যাকে এতসব সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় তার কী এইসব ছোটোখাটো ব্যাপারে নজর থাকে!'

'দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। ত্রিশ-বত্রিশ কোটি টাকার ডিলের কথা আপনি জানলেন কী করে, এবং আর যা যা বললেন সেগুলোও তো খুব একটা আন্দাজে ঢিল ছোড়া নয়। ধর্মদাসবাবু, আপনি আসলে কে বলুন তো?'

'আজ্ঞে আমি একজন হোমিয়োপ্যাথ এবং জ্যোতিষী, বলিনি আপনাকে?'

'বলেছেন, কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'আমাকে বিশ্বাস করা উচিতও নয়। আমি প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও মিথ্যে কথা বলে থাকি। তবে কিনা মিথ্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে সত্যি কথাও ঢুকে যায়। চালে কাঁকরের মতোই আর কী! যেগুলো বেছে বের করা মুশকিল।'

'আপনি কী চান স্পষ্ট করে বলবেন?'

'ওরে বাপ রে! আপনার কাছে চাইবার মতো মুখ বা যোগ্যতা কোনোটাই কি আমার আছে? জানি, আপনি এক মহান মানুষ। চাইলেই দিয়ে ফেলবেন। কিন্তু দেখুন, চাওয়ার জন্যও বুকের পাটা লাগে। আমাদের মতো নগণ্য মানুষের তো ওটারই অভাব কিনা।'

'নগণ্য কিনা জানি না, তবে আপনি অতি বিপজ্জনক লোক।'